শিক্ষা

সমাজ

দেশ

জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন

লেখকের অন্যান্য বইঃ

- জীবনক্ষুধা (কবিতা)
- প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
- কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
- অপেক্ষা (উপন্যাস)
- শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
- সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
- সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
- নৈঃশব্দের কথকতা (উপন্যাস)
- পোদ্দার স্রোতোধারা (উপন্যাস)
- অলখ মহাশক্তির খেলাঘর (প্রবন্ধ, ধর্ম ও কর্মদর্শন)
- এইসব দিনকাল (ছোটগল্প)
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
- এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে (প্রবন্ধ, শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন (কলামভিত্তিক সংকলন)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার (কলামভিত্তিক সংকলন)

শিক্ষা

সমাজ

দেশ

জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

শিক্ষা সমাজ দেশ

জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক

প্রকৃতি

১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.book@gmail.com

প্রচ্ছদ

হাসনান আহমেদ

অলংকরণ

মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ

লিংক ভিশন

মিরপুর, ঢাকা

linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৪৫-৬

মূল্য: ৩৫০.০০ টাকা

Jonoprotaronamulak Rajniti: Durdoshagrostha Desh- Notun Bangladesh Gathon by Hasnan Ahmed

Published by Prokriti, Dhaka, August 2025

Price: Tk. 350.00

উৎসর্গ

জ্ঞানতাপস ইসলামি বিজ্ঞান-সন্ধিৎসু চিন্তাবিদ
সোদরপ্রতিম
ড. আবু জাফর মোহাম্মদ সুফিয়ান
(সাবেক অধ্যাপক: কিং ফয়সল ইউনিভার্সিটি, সৌদী আরব;
ইউনিভার্সিটি অব বাহরাইন, বাহরাইন;
সাবেক ফ্যাকাল্টি: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার কথা

বইটা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘শিক্ষা সমাজ দেশ’ শিরোনামে আমার লেখা কলামবিশেষের তৃতীয় সংকলন। একই শিরোনামে ‘শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন’ এবং ‘সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার’ নামে আরো দুটো সংকলন-গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় দৈনিকে আমার নিবন্ধ লেখার একটা প্রাক্কথন আছে, সেটা পাঠকসমাজকে একটু বলি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। কয়েকটা কবিতার বই, কাব্যগ্রন্থ, ছোটগল্প ও তিন-চারটে নিবন্ধ তখন আমার ভাণ্ডারে মজুদ; প্রকাশের অপেক্ষায়। যুদ্ধ অসংখ্য মানুষের জীবনের সাবলীল স্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল; যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কখনো জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চললো। দেশ থেকে পত্রিকা প্রকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা সব সময় জীবনের অনুকূলে থাকে না। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আমার লেখালেখির পরিসমাপ্তি ঘটলো। জীবন চলার খরস্রোতে ভেসে লেখাগুলো দিনে দিনে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। বলতে চাচ্ছি: শুরু থেকেই লেখালেখি অব্যাহত থাকলে আমার সাহিত্য-সৃষ্টিসম্ভার এতদিনে হয়তো অনেক বেড়ে যেত। এটা আমার জীবনের ব্যর্থতা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার নিয়মিত লেখালেখি শুরু করলাম। এখনও যখনই সময় পাই কিছু-না-কিছু লিখি।

শেষে ২০২২ সাল থেকে নিবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলাম। এ সংকলনটির নাম দিয়েছি ‘জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন’। চুয়ান্ন বছরের বাস্তবতা বিবেচনা করেই নাম দিয়েছি। নিবন্ধগুলো এলোমেলোভাবে না সাজিয়ে মোটামুটি শিরোনামের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ‘শিক্ষা, সমাজ ও দেশ’ প্রসঙ্গ একটা অন্যটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিদিন প্রকাশিত অগণিত নিবন্ধের অধিকাংশ সব পাঠকেরই অলক্ষ্যে রয়ে যায়। আমি পাঠকসমাজের সুবিধার্থে এবং দিনে দিনে প্রকাশিত আমার লেখা নিবন্ধগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কালের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসম্ভব বিষয়ভিত্তিতে বই আকারে একত্র করেছি। এতে অনেক কথা ও ভাবের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা ও পথনির্দেশিকা নতুন দেশ গঠনের পথিকার ও যুগোপযোগী হবে; পাঠকসমাজের অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা যথাসম্ভব তৃপ্ত করবে; চিন্তাশ্রয়ী গবেষক ও অনাগতদের পথ দেখাবে।

অধিকাংশ লেখা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত। এজন্য দৈনিক যুগান্তর কর্তৃপক্ষের কাছে এবং বিশেষভাবে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, পত্রিকা অফিসের বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো লেখার সব অংশ তাদের পক্ষে সব সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একটা কারণ আমি নিজে অবহিত। আমার লেখার ভাষা কাকের কণ্ঠস্বরকেও হার মানায়। অঙ্কের শিক্ষক হওয়ায় শ্যাম ও কুল বজায় রেখে, ভারসাম্য রক্ষা করে লিখতে পারিনে, যা বুঝি সোজাসুজি প্রকাশ করে ফেলি। এটা আমার লেখার অকপটতা ও সীমাবদ্ধতা। এতে অনেকের বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটায়। লেখনীর মতো ধারালো অস্ত্র আর কীই-বা আছে! সেজন্য এবং অন্য আরো কারণে কখনো পত্রিকা অফিস কিছু কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো পত্রিকা অফিসে আমি যেভাবে পাঠিয়েছিলাম, পুরোটাই তেমন অশোধিত-অসম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশিত হলো। বানানেও অনেক ভুলচুক রয়ে গেল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজ বিষয়টা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নিবন্ধগুলো এদেশের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতির প্রকৃতি ও দেশ নিয়ে লেখা; প্রতিটাই চিন্তা-উদ্রেককারী। এগুলো পড়লে কেউ আমার 'পথরেখা'র সন্ধান পাবেন ও আমার পরিচয় পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে আমার 'পথরেখা'র পুরো সন্ধান পেতে আমার লেখা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নিবন্ধ পড়তে হবে ও অভিমুখিতা বুঝতে হবে।

পাঠকসমাজে আমার লেখার কিছু ভক্তও আছেন, যাদের অনেকে আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। প্রতিনিয়ত তাদের দেওয়া গঠনমূলক পরামর্শের কারণে আমি তাদের কাছে ঋণী। ভক্ত পাঠকসমাজের আশা পূরণ হলে এবং লেখার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হলেই আমি খুশি। আমার লেখায় সমাজ, দেশ ও জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

ঢাকা, জুলাই ২০২৫

হাসনান আহমেদ

শিক্ষা সমাজ দেশ

জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি : দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন

সূচিপত্র

- একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি ১১
- রাজনীতিতে এখন কোনো 'আদর্শ' আছে কি? ১৬
- ভালো কিছু করতে ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ঠ ২০
- তোমরা যারে বলো কালো, আমি বলি কৃষ্ণকালো ২৫
- তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ করল না ৩০
- 'পথের দিশা দাও গো মুর্শিদ পথের দিশা দাও' ৩৫
- আস্থাহীনতাই আমাদের কাল হয়েছে ৪০
- 'মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার' ৪৫
- আমার স্মৃতিকথা ও বর্তমান স্বাদেশিকতা ৫০
- শ্রাদ্ধ যত আমার, রাম নাম তোমার ৫৫
- সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয় ৬০
- জলে কুমির ডাঙায় বাঘ ৬৫
- 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে...' ৭০
- বিশ্বময় মানবতার বিপর্যয় ৭৫
- 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে...' ৮০
- নীতি-দুর্নীতি ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ৮৫
- দেশ শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠুক ৯০
- সত্য কথা শুনতে বিস্বাদ– আত্মজিজ্ঞাসাই সমাধান ৯৫
- প্রকৃতির প্রতিশোধ সত্যই হলো ১০০
- অপরাধের সুষ্ঠু বিচার কে না চায়! ১০৫
- রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা ১১০
- দেশপ্রেমী মানুষ নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারেন না ১১৫
- আগে নিজের মনুষ্যত্ববোধের পুনর্জাগরণ হতে হবে ১২১

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল? ১২৬
- এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে! ১৩১
- কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয় ১৩৬
- গর্ভস্থ সন্তানের ওপর হলুদ খাওয়ার প্রভাব ১৪১
- নিবন্ধ-রোমন্থন সময়ের প্রয়োজনে করতে হয় ১৪৬
- দেশ-সংস্কারের খোলাবাজারে বারোয়ারি বয়ান ১৫১
- সংবিধান সংশোধনের কিছু খোলামেলা প্রস্তাব ১৫৬
- আওয়ামী লীগ নিজেই রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে ১৬১
- দেশ সংস্কারের পাদটীকা ১৬৬
- সাম্প্রতিক বিপ্লবের প্রেক্ষিত ও আলোক-নির্দেশনা ১৭১
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে বহুত্ববাদ ১৭৬
- 'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল' ১৭৯
- জাতীয় ঐক্যই পারে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে ১৮২
- এসব স্বাভাবিক রাজনীতি নয় ১৮৫
- 'আবার সেই হাসনার বাপ!' ১৮৮
- গন্তব্যটা আগে খুঁজি ও বুঝি, তারপর সাধু সাজি ১৯১
- পিছু হটার আর জায়গা নেই: অপয়া আমি বলবো কাকে! ১৯৪
- দেশ আগে, না রাজনৈতিক দল? ১৯৮
- আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কার করুন ২০২
- অন্তহীন নিরাশায় নিমজ্জিত মানবজাতি ২০৫
- সমাধান হতে পারে জাতীয় সরকার ২০৮
- দেশের সামনে তিনটি অনিবার্য চ্যালেঞ্জ ২১২
- '২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লবের বছরপূর্তির প্রাক্কালে ২১৬
- অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি ২২১

একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি

এদেশেরই এক জনপ্রিয় প্রয়াত শিল্পীর একটা গান এরকম: 'আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ছুটে যায়, আমার চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই।' গানের আরেকটা লাইনও না বলে পারছি না, 'সীমাহারা দূর দিগন্ত পারে, জানি না কোথা ভেসে যায় কোন সে অভিসারে, যারে খুঁজে ফিরি আমি তারে যে... ।' এবার একটা গল্প বলি: বেশ আগের কথা। তখন দেশে লেখাপড়া শিখতে হতো, কেউ পাশ করিয়ে দিত না, শিখে পাশ করতে হতো। রাজনৈতিক মস্তানরাও কথায় কথায় রামদা, কিরিচ হাতে করে হেডমাস্টারের পিণ্ডি চটকাতে আসতো না। শিক্ষকদের, বিশেষ করে হেডমাস্টারদের মেরুদণ্ড বেশ শক্ত ছিল। কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব সমাজে চলতো না। মানুষের জিব ঘুরাতে হলে জাগ্রত বিবেকের একটা দংশন ছিল। সমাজে জনপ্রতিনিধিদের কথায় সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল। সমাজে নীতিবোধের প্রাধান্য ছিল। এক হেডমাস্টার স্কুলের বারান্দায় বসে অজু করছেন। এক ছাত্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে সামনে এসে দাঁড়াল। হেডমাস্টার ছেলেটাকে দেখে চিনে ফেলেছেন। ছেলেটা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগে টেস্ট-পরীক্ষায় 'ডিজ্যালাউড' হয়েছে। ছাত্রটা এসে শিক্ষককে ভদ্রতার সাথে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আমি টেস্টে আনএলাউ হলাম কেন?' হেডমাস্টার কোনো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি উত্তর দিলেন, 'ঐ জন্যই, যাও।' ছেলেটা হেডমাস্টারের উত্তরটা বুঝতে না পেরে আবার একই প্রশ্ন করলো। হেডমাস্টারও একই উত্তর দিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে অফিস রুমে ঢুকে পড়লেন।

হবে হবে করে বায়ান্নটা বছর পার করে ফেললাম। এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় বারবার 'আনএলাউ' হচ্ছি কেন? সারাদিন যত কাজই করি না কেন, মাথা থেকে ভাবনাটা যায় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর ছিলাম। তেমন বেশি কিছু বুঝতাম না। শ্লোগানে অংশ নিয়ে শ্লোগান হাঁকতে পারতাম। বর্তমানে যে কোনো সময় জীবনসূর্য অস্ত যাবে। মাঝখানে পেশায় মাস্টারসাহেব হয়েছি। এখন নিজের জীবনে কি পেলাম, কি পেলাম না– তা ভাবি কম। ভাবি, আমাদের সন্তানদের ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা কেমন বাংলাদেশ রেখে যাচ্ছি! তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তারা যা দেখে, তাই শেখে। সর্বৈব মিথ্যাচার, শঠতা, ঠগবাজি, প্রকাশ্য চাটুকারিতা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থান্ধতা ছাড়া শেখার এদেশে আর কি আছে! এদেশে সামাজিক শিক্ষা বলতে কি কিছু আছে? স্বাধীন-সার্বভৌম এ ভূখণ্ডটা মানুষের মতো মানুষদের জন্য স্বর্গ, না-কি নরকতুল্য? আরো কত কিছু দুর্ভাবনা

মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খায়। নিজেকে স্থির রাখতে পারিনে বলেই হয়তো এসব কথা প্রকাশ করি। আমরাও তো এদেশের নাগরিক। দেশটা তো আমাদের সবার। কেউ দেখি দুচোখ দিয়ে, কেউবা এক চোখে দেখি।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঘাটলে কয়েকটা কথা আজও চোখে ভাসে: বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য; মানবিক মর্যাদা; সামাজিক ন্যায়বিচার; এবং সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র। মাঝেমধ্যেই রাতে বালিশে মাথা রেখে আকাশপাতাল চারণ করি। বায়ান্নটা বছরেও আমরা এগুলোর একটাও অর্জন করতে পেরেছি কি? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়: আমাদের ঠিকানা কোথায়? আমরা এভাবে 'আনএলাউ' হলাম কেন? এসব ভেবেই হয়তো কেউ কেউ অবৈধভাবে টাকা লুটপাট করে সুখের আশায় অন্য দেশে টাকা পাচার করছে। কেউবা যোগ্যতা অর্জন করতে না পেরে অবৈধভাবে বিদেশ যেতে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরাকেও শ্রেয় মনে করছে। দেশটা কি এতই খারাপ! আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই স্বদেশী মূল্যবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা, ত্যাগের মহিমা কোথায় হারালো? আমাদের মানবতাবোধ বলতে কি কিছুই আর অবশিষ্ট আছে? একজন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্যায় কাজে সমর্থন দেয়, ততক্ষণ সে ধোয়া তুলসীপাতা। যেই-না আমার অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে, তখনই তার মতো খারাপ লোক আর এ পৃথিবীতে একটিও নেই। এ আবার কেমন বিবেকবোধ? আমরা মনুষ্যত্ববোধের এ আবার কোন অবনতির দিকে ধেয়ে চলেছি! কেন চলেছি?

শিক্ষক হয়েছি বলে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুলের অসংখ্য সহকর্মীর সাথে আমার সখ্য। শিক্ষামানের যে শোচনীয় অবস্থার কথা আমি জানি, তাদের কাছে আরো বেশি শুনি। এদেশের শিক্ষার মান যে কোন পর্যায়ে নেমে গেছে, সংশ্লিষ্টমহল ছাড়া কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। একজন কলেজশিক্ষক বললেন, 'ভাই, এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র দশ-পনেরোটা খাতার লেখা স্যাম্পল হিসেবে দেখলেই বুঝবেন, এদেশে লেখাপড়া বলতে কিছু হয় না। তবু চাকরি টিকিয়ে রাখতে আমরা নম্বর দিই, পাশ করাই। বাস্তব কথাটা কোথাও বলতে পারিনে, দোষ নিজের গায়ে এসে পড়ে।' আমিও বুঝি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো একক ব্যক্তির চেষ্টা এক্ষেত্রে বৃথা। সম্মিলিত প্রচেষ্টা যারা দেখাবেন, তারা রাজনীতি(?) নিয়ে মহাব্যস্ত। শিক্ষার উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট নিচ্ছি। বাস্তবে শিক্ষামানের উন্নতি না দেখা পর্যন্ত কথায় বিশ্বাস করিনে। কত সহকর্মীর কাছেই তো একই কথা শুনছি, স্বচোক্ষে দেখছি। কী করতে পারছি!

একটা দেশের শিক্ষা ধ্বংস হয়ে গেলে জাতি ধ্বংস হতে আর কী বাকি থাকে? অথচ মনে মনে তা হয়ে চলেছে।

আরেকটা হলো দুর্নীতির অবস্থা। একটা জাতি ধ্বংসের জন্য এ দুটো উপাদানের পতনই যথেষ্ঠ। তাহলে আমরা কীসের এত বড়াই করি? একটা স্বাধীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছাড়া আমাদের আর অস্তিত্ব কোথায়? আমরা মানুষ, না মানুষ নামের কলঙ্ক? পত্রিকা খুললেই দুর্নীতি, পুকুর চুরি, নদী চুরি– এমন কি সাগর চুরিও চোখে পড়ছে। এতে মনে কোনো রেখাপাতও করে না। চুরি-দুর্নীতি, ব্যাংক ডাকাতি, খুনোখুনি সাধারণ সহনশীলতার পর্যায়ে চলে এসেছে। কাকে বলব? কে শোনে কার কথা? আইনের শাসন কই? পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে। কারণ আমরা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য ও আত্মজিজ্ঞাসা হারিয়েছি। নীতিবান মানুষ যে-দেশে হারিকেন ধরিয়ে খুঁজতে হয়। একেবারে প্রতিটা সেক্টরে, প্রতিটা কাজে যেখানে দুর্নীতি 'অপেন সিক্রেট' ব্যাপার হয়ে গেছে, কেউ এর প্রতিবিধান নিয়ে কোনো কথাও আর বলে না। ভালোমানুষ কিছু থাকলে তারা আর ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তো হঠাৎ করে এক রাতে তৈরি হবে না! এমনটি হলে সে-দেশ কেমন চলা উচিত?

শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। মনুষ্যত্ববোধ-জাগানিয়া শিক্ষা কোথায়? চিন্তাভাবনা, কথা ও আচার-আচরণের মধ্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব থাকতে হবে, তারপর কর্মে তা প্রকাশ পাবে। আমরা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ না শিখিয়ে বাহ্যিক লৌকিকতা ও লোকদেখানো সৌজন্য শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই 'আনএলাউ' হয়ে গেছি।

দেশের রাজনীতিতে পুরো বিপরীতমুখী দুটি ধারার জেদাজেদি শুরু হয়ে গেছে। যে যা-ই করুক চরম ভোগান্তিটা সাধারণ মানুষের জন্য। বিরোধী পক্ষেরও জেল-জুলুম-নির্যাতন কম নয়। প্রতিটা ভাত-খাওয়া মানুষের কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, যৌক্তিক-অযৌক্তিক এ বোধটুকু অন্তত আছে, আমাদের নেতারা এটা ভুলে যান। আমরা নিকট অতীতে নিজেই মানুষের আস্থা নষ্ট করেছি, তাই যত ভালো নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিই দিই না কেন, আমাদের কথায় কেউ আস্থা রাখতে পারছে না। এ দোষের দায় অন্যের উপর চাপাই কী করে? কয়েকমাস আগে তুরস্কে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানে সরকারি দলে থেকে এরদোয়ান শতকরা ৪৯.৪৯ ভাগ ভোট পেয়েও ৫০ ভাগের বেশি পাওয়ার জন্য পুনঃনির্বাচন দিতে হলো। এ থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক শিক্ষণীয় ছিল। আমরা

ভালো কিছু শিখতেও চাইনে, আবার চর্চাও করিনে। শুধু জোর করে নিজেদের অপকর্ম সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিই, আর বলি, 'আমি যা করি তা তোমরা কোরো না, আমি যা বলি তা তোমরা শোন।' আমাদের স্বভাব ও কর্মের পরিবর্তন না হলে শুধু মুখ দিয়ে ঠেলে দেশকে বেশিদূর নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে যত চাতুর্যপূর্ণ বয়ানই করি না কেন, সাধারণ মানুষ সবই বোঝে; আমরা ঠিকানা ভুলে যাচ্ছি।

অনেবারই পত্রিকায় পড়েছি, কোনো ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নিজের ছেলে বা মেয়েকে হত্যা করে প্রতিপক্ষের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে মামলা করে। আমাদের দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশটাকে সন্ত্রাসীরাষ্ট্র বা জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রের তকমা গায়ে লেপন করাটা ভুল হবে। এটাকে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা' বলে। এদেশের নিত্য বিবদমান দলগুলো অতীতে নিজেদের মর্যাদা রেখে নিজেরা সমস্যা সমাধান করেছে, এমন নজির কম। সবাই বারবারই বিদেশীদের কাছে আমাদের একই অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে মেটানোর জন্য সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। আমরা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা মূলত নই।

রাষ্ট্রের মালিক যদি জনগণই হয়ে থাকে, আবার জনগণের মতামতকেই যদি প্রাধান্য দিই, তাহলে জাতীয় নির্বচনে 'দলনিরপেক্ষ বা নির্দলীয়' সরকার ব্যবস্থার মতামত জানার জন্য নির্দলীয় কারো অধীনে আমরা একটা গণভোটেরও তো আয়োজন করতে পারি। তবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দুই-তিন মাসের নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার আয়োজন যতই করি না কেন, পাঁচ বছর পর একই সমস্যা যে আবার মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? এজন্যই বলি গণভোট যদি করতেই হয়, সংবিধান পরিবর্তনের জন্যও গণভোটের কাজ একবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার। অতপর নির্দলীয় সরকার আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগে যত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করার জন্য আইনের যথাযথ সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ প্রয়োগ করে দেশটাকে বাঞ্ছিত পথে আনবে, আইনের শাসন নিশ্চিত করবে। তারপর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আবার রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দেবে। আমাদের রাজনীতিবিদদের কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আমার অনেক পরামর্শও আছে। আমার ভাষাটা শুনতে যত খারাপই লাগুক, দেশটা এভাবে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের হাতে

ছেড়ে দিয়ে খেলার পুতুল বানানো কোনোভাবেই সমীচীন নয়ঃ বর্তমান ব্যবস্থায় দেশ ভালোভাবে চলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আমি কোনো আশার আলো দেখিনে। এদেশের রাজনীতির প্রতিটা অঙ্গে যে পচন ধরেছে, তা সহজ টোটকা চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যে যা-ই বলুক, কোনো আপ্তসার বচনের ওপর আমার আস্থা নেই। আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলে গালি দিলেও বলার কিছু নেই। কারণ মানুষকে অমানুষ, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর ও অশিক্ষিত বানিয়ে শুধু গলাবাজিতে চিঁড়ে ভেজে না। ফলত আমরা এদেশে সাধারণ সবাই কয়েদি হয়ে গেছি। এ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত বানানো ও দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত জাতির সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এমন কোনো পক্ষ, দল বা নাগরিকসমাজ যদি পারে, বিপরীতমুখী দুটো পক্ষকে যে ভাবেই হোক আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করুক। তাদেরকেই সমাধানে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প আমি দেখিনে। উভয় পক্ষ একে অন্যের প্রতি যতই কাদা ছোড়াছুড়ি করে আসর মাতানোর চেষ্টা করুক না কেন, এবারের নির্বাচন বিগত নির্বাচনের মতো জোড়াতালি দিয়ে হবে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো না। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তি ও পার্শ্ববর্তী ভারতীয় শক্তি যতই সাহস যোগাক না কেন, শেষ দায়টা এদেশকেই বহন করতে হবে। এভাবে চললে জোর করে একদলীয় নির্বাচন করতে পারুক, বা না পারুক সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কোনোক্রমেই কমবে না। উভয়েরই এই শুভবুদ্ধির উদয় যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই সাধারণ মানুষের মুক্তি, দেশেরও মঙ্গল। যুবক বয়সে সিনেমা দেখতে যেতাম। একটা সিনেমায় সকল কয়েদিকে কয়েদি-পোশাক পরে বৃত্তাকারে বসে থালা বাজিয়ে গান গাইতে দেখেছিলাম, 'এই জেলখানাকে নেবো আপন করে, ও বন্ধু রে, এখানে সবাই কয়েদি।' যদি কেউ প্রশ্ন করে, "স্যার, আমি 'আনএলাউ' হলাম কেন?" উত্তর হবে, 'ঐ জন্যই'।

(প্রকাশ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

রাজনীতিতে এখন কোনো 'আদর্শ' আছে কি?

বেশ কয়েকদিন থেকেই ব্যবসায়িক রাজনীতি ও রাজনীতির ব্যবসা শব্দগুচ্ছদ্বয় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই হাড়কাপানো কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের দাপটে শব্দযুগল মাথার মধ্যে আরো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এদেশের রাজনীতির ধারা পরিবর্তনে শব্দযুগলের পরিষ্কার ধারণা জানার প্রয়োজন। এই পরিষ্কার ধারণা রাজনীতিবিদরাই দিতে পারেন। তারাই এ চলতিদশা অবস্থার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। তবে একথা সত্য যে, এদেশের রাজনীতির পুরোটাই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এই দিগ্‌ভ্রান্ত-লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি দিয়ে এ দেশের মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় মানুষের ভালো কিছু আশা করা আর পশ্চিম গগনে অন্ধবেগে ধেয়ে-আসা কালবোশেখি ঝড়ো মেঘের কাছে শ্রাবনঘন অবিরাম-ঝরা শ্রান্ত-মেদুর বর্ষা চাওয়ার শামিল। রাজনীতি এ দেশের সকল অনিষ্টের আঁতুড়ঘর। রাজনীতিকে সুষ্ঠু ধারায় নিয়ে আসা এ দেশের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের স্বভাব একবার নষ্ট হয়ে গেলে কদাচিৎ আবার ভালো পথে ফিরে আসে। সামনে নির্বাচন আসছে। বাজারে রাজনীতির ধারা পরিবর্তনের কথা উঠছে। তাই আমার মাথায়ও বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেদিন তো একটা লেখাতে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেই ফেলেছি যে, এদেশে রাজনীতিই আমাদের মূল সমস্যা এবং দেশের জন্য একটা বিপদও বটে। কথাটা কিন্তু সর্বাংশে সত্য। 'রাজনীতি' একটা ভালো শব্দ, এটাকে আমরা পচিয়ে ফেলেছি। রাজনীতির বিষবাষ্প আমাদের সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অফিস-আদালত-প্রশাসন, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, অর্থব্যবস্থাকে ক্রমশই ধ্বংস করে ফেলছে। একথা সবাইকে মানতেই হবে। এটা দলীয় তর্কের ঊর্ধ্বে। এটাকে আগে মেরামত করা দরকার। আমরা আগে-ভাগে বেশি কিছু বলতে গেলেই কমেডিয়ান কাজলের কৌতুকের মতো কেউ আবদার ধরে বসেন, 'কলা ছুললে ক্যানো, বুজিয়ে দেও'। কলা ছোলা ছাড়া যে খাওয়া যায় না, এটা আমরা কেউ কেউ বুঝতে চাইনে। ছোলা কলা বোজানোও যায় না। আবার আমরা কখনো-সখোনো এসব কথা বুঝেও না-বোঝার ভান করি। এখানেই যত বিপত্তি। 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।' আসলে কথাটা 'ব্যবসায়িক রাজনীতি' নাকি 'রাজনীতির ব্যবসা' আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। তাই এই দুটো শব্দগুচ্ছের অবতারণা। এ দেশে এসব কেন-জানি গোলমেলে হয়ে গেছে। শব্দযুগল হতে পারে সমার্থক অথবা ভিন্নার্থক। এ নিয়ে মাথাটা আমি বেশি ঘামাতে চাচ্ছিনে। শব্দগুচ্ছদ্বয়ের বাস্তব প্রয়োগ এদেশে পুরোপুরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে, তাই।

সকালেই একটা পত্রিকায় খবরের হেডলাইনটা এরকম পড়লাম, 'সরকারি সার/৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাৎ'। খবর থেকে জানলাম, সার আত্মসাৎকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাবেক সংসদ সদস্য ও সার সমিতির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, তিনিই মূলত দেশে সারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন। এ দেশে যাদের নিয়ে যত অর্থ কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির খবর পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্যবসায়ী। ব্যবসার সাথে তারা জড়িত। সাথে রাজনৈতিক পদ-পদবীও কখনো থাকে। রাজনীতি এখন ব্যবসার টাকার কাছে নতজানু হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন টাকা কামানোর হাতিয়ার, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর রক্ষাকবচ। অনেক ব্যবসায়ী অবৈধ পথে ব্যবসা করছেন, আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক তরিকা মোতাবেক কাজ করছেন। কোথাও কোথাও সরাসরি রাজনীতিও করছেন। আমি একথা বলছিনে যে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারবেন না। বিষয়টা হচ্ছে, অনেক ব্যবসায়ীই ব্যবসাতে রাজনৈতিক পুঁজি খাটাচ্ছেন। অতি অল্প সময়ে অঢেল টাকার মালিক হচ্ছেন। রাজনৈতিক দাপট দেখিয়ে যা খুশি তা-ই করছেন। ভাবছেন-না এতে কার লাভ, কার ক্ষতি। দেশের আর্থিক সুবিধাকে শুষে পকেটে ভরছেন। এদের বিচার-আচারও সহসা হয় না। খোদা-না-খাস্তা বিচারের আওতায় আনলেও বিষয়টা বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁদে ফেলে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এটাও এক ধরনের প্রহসন। আমার অনেক ছাত্র ব্যবসায়ী। আমি নিজেও ব্যবসা শেখাই। অনেক ছাত্র বলে, 'স্যার, এ দেশে ব্যবসার অবস্থা ভালো না। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া ব্যবসা ভালো চলছে না, রাজনীতি করে ব্যবসা আনতে হয়'। তাই ব্যবসায়ীরা রাজনীতি (?) শুরু করেছে। 'রথ দেখা কলা বেচা' দুটোই চলছে। ব্যবসায়িক রাজনীতির 'রৌদ্রছায়ার লুকোচুরির খেলা'র নাটক এ দেশে অবিরাম মঞ্চস্থ হচ্ছে। পত্রিকার মাধ্যমেই সব খবর পাচ্ছি। পত্রিকার উদাহরণ বেশি দিতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না। এটাকে ব্যবসায়িক রাজনীতি বলবো, নাকি রাজনীতির ব্যবসা বলবো? কার লাভ পাঠকমহল ভালো জানেন। কার ক্ষতি এটাও প্রতিটা ভাত-খাওয়া লোক ভালো করেই বোঝেন। আবার দেশব্যাপী অধিকাংশ পণ্যের ভেজালের মহোৎসব চলছে। ব্যবসার মাঠে নীতি-নৈতিকতার বড্ড খরা চলছে। ব্যবসায়ীদের ইমান-আমান, মূল্যবোধ, হালাল পেশার অহংকার এই খরায় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন, এভাবে কি একটা দেশ চলা উচিৎ?

আমার অনেক ছাত্র রাজনীতিতে ঢুকেছে। বেশ ভালোই করছে। তাদের কাছে অনেক কথাই শুনি। ছোটবেলা থেকে বইপত্রে পড়ে আসছি, রাজনীতি মানে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা, নিজের স্বার্থকে মানুষের জন্য ত্যাগ করা–

এমনই অনেক কিছু। রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেও হয়তো তা-ই লেখা আছে। ছাত্রদের অনেকেই খোলামেলা কথা বলে। রাজনীতির বাস্তবতা ভিন্নরূপ। রাজনীতি করতে হলে মিথ্যা বলা ও টাকা ছাড়া নাকি একপাও এগোনো যাচ্ছে না। পদ পেতে গেলেও টাকা, নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলেও টাকা, নির্বাচন করতেও টাকা। আবার নির্বাচনে পাশ করেও টাকা কুড়ানোর আম-ধরাধরির খেলা। বর্তমানে রাজনীতিই একটা টাকার খেলা। অঢেল টাকা কামানোর জন্য রাজনীতি কিংবা রাজনীতির জন্য টাকা– দুটো কথাই এ দেশে সমভাবে খাটে। এ নিয়ে আমার মতো চুনোপুঁটির কিছু করার নেই, তাই দু-এক কথা লিখে সান্ত্বনা খুঁজি। এ দেশের এমপিদের শতকরা কত ভাগ দুর্নীতির সাথে জড়িত, তার একটা খতিয়ান টিআইবি কয়েক বছর আগে গবেষণার ফল হিসেবে দিয়েছিল। সে হিসেব এ ক-বছরে ভুলে গেছি। জানতে ইচ্ছে করে, এ দেশে রাজনীতি কি বর্তমানে একটা পেশা, নাকি ব্যবসা? নাকি ব্যবসা ও পেশা দুটোই? কোনো কোনো ছাত্র ব্যবসায়িক রসিকতা করে বিজ্ঞাপনের সুরে বলে, 'কী লবন দেবেন? লবনের আবার রকম কীয়ের? ভালো-মন্দ দুইট্যাই আছে'। আরো জানতে ইচ্ছে করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে রাজনৈতিক দলের যে কার্যাবলি পড়েছিলাম, সেগুলো কি ভুলে যাব? আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গাতেই ছাত্রদের কথার সত্যতা পাচ্ছি, রাজনীতি একটা রমরমা ব্যবসা। মিথ্যার বেসাতি। লাঠিয়াল বাহিনী পোষার ব্যবসা। নিজের চোখ ও কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনে!

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, লেলিনবাদ, মাওবাদ ইত্যাদির ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। এসব কিছুর জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতি ও 'জনকল্যাণবাদ'। এ দেশও মনে হয় অনেক 'বাদ'কে বাদ দিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলের আদর্শের কথা দলীয় গঠনতন্ত্রে থাকলেও বাস্তব প্রায়োগিকতা নেই বললেই চলে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় আমিও ওগুলো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পরামর্শ দিই। আমি বলি ভিন্ন কথা।

কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো দলীয় জোট নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় গেলে তারা দেশের উন্নতি ও জনকল্যাণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেবে, কীভাবে নেবে, সবটুকুই এদেশের নাগরিকদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত ও দফা আকারে জানাবে। ভোটাররা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবে। ভোট দেবে রাজনৈতিক আদর্শ দেখে নয়, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি দেখে, সম্পদ লুটতরাজ করা লোকের কর্ম-সম্পৃক্ততা দেখে। রাজনীতিতে কি বর্তমান ধারাই থাকবে, নাকি নতুন কোনো ধারার প্রবর্তন করবে? জানা দরকার, ভোটব্যবস্থায় নিজের ভোট

নিজে দেবার সুব্যবস্থা থাকবে, না থাকবে না? অনেক কিছুই জানা দরকার। আমাদের যেহেতু কোনো ফোরাম নেই, পত্রিকার মাধ্যমেই আমরা প্রয়োজনীয় কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। দেশের মানুষ নির্বাচনের পরও কাজের সাথে কথা মিলিয়ে দেখে পরবর্তী দিনের সিদ্ধান্ত নেবে।

সেক্ষেত্রে বিএনপির প্রকাশিত ২৭ দফার পরিবর্তে তাদের আরো বিস্তারিত কথা বলতে হবে। অনেক বিষয় আছে, না-বলা রয়ে গেছে। দেশের সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, ব্যবসায়িক রাজনীতির অস্তিত্ব থাকবে, নাকি ঢেলে সাজাতে হবে; রাজনীতিবিদরা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবে, নাকি দেশসেবা-সমাজসেবার ওল্ডমডেল (?) নীতি আকড়িয়ে ধরে সামনে এগোবে– সব কথা খোলামেলা জানাতে হবে। এ দেশের নিকষ-কালো রাজনীতিকে কীভাবে খোল-নলচে বদল করে ভালো করবে সে কথাও লিখতে হবে। গলাটা একটু ঝেড়ে কাশতে হবে। সব কথাই লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলও তাদের দেশ পরিচালনার নীতিমালা-কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে আসতে পারে। দলীয় কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরতে পারে। কীভাবে নির্বাচন করতে চায় আগে আগে বলতে পারে। দলীয় সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারে। দলীয় রাজনীতির অধীনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচন কেমন হবে– এটা সাধারণ মানুষের কাছে ওপেন-সিক্রেট। 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়।' এ নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি ও বিবাদ-বিসম্বাদ না করাই ভালো। তারা অনেক অনেক অবকাঠামোগত উন্নতি করেছে, এগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে।

ফার্সি ভাষার নামকরা এক কবির একটা কবিতা পড়েছিলাম। সারকথাটা এরকম: বিড়ালের যদি পাখা গজাতে দেওয়া হতো তাহলে ঘরের চালে বসবাসকারী শান্তিকামী চড়ুই পাখিগুলোর জীবন সংহার হয়ে যেত। এ দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে বিড়ালের পাখা গজাতে দিতে আমরা রাজি নই। এ দেশের প্রতিটা সচেতন মানুষের এ বোধোদয় যত তাড়াতাড়ি হয় ততই সবার জন্য মঙ্গল। সব রাজনৈতিক দলীয়-প্রধানের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন কোনোভাবেই বিড়ালের পাখা গজাতে না দেন।

(প্রকাশ: ৮ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

ভালো কিছু করতে ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ঠ

যখন কলম ধরেছি মার্চ মাস চলছে। লেখাটা হয়তো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ পাবে। ভাবলাম, আমার মতো দুর্মুখের এসব নেগেটিভ কথা স্বাধীনতার মাসে মানায় না। এ লেখা স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবগাঁথা কোনো সুন্দর লেখার পাদটীকা হিসেবে দেখলেই চলে। এ ধরনের পাদটীকার গুরুত্বও সময়োপযোগী। তাই এই বিলম্বিত ক্ষুদ্র প্রয়াস। এদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অনেক ভালো ভালো দিককে, অনেক ত্যাগের কথাকে এ মাসে আমরা কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। মার্চ ও ডিসেম্বর মাসে আমরা স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলোকে লিখে পত্রিকার পাতাগুলো ভরে ফেলি। কিন্তু চেরাগের নীচের অন্ধকার'কে আমরা আমলে নিইনে, দূরও করিনে। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই যেমন বাংলা ভাষা নিয়ে লেখার হিড়িক পড়ে যায়। এতে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের অতীত জানতে পারে, দেশ গড়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য এই যে, এদের সামনে আমরা না পারছি দেশ গড়ার ভালো কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে, না পারছি তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়তে, না পারছি সুন্দর একটা পরিবেশ দিতে। যারা এদেশকে শুষে খাচ্ছে এবং যাদের এদেশে থাকার কোনো-না-কোনো দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে, তারা বাদে অধিকাংশ নাগরিকের মাথায় একটাই চিন্তা, কীভাবে যত দ্রুত পারা যায় এদেশ ছেড়ে ভিন্ন কোনো দেশে শান্তির ঠিকানা খোঁজা যায়। স্বাধীনতা অর্জনে যে প্রজন্ম প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল, তাদের অনেকেই ধীরে ধীরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে আশ্রয় নিয়েছে; যারা আছেন তাদেরও সূর্য অস্তগামী। এ তিনটি মাসই এ দেশের গর্ব। আমি বিশ্বাস করি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার ঘোষণা– তিনটিই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এখন প্রশ্ন, অন্য মাসগুলোতে আমরা দেশ ও ভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করি কি-না? এখন আমরা কোনো অন্যায়, দুর্নীতি, শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই কি-না? এখন আমরা সামষ্টিক স্বার্থ ভুলে ব্যক্তি-স্বার্থে অন্যায় ও শোষণের সাথে আপস করি কি-না? দুর্নীতি দেখতে দেখতে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, অনেকেই আপস করেছি; অনেকেই দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ও আটপৌরে ভেবে মেনে নিয়েছি। এসবই সমাজ ও মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তনের আয়না।

দেশ ও ভাষা নিয়ে এখন হারাবার তো আর কিছুই নেই। অতীতকে আবার মানুষ হারায় কী করে? এখন শুধু কাজ করার সময়, দেশ গড়া ও উৎকর্ষ সাধনের সময়।

ভাষার উন্নতি করতে পারি, দেশেরও উন্নতি করতে পারি। আমরা কি তা করছি? এই একান্নবছরে আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? বাস্তবে আমাদের চর্চা কী? আমরা কি ঠিক পথে এগোচ্ছি? নিজের কাছেই একবার প্রশ্ন করি না! আমাদের কি মানসিক বৈকল্যে ধরেছে? শতেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘোরে। আমরা কি আমাদের ইচ্ছেশক্তির একটু উন্নতি করতে পানিনে? আমরা যত তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই দেশ চালাই না কেন, শেষ পর্যন্ত তো আমাদেরকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই ফিরে আসতে হয়। রাজনীতির কাছে দেশকে ও দেশের মানুষকে সমর্পণ করতে হয়। এর কোনো বিকল্প তো আমরা চারদিক তাকিয়ে কিছুই দেখিনে। রাজনীতিই যখন শেষ ভরসা, সেই রাজনীতিকে আমরা এতটা বছরে ভালো একটা ভিত্তি ও সংস্কৃতির উপর দাঁড় করাতে পারলাম না কেন? আমাদের কথা, কর্ম ও ইচ্ছেশক্তির ব্যবধান কি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে? এদেশের লোকজন কেন ক্রমশই মনুষ্যত্বের গুণাবলি হারিয়ে ফেলছে! আমি রাজনীতির সাতে-পাঁচে থাকিনে সত্য, কিন্তু কান টানলে মাথা আসে, ফলটা মাথায় এসে পড়ে। তখন আর চুপ থাকতে পারিনে। কোনো দলকানা না-হয়ে নিখাদ বাস্তবতা নিয়ে সোজাসাপটা কিছু কথা বলি। তাই রাজনীতি নিয়ে লিখতে ইচ্ছে না হলেও কখনো কখনো এ বিষয়ে চাপা ক্ষোভটা প্রকাশ করতে বাধ্য হই। কারণ রাজনীতির অবস্থা মানেই দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব। এদেশের রাজনীতি মানে রাজনীতি দিয়ে যে-সব যোগ্য (?) ব্যক্তি নিজের জন্য ভালো কিছু পেতে চায়, দলের জয়কীর্তন গেয়ে, খোল-সানাই বাজিয়ে, আসর মাতিয়ে নিজের ঘরে ফসল তুলতে চায়, আমরা তো শুধু তাদেরকেই সাথে পেতে চাই; তারাই 'আসরে কল্কে পায়'।

এই যে মানুষ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে যত কথা বলছে, অথচ বাস্তবে যা করছে, তার কথার সাথে কাজের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মিল নেই। কম পড়লেই পরে টের পাই। বুঝি, ইচ্ছেশক্তি নেই, লেফাফাদুরস্ত কথা আছে। ইচ্ছেশক্তি থাকলে এই একান্ন বছরে অবশ্যই অনেক কিছুই করতে পারতাম। যে রাজনীতি একটা দেশের উন্নতি-অবনতির নিয়ামক, অন্তত সেটাকে এতটা বছরেও একটা সুস্থ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারলাম না কেন? কথাগুলো বলতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি, কি জানি কে কিভাবে নেয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে, এ দেশের যত অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতির ব্যবসা, মিথ্যা ও নীতিহীনতার দাপট, সব কিছুই রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। রাজনীতি ভালো, তো দেশ ভালো। রাজনীতিতে 'নীতি' না থাকলে 'রাজনীতি' থাকে কী করে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টা এড়িয়ে যাবার কোনো অবকাশ নেই। রাজনীতি গড়ে উঠেছে 'সমাজসেবা', 'জনসেবা', 'দেশসেবা' শব্দগুলোর উপর ভর করে, সেখানে আবার ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ

আসে কী করে? অথচ আমরা তো রাজনীতিতে জনসেবার নামে, দলের নামে ব্যক্তিস্বার্থের জয়গান শুরু করে দিয়েছি। এদেশের সকল 'নষ্ট গুড়ের খাজা' এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতি। আমরা পারস্পরিক দোষা-দোষীর উপর ভিত্তি করে সব রাজনৈতিক দলগুলোই দাঁড়িয়ে আছি। সব জায়গায়ই ইচ্ছেশক্তির বড় অভাব দেখতে পাচ্ছি। পত্রিকা খুললেই ভীতিকর নেগেটিভ খবর। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ– শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ সক্রিয় ও কার্যকর থাকলে এত দুর্নীতি, অব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নয়ছয় পত্রিকার পাতায় আসে কোত্থেকে? এসব বিভাগের জবাবদিহি, ইচ্ছেশক্তি কোথায়?

আমি একজন প্রফেশনাল এ্যাকাউনটেন্ট। ছাত্রজীবন থেকেই বড়-টাকার অঙ্ক পড়া ও লেখার অভ্যাস। এ দেশের বড় বড় টাকার অঙ্ক আত্মসাৎ ও পাচারের কাহিনী পত্রিকায় পড়ে আমার চোখ চড়কগাছে উঠে যাচ্ছে। এর নামই কি রাজনীতি? নির্বাচনের পদধ্বনি শুনছি। যেভাবেই হোক একটা নির্বাচন হলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তাহলে এ দেশের রাজনীতির উদ্দেশ্য আসলে কী? এ প্রশ্ন আজ আমার মাথায় আসছে। এই একান্ন বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে এসব নেগেটিভ কথা ভাবতে বাধ্য করছে।

ইচ্ছেশক্তি যদি থাকতো এই একান্ন বছরে অনেক কিছুই হতো, রাজনীতির সুস্থ ভিতটা অন্তত হতো। 'রাজনীতিতে নীতি'টা অন্তত তৈরি করতে পারতাম। আমরা বলি, 'যাহা একান্ন তাহাই বায়ান্ন'। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ভাবি, একান্ন বছরে যা হয়নি, তা বায়ান্ন বছরে রাতারাতি হয়ে যাবে, এটা অলৌকিকভাবে হয়ে যাবে ছাড়া সম্ভবপর নয়। কারণ 'খসলত না যায় ম'লে, ইল্লত না যায় ধুলে'। বরিশালে গিয়ে একটা কথা শিখেছিলাম, 'আগের লাঙ্গল যেদিকে যায়, পিছনের লাঙ্গলও তার পিছ পিছ যায়'। কথাটা তো সত্য। এসব কথা বললে আমি আবার নৈরাশ্যবাদীর দলে পড়ে যায়। কিন্তু মনের উপর তো কোনো কবিরাজি চলে না। সাহিত্যের সাবলীল ভাষা দিয়ে অনেক অমূলক ভালো কথা লিখে কারো সুদৃষ্টি হাসিল করা যায় সত্য। কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে অতি আশার বাণী সুশ্রাব্য করে বললে যে প্রকারান্তরে মিথ্যা বলা হয়, এটাও তো মনে পীড়া দেয়। এটা প্রতারণার শামিল। আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। তাই আমি 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান' বলা যায়। কারণ বৈশাখি ঝড়ো মেঘের কাছে শ্রাবনের মুসলধারে বর্ষণ চাওয়া তো অবাস্তব, দুরাশাও বটে। অলৌকিক কিছু না ঘটলে আগামী এক বছরে 'মহান রাজনীতিবিদ'দের দিয়ে দেশের অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে আমার ভাবতে কষ্ট হয়। একথা এই কলামে অনেকবার লিখেছি যে, দেশের মানবসম্পদ নষ্ট করে,

বিপথে চালিয়ে দেশের উন্নতি কোনোক্রমেই আশা করা যায় না। আমরা দেশের উন্নয়ন বলতে যদি কতিপয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ভাবি, তাহলে ভুল হবে। প্রতিটা অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের প্রকৃত খরচের তুলনায় কয়েকগুণ টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে। এটা অপ্রত্যাশিত। মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অনেককিছু উন্নয়নের নামে আমরা যত বড় প্রজেক্টই হাতে নিই না কেন, এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ তেমন কিছু আসছে না। এগুলো কিসের আলামত? ইচ্ছে করলে অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়েও তা প্রমাণ করা যায়। এই স্বল্প পরিসরে হয়তো তা সম্ভব নয়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন,'ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না, যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। সবকিছুতেই মনে হচ্ছে, দেশের উন্নয়নে যা যা দরকার, তা করতে প্রথমেই ইচ্ছেশক্তি দরকার। সে ইচ্ছেশক্তি কি আমাদের আছে? সে ইচ্ছেশক্তিতে মনের কোণে গরমিল রয়ে গেছে।

আমি শিক্ষক। যখনই কোনো ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেষে বিদায় নিতে আসে, তাদের বাস্তবতা বোঝার বয়স হয়ে যায়। এদেশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অব্যবস্থা, প্রতারণাচক্র, রাজনৈতিক ব্যবসা, সীমাহীন মিথ্যাচার, বেকারত্ব, দলবাজির কথা আমার কাছে জানতে চায়, কারণ জানতে চায়। আমি কী উত্তর দেবো, কাকে দোষ দেবো, ভেবে পাই না। এ দেশের শহর, গ্রাম-গঞ্জ, ও প্রতিটা জনপদের খোঁজ-খবর আমি নিই, কখনো পত্রিকার মাধ্যমে, কখনো পরিচিতজনদের কাছ থেকে। জীবন ও সমাজ বিশ্লেষণ আমার অভ্যাস ও নেশা। সব জায়গাতেই দেখি ও শুনি, এদেশের সকল রাজনৈতিক দল রাজনীতির নামে আর্থিক রসদের বোতল ফিডারের মতো করে সমাজের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ 'সুবিধাভোগী চাটুকার' ও 'কর্তাভজা সম্প্রদায়ের' মুখে উপুড় করে ধরে রেখেছে। তারা পেট ভরে খেয়ে নিজেকে পুষ্ট করছে আর কর্তার গুণকীর্তন করছে। টাকা ছাড়া কোথাও কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না। এ আবার কেমন রাজনৈতিক ধারা আমরা তৈরি করেছি? এর শেষ কোথায়? জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ একবার নষ্ট হয়ে গেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি এতই সহজ?

আজকেই যুগান্তর পত্রিকায় পড়লাম, '...-এর হাতে টাকার মেশিন, পরিবারের সবাই কোটিপতি; দুদকের তদন্ত: ৫ বছরে ৩২ ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলন ২১ কোটি টাকা, গড়েছেন বিপুল সম্পদ' শিরোনাম। একজন ডিপ্লোমা পাশ প্রকৌশলীর 'কর্মগুণ'। এ তো এক দিনের চর্চা নয়, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই শুরু। মাত্রা ক্রমশই তীব্র গতিতে তীব্রস্বাদে বাড়ছে। আগে শুনতাম লক্ষ, লক্ষের জায়গায় এলো কোটি, তারপর শত কোটি, হাজার কোটি, বর্তমানে শুনছি

লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি। টাকার অঙ্ক শুনলেই প্রাণটা প্রথমে ধড়াস করে ওঠে, এত টাকা! বেশিরভাগ টাকাই নাকি বিদেশে পাচার হচ্ছে। এদের অনেকেই কি সরকারি কোনো-না-কোনো অফিসের কর্মচারী-কর্মকর্তা নন? কোথায় আইনের প্রয়োগ? অনেকেই বলবেন, 'কেন, ঐ যে, দুদক তদন্ত করছে। দুদক কত পরসেন্ট দুর্নীতির তদন্ত করছে? পুরো তদন্ত হলে তো 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়' হবে। এদেশে এ ভাইরাস তো করোনা ভাইরাসের থেকেও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এই একান্ন বছরে আমরা কি হরেক-রকম শোষণের নাগপাশমুক্ত হতে পেরেছি? ভাবতে অবাক লাগে, এত টাকা এদেশে ছিল কোথায়? প্রকৃতপক্ষে কাদের টাকা এগুলো? সাধারণ মানুষ কাদেরকে তাদের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল? তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে? দীর্ঘ একান্ন বছরের প্রপ্রাইটি (যথার্থতা) অডিট কী বলে? এদেশের রাজনৈতিক দলের জন্য আলাদাভাবে চিন্তা ও কর্মের বড় আকারের কোড অব এথিক্স প্রণয়ন, জবাবদিহিতার আইন প্রণয়নের সময় এসে গেছে। এদেশে অনেকেই আছেন যারা এ আইনের খসড়া প্রস্তুত করে দিতে পারেন।

(প্রকাশ: ৪ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

তোমরা যারে বলো কালো, আমি বলি কৃষ্ণকালো

অনেক পুরোনো দিনের একটা গল্প আজ মনে পড়লো। এক চাষাভুসা পরিবারের গল্প। ভাষার শোভা থাকার কথা নয়। জানি আমার মতো হদ্দ-চাষা বেরসিকের পক্ষে তার প্রকাশ বেশ মানানসই হবে। আবার অশিষ্ট সমাজের গল্প আধুনিক প্রগতিশীল যুগের চতুর-বুদ্ধিবৃত্তিক (?) সমাজে ঠাঁই করে নেবে। এটাইবা মন্দ কী! গল্পটা এরকম: বুড়ো বাপের কয়েকদিন ধরে বেশ 'লুজ মোশান' হচ্ছে। শরীরটা অনেক দুর্বল। ছেলে লজ্জায় বাপের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেও পারছে না। লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলে বাপকে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ বাপ, তোমার হাগা সেরেছে?' ছেলের প্রশ্নে বাপও একটু লজ্জিত হলো। বললো, 'না বাবা, না, লজ্জার কথা। এ পাছা থাকতে আর নয়।' এতেই ছেলে যা বোঝার বুঝে নিলো।

ঔরসজাত সন্তান হিসেবে বাপের অসুখ-বিসুখের খবর নেওয়া ছেলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই যত লজ্জার কথাই হোক, না জিজ্ঞেস করে গত্যন্তর থাকে না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আসলেই 'পাছা থাকতে হাগা সারবে না', বাপের বিশ্বাস একশ ভাগ সত্য। কিন্তু 'লুজ মোশানের' ভারসাম্য তো রক্ষা করা যায়! পেটের ব্যামোটা তো অন্তত আরোগ্য হওয়া প্রয়োজন। নইলে যে, গুরুজন বাপের অক্কা পাওয়ার নির্ঘাত সম্ভাবনা দেখা দেয়। খাদ্য-খাবার শরীরের কোনো কাজে লাগছে না, পুরোটাই পেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। শরীরে ক্রমশই পানিশূন্যতা দেখা দিচ্ছে। বাপের 'হাগা নাড়ি, মুখে জোর'। এসব কিছু ডাক্তারকে বিবেচনায় আনতেই হবে। রাষ্ট্র-পরিবারের একজন নগণ্য নাগরিক বা সদস্য হিসেবে কথা না বলে নির্লিপ্ত বসে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যত লজ্জার ও শ্রুতিকটুই হোক সময় এসেছে এসব বিষয় নিয়ে ভাবার।

বুদ্ধিশুদ্ধি একটু হওয়ার পর থেকেই দেখছি দেশটা রাজনীতিবিদরা চালাচ্ছেন। সেও একান্ন বছর হয়ে গেল। দেশে কখনো সামরিক শাসন জারি হলেও আবার রাজনীতিকদের হাতে দেশ ফিরে গেছে। তাই দেশের ভালো-মন্দ সবকিছুর দায় রাজনীতিবিদরা এড়াতে পারেন না। কিন্তু এতটা বছরেও রাজনীতির প্রতি কোনোভাবে আশান্বিত হওয়া যাচ্ছে না। 'লুজ মোশান' রোগে বাপের যে প্রাণবায়ু বের হবার উপক্রম হচ্ছে! রাষ্ট্র পরিচালনার সিস্টেমের মধ্যে কোথাও কি কোনো গলদ আছে? রোগের সাময়িক উপশম কোনো রোগের নিরাময় নয়।

সামনের বাজেট আলোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় শুরু হয়ে গেছে। আমিও সেটা দিয়েই শুরু করি। আমরা জানি, অতীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সংখ্যাত্বক

বা আর্থিক পরিকল্পনা ও তার নিয়ন্ত্রণই বাজেট। বাজেটের যথার্থ প্রয়োগ জাতীয় উন্নয়ন। বাজেট তৈরি হয় পরিকল্পনা আকারে, কিন্তু সারা বছর এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে হয়। আমরা যাকে বলি 'বাজেটারি কন্ট্রোল'। বাজেটে নিয়ন্ত্রণহীনতা দাঁড়-বৈঠাবিহীন জলযানের সমান। আবার পরিকল্পনার ভিত্তিতে গলদ থাকলে শুধু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা দিয়ে বেশি একটা সফলকাম হওয়া যায় না। আমাদের বাজেটব্যবস্থায় বাস্তবে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। আমাদের 'গমও উদা, যাতাও ঢিলা'। পত্রিকার বিভিন্ন খবর পড়লেই এর সত্যতা ধরা পড়ে। রাষ্ট্র তার কোষাগার থেকে একশ টাকা খরচ করলে সেই একশ টাকা সমমূল্যের সম্পদ ও সেবা রাষ্ট্রকে অর্জন করতেই হবে। আরো সহজে বললে, রাষ্ট্র তার কোষাগার থেকে পাঁচশ টাকা ব্যয় করে একটা ক্যালকুলেটর কিনলে পাঁচশ টাকা মূল্যের ক্যালকুলেটর তাকে পেতে হবে। পাঁচশ টাকা ব্যয় করে দু'শো টাকা মূল্যের ক্যালকুলেটর নামের সম্পদ প্রাপ্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার মানে জনগণের আমানত। এটা খেয়ানত করা বড় রকমের অপরাধ। আজ একান্ন বছর ধরে এভাবে সাধারণ মানুষের আমানতের অনেকাংশ খেয়ানত হয়ে চলেছে। বছর যত যাচ্ছে তহবিল তছরুপের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশের বাজেটব্যবস্থা বানরের পিঠে ভাগের সাথে তুলনীয় হয়ে গেছে। দেশ-পরিচালকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। অথচ তারা আমানতদার। এর জবাবদিহি কে বা কারা করবে? এই একান্ন বছরে এর জবাবদিহি কেউ করেছে কি-না? জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা আছে কি-না? আমরা জনগণের ভোট-ব্যবস্থার উপর জবাবদিহিতার ভার ছেড়ে দিয়েছি। পরিচালকরা কৌশলে গণরায়কে পাশ কাটানোর ফন্দি আবিস্কার করে ফেলেছেন। আবার গণরায় নিয়ে কোষাগারের অর্থ বণ্টণের কাজে গেলেই যে ফান্ড সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হবে, কর্মকাণ্ড সুন্দর হবে, এ নিশ্চয়তা কোথায়? লালন গেয়েছিলেন, 'দেখেশুনে জ্ঞান হলো না, দুধেতে মিশালি চোনা-আ'। টেকনোলজির উৎকর্ষ ও মনুষ্যত্বহীনতার এই মহামারির যুগে যে কোনো প্রকারে নিজের পাতে ঝোল টানার প্রবণতা তো ওপেন-সিক্রেট ব্যাপার। এখানে সিস্টেমের ভারসাম্য কোথায়?

আমাদের দেশে যে খাদকগোষ্ঠীর উদ্ভব ও উদ্ভাবন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, বাজেটব্যবস্থা ছাড়াও দেশের হেন কাজ নেই, এমন কি- নদীর ধারে বসিয়ে দিলে 'ঢেউ গোনা'র নামেই দেশ-পরিচালকদের পোষ্যপুত্ররা এবং কোষাগার থেকে পোষা অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা সাধারণ মানুষের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে রসদ বের করে আনছেন। কেউ শত কোটি, কেউবা হাজার হাজার কোটি টাকার

মালিক হচ্ছেন। কেউবা ব্যাংক লুট বা টাকা পাচারে যোগ দিয়েছেন। যারা ভবলীলায় লাভবান হচ্ছেন, তারাই কেবল দুর্বিনীত দুরাচারদের স্বপক্ষে কোরাস ধরে নানান ভঙ্গিতে সুর টানছেন। সাধারণ মানুষ নিস্তব্ধ-নির্বিকার, শোষিত। আমিই-বা এর প্রমাণ হাজির করবো কেন? এদেশের প্রতিটা মানুষের চোখ ও কান এবং বাস্তবতা এর সাক্ষী। বছরব্যাপী প্রকাশিত অসংখ্য খবরের কাগজের পৃষ্ঠা এর রাজসাক্ষী। এ-ও তো ওপেন-সিক্রেট ব্যাপার হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের কাছে এর জবাবদিহিতা থেকে আমরা কেউ-ই রেহাই পেতে পারিনে। এভাবে আমরা অর্ধ-শত বছর পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। 'উন্নয়ন' শব্দটা এখন বহুল-ব্যবহৃত 'বিজ্ঞাপন' শব্দে রূপ নিয়েছে। উন্নয়নের জন্য কাউকে না কাউকে ধন্যবাদ দিতেই হবে, কিন্তু উন্নয়নের সাথে এ কাজে সিস্টেম লসের পরিমাণটাও উল্লেখের দাবি রাখে, যার জন্য 'যথার্থতা নিরীক্ষা'র একটা টিমও দরকার। মানুষের কথা ক্রমশই মূল্য হারাচ্ছে। বাংলা শব্দগুলো তার ভারিক্কি ভাব হারাচ্ছে। 'সততা', 'মিথ্যাচার', 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা', 'দোষা-দোষী', 'উন্নয়ন-দুর্নীতি', 'দুরাচারবৃত্তি' শব্দগুলো এখন সাধারণ মানুষ 'কথার কথা' হিসেবে গণ্য করেন। প্রশ্ন জাগে, আমাদের গন্তব্য কোথায়? আমি কলম ধরেছি বলেই আমাকে যে-কোনোভাবে শায়েস্তা করাটাই 'লুজ মোশান'-এর সমাধান নয়। রাষ্ট্র-পরিবারের একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে কলমের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আমার তো আর কোনো অবলম্বনও নেই (আমি তো লাঠি ধরতে শিখিনি, রাষ্ট্রও আমাকে লাঠি ধরতে শেখায়নি)।

এই তো ক'দিন হলো রমজান মাস শেষ হলো। ইফতারিতে আলুর চপসহ প্রতিটা আইটেম খেতে গেলেই আমার চোখে ভাসতো কাঁচা আলুর দাম প্রতি কেজি কত, বেসনের কেজি কত? এক কেজি আলু দিয়ে কয়টা আলুর চপ তৈরি হয়? কত পড়তা পড়ে? কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে? দামের যথার্থতা কতটুকু? এর মধ্যে যৌক্তিক লাভ কত? মার্জিনের কত টাকাই-বা ক্রেতাকে শোষণ? জীবনের প্রতিটা পদে পদে প্রতিটা পণ্য বা সেবার মধ্যে এর যথার্থতা (প্রোপ্রাইটি), যৌক্তিকতা খুঁজি। স্বাদের আলুর চপ বিস্বাদ লাগে। রাষ্ট্র ও জীবনের প্রতিটা সিস্টেমের যথার্থতার খুটিনাটি খুঁজি, ময়না তদন্ত করি। হয়তো 'পেশাদার ব্যবস্থাপনা হিসাববিদ' বলেই প্রতিটা সিস্টেমের কৌশলগত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও সবকিছুর শব-ব্যবচ্ছেদ মনের অজান্তেই আগেভাগে মনে ভেসে ওঠে। 'কৃষ্ণ' হয়তো একটু রঙে কালো, তার কর্মকাণ্ডকে ভবলীলা বলে গণ্য করা যায়। কলোর মধ্যেও তো ভালোকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই সবাই যাকে কালো দেখে, আমি দেখি কৃষ্ণকালো। যত নগণ্যই হোক অনেকেই দেখে পণ্য ও সেবার

বিক্রিতে লাভের পরিমাণ কত। আমার চোখে ধরা পড়ে সিস্টেম লস কত, শোষণ কত। লস অব অপরচুনিটি কত। কি করেছি সে কথা না, কি করতে পারতাম, সেটা পেরেছি কি-না, সেটা দেখা। কতটুকু উন্নতি করেছি সেটার তুলনায় কতটুকু যথাযথ ও যৌক্তিক উন্নয়নের সুযোগ হারিয়েছি এটা বিবেচনায় আনা আশু প্রয়োজন। এদেশের লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে, পাচার হচ্ছে শুনি। আমার চোখে ভাসে, মোট আয়ের একটা অংশ নিশ্চয়ই পাচার হচ্ছে। পাচারকৃত টাকাই যদি এত কোটি হয়, তাহলে দেশের মোট আয় আরো কত? আহা, মোট আয়ের পুরোটাই যদি সম্পদ ও সেবার উৎপাদনে দেশের কল্যাণে ব্যয় করা যেত, কত উন্নতিই-না হতো! বাজেট বরাদ্দের পুরো টাকাটাই যদি সমপরিমাণ সম্পদ অর্জিত হতো! আমরা বড় কপাল পোড়া। দু-দুবার স্বাধীন হলাম। কিন্তু স্বাধীন জাতির স্বাদ পুরোটা পেলাম না। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হলো না! এদেশের দেশ-চালকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। সেজন্যই দলের নামে হোক বা জোটের নামে হোক ক্ষমতায় গিয়ে অথবা যাওয়ার জন্য নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করার এত প্রতিযোগিতা; এত চাটুকার-স্তাবক।

দেশ-চালকরা নিয়ম মোতাবেক দেশ চালাতে থাকবেন। তারা আমাদের জনপ্রতিনিধি, আমাদের সম্মানীয়। ইস্পাতই যদি হবে, আশি মন লোহার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যেতে তো ভয়ের কিছু নেই। রাজনীতির নামে দেশ-শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হলে রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামো রিস্ট্রাকচারিং করা প্রয়োজন। 'ট্রায়াল এ্যান্ড এরোর' অনেক হয়েছে, আর নয়। একটা বহুজাতিক কোম্পানি বিশ্বব্যাপী তার ব্যবসা-ব্যবস্থাপনার নীতি মেনে সুন্দরভাবে চালাতে পারলে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটা দেশ চালানো কঠিন এমন কী! একটা ভারসাম্যপূর্ণ সরকার পরিচালনা নিশ্চিত করা সম্ভব। কোম্পানিতে কোনো ব্যবস্থাপক বা তার অধীনস্ত কেউ তার নীতি-নৈতিকতা হারালে, দুর্নীতি করলে, অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তাকে জবাবদিহি করতে হয়। একটা দেশ চালানোর কাজে সরকারের দায়িত্ববোধের ব্যতয় ঘটলে, প্রত্যাশিত জনসেবা না দিতে পারলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেই বহন করতে দেওয়া উচিত। দেশ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করতে অঢেল সুয়োগ-সুবিধা বা মুক্ততা দেওয়া কোনোমতেই উচিত নয়। বলা যায়, সকল অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার সূতিকাগার হয়েছে এই দিগ্ভ্রষ্ট রাজনীতি; এদেশের পুরো জনসম্পদকে 'জনআপদে' পরিণত করে ছাড়ছে। 'পীর মানা যায়, পীরের বদ-খসলত মানা যায় না।' যে কোনো মূল্যে দেশ ও দেশের মানুষকে রাজনৈতিক দলের জিম্মিদশা

থেকে মুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভারসাম্য আনতে হবে। রাজনীতিকদের হাতে সরকার চালনার কর্মভার থাকবে। তারা দেশ ও জনগণের সেবা করবেন। জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং সরকারের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে দেখভালের দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্র একাকী এ দায়িত্ব পালন করবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় একটা টিম বা গ্রুপ অব পিপল থাকবে। টিমের একজন প্রধান থাকবেন। টিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তাদের কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। তারা হবেন দেশের অরাজনৈতিক সুশিক্ষিত পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের পুরোধা। তারা সম্মিলীতভাবে হবেন জনগণ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জিম্মাদার। টিম বা গ্রুপ একটা নির্দিষ্ট-সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। নির্বাচকমণ্ডলী দেশের অরাজনৈতিক পেশাজীবী ও সুশিক্ষিত নাগরিক-সমাজের মধ্য থেকে গঠিত হতে হবে। এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনীতিবিদ এবং অরাজনৈতিক সুশিক্ষিত পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভারসাম্য তৈরি করা যায়। এতে রাজনীতিবিদরা টিকে থাকার স্বার্থে জনসেবা করতে বাধ্য হবেন, বেপরোয়া-নীতিবিগর্হিত কাজ থেকে বিরত হবেন। দুর্বৃত্ত-দুরাচার পুষলে দেশ-চালনার কাজ থেকে বহিষ্কৃত হবেন। দেশ ও জাতি রাজনীতিবিদদের সুস্থ সেবা পেয়ে ধন্য হোক, এটা সবারই কাম্য। কোনো রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে জনস্বার্থবিবোধী বা দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে, 'দলবাজি' করলে, দুর্নীতি করলে রাষ্ট্রীয় টিম তার বিহিত করতে পারবে। রাষ্ট্রীয় টিম নির্বাহী বিভাগ, বিচারব্যবস্থা ও আইনবিভাগের কিছু কর্তৃত্ব সাথে নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বা যখন প্রয়োজন, নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় টিমের তত্ত্বাবধানে দেশের যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এভাবেই রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও জবাবহীনতার অবসান হবে। সম্মানীত বৃদ্ধ বাপ কখনো কখনো ওষুধের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে অনিহ হন জানি, এ বিষয়ে ডাক্তার ও আপনজনদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে যথাসময়ে এগিয়ে আসতে হবে।

(প্রকাশ: ৮ মে ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ করল না

সংসদে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন চলছে। তাই বাজেটে প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, এর খাত ও অর্থসংস্থান, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। এ স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশও কম। এখানে তত্ত্বকথা ও পরিসংখ্যানের তুলনায় দুচোখ মেলে বাস্তবতা দেখাকেই প্রাধান্য দিতে চাই। তবে আলোচনায় একটু ভিন্নমুখীতা তো থাকবেই। আমি বাজেটের প্রকৃতি, নীতি ও সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো, যার সাথে এ বাজেটের সম্পৃক্ততা কম। পত্রপত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে যেসব আলোচনা আসছে, অধিকাংশই স্বল্প-মেয়াদী, আগামী এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাজেট কিন্তু আর্থিক পরিকল্পনা। ভিত্তিহীন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমমেয়াদীও হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বা মধ্যমমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার বাৎসরিক রূপের নামই বাজেট। তাই দীর্ঘ ও মধ্যমমেয়াদের নীতি ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে বাজেট হয় না। আবার সম্ভাব্য আর্থিক পরিকল্পনার আওতা যত বিশালই হোক না কেন, বাজেট বিষয়টাই নিরস ও কাটখোট্টা কিসিমের। তৈরিতে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো লাগে। তাই পত্রিকার জন্য কোনো নিবন্ধ রচনায় রসের প্রলেপ না থাকলে সে নিবন্ধ সাহিত্য আসরে কল্কে পায় না, কারণ নিবন্ধও তো সাহিত্যের একটা রূপ। সেজন্য নিবন্ধ রচনায়ও রসবোধ থাকা চায়।

প্রথমেই একটা গল্প বলে নেয়া যাক। গল্পটা এরকম: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের গ্রাম থেকে পনেরো কি:মি: ভাটিতে চারপাশে জলাভূমিতে ঘেরা এক গ্রামের একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর ঐ বাড়িতে একজন অল্প-শিক্ষিত মৌলবি কোনো এক কাজে এলেন। বৈঠকখানায় বসে বড়দের সাথে কথাপ্রসংগে বললেন, 'তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ করলো না।' আমি বরাবরই একজন গুণমুগ্ধ শ্রোতা; তখন সবে কৈশোর পেরিয়েছি। কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, 'কথার অর্থ আমাকে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।' তিনি বললেন, 'কড়াইয়ে ডাল তেলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মাফিক তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। নিয়মমতো তেলের উপর ফোড়নও দেওয়া হয়েছে। কড়াইয়ে তেল গরম না হতেই ডাল ঢেলে দেওয়া হলো। ডালটা নীরবে তেলের সাথে মিশে গেল। একটুও 'ফ্যাচ' শব্দ করলো না। বলা যায়, তেলটা নষ্ট হলো।' এতটা বছর পর জীবনের পড়ন্ত বিকেলে এসে সে কথাটা বাংলা ভাষায় বাগ্‌ধারা হিসেবে জীবনের পদে পদে ব্যবহার করতে পেরে ভালো লাগছে। আরো ভালো

লাগছে সেই সত্তরের দশকে 'আয়কর' বিষয়ে ক্লাশে পড়া অনেক প্রশ্নের মধ্যে দু-একটা জিইয়ে রাখা প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতে পারছি ভেবে। আমি জানি, এ ভাবনার মতো আরো শতেক ভাবনা এখন বলতে না পারলে হয়তো অচিরেই আমার সহগামী হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। সে জন্যই নিবন্ধে 'জীবন-থেকে-নেয়া' ঘটনার অবতারণা করি।

বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর কমপক্ষে একমাস ধরে চলে কোন কোন আইটেমের উপর কর ধার্য হলো, কোন আইটেম করের বাইরে থাকলো। এর প্রভাব বাজারে কেমন পড়বে ইত্যাদি নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি। বাজেট-পূর্ব ও বাজেট-পরবর্তী আলোচনা যা হয়, এর মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ হয়। বাজেট মূলত ব্যয়ভিত্তিক পরিকল্পনা। সারা বছরের সরকারি সম্পদ ও সেবা অর্জনের ব্যয়। ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে আয় নির্ধারণ করা হয়। পরিমিত আয়ের খাতে টান পড়লে ব্যয় করবেন কোথা থেকে! পর্যাপ্ত আয় করতে পারলে হাত ভরে প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যায়। আমরা করের সমতার নীতিমালা মেনে কি ঠিকঠাকমতো আয় করতে পারি? বাজেটের আয় ও ব্যয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গলদটা তো এখানেই। সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন থেকে যে সেবা আমরা অর্জন করি তা পেতে সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ বছর এ ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব ৬২ শতাংশ। একে সরকারি পর্যায়ে সেবা উৎপাদনের ব্যয়ও বলা যায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ প্রদেয় সুদ বাবদ ব্যয় রয়ে গেছে। আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবা পেতে কোষাগার থেকে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি– বিষয়টা নিয়ে আমরা আদৌ ভাবনা-চিন্তা করি কি-না? অর্জিত সেবার তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেলে বাজেট যে একটা পরিকল্পনা, তা সুষ্ঠু হয় কী করে? এসব তো কোনোদিন আলোচনায় আসতেই দেখিনে। তাহলে ব্যয়ের যথার্থতা বুঝবো কীভাবে? অনেক ক্ষেত্রেই বাজেট থেকে অনেক টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রজেক্টও পরিচালনা করি। প্রজেক্ট শেষে বা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শেষ হবার পর এর মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়। আমরা চর্মচোখে আনাড়ির মতো অনেক প্রজেক্টের বাস্তব সুফল সম্বন্ধে যে ধারণা পাই, তাতে প্রজেক্ট শব্দটা নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। এ তিক্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেই অর্জিত সেবা ও পরিকল্পিত ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। নইলে সেই মৌলবি সাহেবের কথা 'তেলের নামে তেল গেল, ...' মনে পড়ে যায়। এদেশে তো 'সরকারমে মাল, দরিয়ামে ঢাল' কথাটা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আর কতকাল শুনতে হবে? এর জন্য কি কাউকে জবাবদিহি করা যায়? স্বল্পমেয়াদী এ বাজেট পরিকল্পনায় পরিচালনা খাতে যত ব্যয়, এদেশ তত বাঞ্চিত সেবা প্রকৃত অর্থে

অর্জন করতে পারছে কি-না? এ পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ঋণের সুদের কিস্তি যোগ থাকলে সুদকে অর্থসংস্থানের ব্যয় বলা যায়। অর্থসংস্থান করে কী করেছি, জানা দরকার। ঋণ করে কোনো সম্পদ অর্জনে টাকা বিনিয়োগ করেছি কি-না? সে সম্পদের নীট বর্তমান মূল্য কত? ঋণ করে ঘি খেয়েছি কি-না? আমাদের সমাজে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ঋণ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস কেউ কেউ গড়ে তোলেন। এ অভ্যাস ভালো ফল বয়ে আনে না। আমি আমাদের গ্রামের কারও কারও এ অভ্যাসের কারণে ভিটে-বাড়িও বিক্রি হয়ে যেতে দেখেছি। বাজেট একটা আর্থিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। আমাদের সে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কোথায়? আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, তারা ঘি খাওয়ার জন্য ঋণ করে না।

ভারত নিয়ে আরেকটা উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারত এবং বাংলাদেশ রাশিয়া ব্লকে থেকে রাশিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে। আমরা একটা নির্দিষ্ট মূলধনের অধিক মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করে তার হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসানের জের বাজেট বরাদ্দের নামে দীর্ঘ বছর ধরে টেনেছি, এখনো অনেক টানছি। দেখার বিষয় হলো, ভারত কিন্তু রাশিয়ার মতো করে আমাদের জাতীয়করণ নীতি তখন অনুসরণ করেনি। দীর্ঘ বছরের বাজেটে লোকসানের এ জের টানার উল্লেখযোগ্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এখানেও মৌলবিসাহেবের সেই কথা, 'তেলের নামে তেল গেল, ...।' নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথাকে বিবেচনায় এনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা মিল-কলকারখানা জাতীয়করণ করেছিলাম। আমি বাম-ঘরানার কমরেডদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, এর ফলে টার্গেট শ্রেণি কোনোভাবেই এ পর্যন্ত উপকৃত হয়নি। উপকৃত হয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা, 'বুর্জোয়া সরকারি কর্মকর্তারা' ও সমসাময়িক 'রাজনৈতিক বুর্জোয়া নেতারা'। তার বড় রকমের প্রভাব পড়ে আসছে আমাদের বাজেটে। লোকসানের ভারটা সবসময় সাধারণ মানুষের কাঁধে এসে পড়ে। তাই এগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। বাণিজ্যে ডলার পরিশোধে বড় রকমের সংকট এবং টাকার অবমূল্যায়ন মূল্যস্তরে ও উৎপাদনের অনেক উপাদানে প্রভাব ফেলেছে, পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছে, এ থেকে কাটিয়ে ওঠা অতটা সহজ নয়। যা তুলনামূলক বিবেচনায় দেখলে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েনি। কেন এমন হলো, ভেবে দেখেছি কি? আমরা নগদটা বুঝি, সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করি; দেশের অর্থব্যবস্থার 'ডিগ্রী অব অপারেটিং লিভারেজ', 'ডিগ্রী অব ফিন্যান্সিয়াল লিভারেজ' এবং রাষ্ট্রীয় কাজে অর্জিত সেবার তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের সমতা বুঝতে চাই না– এখানেই সমস্যা। আমরা ক্ষত নিবারণ করতে

অবিরাম মলম মলিশ করি, তাতে ক্ষতের সাময়িক উপশম হয়; পারতপক্ষে এ্যান্টিবায়টিক ব্যবহার করে ক্ষত নিরাময় করিনে। রাজস্ব বিভাগের জন্য যত টাকা পরিচালন ব্যয় হিসেবে খরচ করছি, তত সেবা সেখান থেকে পাচ্ছিনে। পেলে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যেত। প্রত্যক্ষ করের খাত পরোক্ষ করের খাতকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে এসে যেত। তাতে উন্নতির নামে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অনেক কমতো। আসল ও সুদসহ ঋণের কিস্তি পরিশোধ অনেক কমে যেত। দেশের অর্থনীতিতে রক্তশূণ্যতা কমতো। আমরা 'অগত্যা মধুসূদন' হিসেবে সহজ বুদ্ধিতে প্রতিবাদহীন পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসিয়ে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছি। আবার ভ্যাট আদায়েও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য পরোক্ষ কর আদায়েও শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। এদেশে বসবাসরত দুচোখওয়ালা প্রতিটা ব্যক্তিই তা জানেন। ফলে সরকারি কোষাগারে টাকা কমে যায়। পদে পদে কর আরোপের নীতির বরখেলাপ ও অমান্য করি। এই দুর্মূল্যের বাজারে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বসায়। ৩৮ ধরনের সেবা না পাওয়ার বিধান তৈরি করে বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে রিটার্ন জমার স্লিপ পেতে দুই হাজার টাকা করের ব্যবস্থা করে সহজ পথে প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়াতে চাই। অল্প আয়ের লোকেরা কর দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। আয় বৈষম্য বাড়ছে। অবৈধভাবে দেদার টাকা কামানো যোগ্য (?) ব্যক্তিরা কর ফাঁকি দিয়ে যোগ্যতা ও ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে। সমাজে তাদের পোয়াবারো। রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে তাদের সখ্য বেশি। বলতে হয়, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না-কো তুমি, সকল দেশের... ।' আবার লক্ষ লক্ষ একমালিকানা কারবারি বাৎসরিক ন্যূনতম পঞ্চাশ লাখ টাকা লাভ করে কর অফিসে তিন হাজার বা সামান্য একটু বেশি টাকা সরকারের নামে জমা দিয়ে পার পেয়ে যায়। এমনটি কেন হয়? কোম্পানিগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। কোম্পানির পরিচালকরা ও একমালিকানা কারবারিরা নতুন মডেলের গাড়ি হাকিয়ে আধুনিক ভোগ-বিলাসে দিন পার করেন, কিন্তু কর অফিসকে কীভাবে ম্যানেজ করেন, খোদা মালুম। যৎসামান্য কর আদায় নিয়েই কর অফিস মিটিংয়ে-মজলিসে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এসব নিয়ে জনমনে শতেক প্রশ্ন। এ প্রশ্ন কিন্তু এদেশের আরও অনেক সরকারি বিভাগ ও সরকারি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। এসব বিবেচনা করলে দেশে আইনের শাসনের নিম্নাবস্থা বোঝা যায়। ইদানীং কর আদায়ের জন্য 'কর এজেন্ট' নামে আরেক মধ্যস্বত্ত্বভোগীর অস্তিত্ব কর-আদায় কাঠামোতে আনছি। এতে কর আদায়ে পজিটিভ কোনো প্রভাব বাজারে পড়বে বলে মনে হয় না। বরং হিতে

বিপরীত হবে। কর আদায় দালালি ব্যবসায়ে পরিণত হবে। করের নামে চাঁদা আদায় বৃদ্ধি পাবে। সমাজে কোনো নিয়ম চালু করার আগে সমাজকে ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে হয়। নইলে তাতে ফলোদয় কিছু হয় না, জটিলতা বাড়ে ও রাজনৈতিক ধান্দাবাজিতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসা ও কোম্পানির আয় নির্ধারণে এবং আয়কর আদায়ের ক্ষেত্রে দেশে সরকার কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত কোনো নতুন টেকনোলজির ব্যবহার করা যেত। আরো অনেক প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে, তবে আয়কর আদায়ে মধ্যস্বত্বভোগী দালালি ব্যবসার প্রবর্তন কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বলা যায় যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং অর্জিত সেবা ও সম্পদের পরিমাণ সমান না হওয়ার সমস্যা এদেশে প্রকট। তাছাড়া ঋণ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। আবার ঋণের টাকাই হোক আর কর আদায়ের টাকাই হোক, পাঁচ টাকা দামের ঘি বারো টাকা ব্যয় করে আমরা অর্জন করি। অতিরিক্ত সাত টাকা শালীন শব্দ– 'সিস্টেম লসে' খেয়ে যায়। অতিরিক্ত এ সাত টাকাও তো বাজেট-আয়ের মাধ্যমেই কোষাগারে আসে। অর্জিত সম্পদের বর্তমান মূল্য এদেশে বাজেটকৃত ব্যয়িত টাকার পরিমাণের সমান হয় না। কেন হয় না, এদেশে এর জবাব সবাই জানে, কিন্তু কেউ দেয় না। ঋণকৃত টাকা ও তার সুদের কিস্তি দিতে মোট বাজেটের হয়তো এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়ে যায়। বিষয়টা হতাশাজনক। আবার টাকার অভাবে তেল-গ্যাস-কয়লা আমদানী করা সম্ভব হয় না। জনদুর্ভোগ বাড়ে। এসবই গরিবের ঘোড়া রোগ। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এসব রোগের কোনো চিকিৎসা এদেশে নেই। বরং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পালন করতে আমরা অনভ্যস্ত।

(প্রকাশ: ১১ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

'পথের দিশা দাও গো মুর্শিদ পথের দিশা দাও'

বাজেট-পরবর্তী আলোচনা এখনও বেশ জোরেশোরে চলছে। জীবন সায়াহ্নে এসে আমার গানের স্মৃতিচারণও বেড়ে যাচ্ছে। গানের পরবর্তী লাইনটা আরো সুন্দর। 'আমি পথ হারাইয়া কান্দি পথে আমায় তুইলা নাও, মুর্শিদ পথের দিশা দাও... ।' এদেশের কর্মকাণ্ড, যোগ্য (?) ব্যক্তিদের মন-মানসিকতা দেখলে জীবনের শেষ-বিকেলে আনমনে এরকম অনেক গানের কথা মনে হয়। বিগত ১৬ জুন ২০২৩ গুলশানের এক হোটেলে এক বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় কথা বলতে হলো। আমি সব সময় বাজেটের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণকে পছন্দ করি। উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, বর্তমান আলোচনার ভিত্তিতে বাজেট সংশোধনের সময় আর নেই, পরবর্তী বছর বিবেচনায় নিতে পারে। আসলে বাজেটের আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নানাজনের আলোচনা থেকে বুঝি, এদেশে বাজেটকে আমরা সরকারি 'জমা-খরচের হিসাব' বলে বিবেচনা করি এবং সেমতো অনেকেই মৌসুমি সমালোচনা করি। বিষয়টা আদৌ তেমন নয়। বাজেট দক্ষ দেশ-পরিচালকদের হাতে দেশের পুরো কর্মযজ্ঞের সুদক্ষ কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাজেটের মাধ্যমে সরকারের কর্মে নিয়োজিত জনসম্পদের সারা বছরের কর্ম ও সেবার সুবিজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ। দুঃখের বিষয়, বাজেটকে পুরো দেশের কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভ্যাস ও সক্ষমতা আমাদের ব্যবহারকারীদের নেই। বাজেটের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ একটা বিলের পানিতে বিলব্যাপী জন্মানো কলমিলতার মতো। কোনো এক কূলের একটা লতা ধরে টানলে পুরো বিলের কলমিলতার পাতা মাথা নাড়ে। বাজেট মূল্যায়নে আমরা সরকারি জনসম্পদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের মাত্রা পরিমাপ করতে পারি; সরকারি, আধাসরকারি ও অনেক বেসরকারি বিভাগ থেকে গৃহীত সেবা ও সেবার মানকে বিশ্লেষণ করতে পারি। সরকার যদি থাকে, দেশ যদি থাকে, বছরব্যাপী বাজেটও থাকতে হবে; থাকতে হবে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ। ভাগ্য ভালো, আমরা সে সংস্কৃতিতে গড়ে উঠিনি। নইলে বাজেট মূল্যায়নের ফলে এদেশের অনেক দুর্নীতি, ভাওতাবাজি, মিথ্যাচার, মুখে মধু পেটে বিষ, জিভ উলটানো বন্ধ হয়ে যেত। কোনো কোনো বাজেট আলোচনায় কথার মধ্যে আমি স্পষ্টভাষী হবার কারণে এসব বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কুদৃষ্টিতে পড়তে হয়। তাদের অলিখিত নির্দেশনা এরকম: কোরাস বেঁধে 'শ্রীচৈতন্যের' নাম ধরে সশব্দে 'চৈতন্যগীত' গাইতে হবে। আমার বক্তব্যও পরিস্কার: শিক্ষকতা পেশায় থেকে ব্যক্তিগত সুবিধালাভের জন্য উগ্র দলবাজি

এড়িয়ে চলাই ভালো; একজন শিক্ষকের অন্তত দুচোখ মেলে দেখার অভ্যাস থাকতে হবে।

বাজেটের মধ্যে 'আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি, ভিতর পানে চাইনি' বললে হবে না। দেশ পরিচালনায় অসুবিধার মূল কোথায়, অতীত-বাজেটের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে। যে কোনো কিছুর উন্নতি করতে গেলে আগে তার ঘাটতিগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। সুতরাং 'চৈতন্যগীত' গেয়ে পক্ষ-বিপক্ষ ভাবার কোনো কারণ নেই। এদেশে এই রেওয়াজ খুবই ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পত্রিকায় লেখার কারণে যেহেতু আমাকে অনেক বাড়তি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, পত্রিকার মাধ্যমেই সেগুলোর উত্তর দিতে চাই; তাই এসব বাড়তি কথার অবতারণা।

এদেশে রাজনীতিও একটা লাভজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি থেকে সমাজের সুশিক্ষিত ও সত্যবাদী লোক ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে, এজন্য এ অবস্থা। এদেশে 'চৈতন্যগীতি'র রেওয়াজ সেই স্বাধীনতার পর থেকেই বেপরোয়াভাবে শুরু হয়েছে। সময় অতিক্রমণে একটু বেড়েছে বলা যায়। দলবাজি করা, দলীয় আদর্শে বিশ্বাস করা, আর কর্তার নামে 'জিগির' তোলা এক কথা নয়। যারা স্বার্থ হাসিল করতে চান, 'জিগির' তারাই তোলেন। রাজনীতিতে, অফিস-আদালতে, সমাজে এই রেওয়াজ দলমত নির্বিশেষে আমাদেরকে বেশি বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের যে কেউ পদে বহাল থাকার জন্য বা পদে যাওয়ার জন্য ক্ষমতাধর বা সম্ভাব্য দলীয় কর্তাকে দৃষ্টিকটুভাবে অপ্রাসঙ্গিক তেলবাজি করেন। এতে ব্যক্তির লাভ, পরিবেশ ও দেশের ক্ষতি। তাদের ঘটে তেলের ভাণ্ডার ছাড়া দেশকে দেবার কোনো মেধা ও যোগ্যতা নেই। নেই কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতির বাচবিচার, নেই দেশ ও সমাজ উপকৃত হয় এমন কোনো কাজ; কেবলই নির্ভেজাল কর্তাভজন। কর্তা দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইলে কর্তাভজা সম্প্রদায় পাক দিয়ে নাচে। এভাবে নিরঙ্কুশ কর্তাভজনে কর্তা দেশের ভালো-মন্দ কাজ বুঝতে পারেন না, কোন পথটা সঠিক, তাও নির্ধারণ করতে পারেন না। পরিণামে কর্তার হুঁশ ফিরলেও করার আর কিছুই তখন থাকে না। কর্তাভজা সম্প্রদায় ও কর্তাভজন এদেশের একটা বড় ব্যামো।

আমি মাস্টারমানুষ হওয়াতে শিক্ষা-কুলের কথা বেশি বলি। বড় বড় উচ্চমার্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কুলীন-পুরোহিতরা তো এভাবে কর্তাতোষণ করেই কাজে যোগ দিয়েছেন। কর্তাভজন করেই টিকে আছেন। এদেশে শিক্ষামান ও শিক্ষাব্যবস্থার কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন? আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? জবাবদিহিতার রেওয়াজ এদেশে আছে কি-না?। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের কাছে কর্তাভজা

সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। যদিও এদেশে দুচোখওয়ালা স্পষ্টভাষী মাস্টারসাহেবদের প্রয়োজনও কম নয়। এরা যা বলেন, দেশের জন্য ভালো ভেবেই বলেন।

ঢাকার রাজপথের ঘটনা। পথের ধারে রিক্সা ভ্যানের উপরে কলা রেখে একজন বিক্রি করছেন। আমি যানবাহন থেকে নেমে কলা বিক্রেতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কলার দাম জিজ্ঞেস করলাম। দাম কমাতে বলায় কথাপ্রসঙ্গে তার কাছে শুনলাম, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তিন ঘণ্টা ধরে কলা বিক্রি করতে স্থানীয় 'রাজনৈতিক মস্তান'কে প্রতিদিন দুইশ টাকা চাঁদা দেওয়া লাগছে। এভাবেও দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে। সে এভাবে মাসের পর মাস চাঁদা দিয়ে কখনো কলা, কখনো আম, কখনো পেয়ারা ইত্যাদি বিক্রি করে সংসারের ঘানি টানে। সে যে খারাপ শব্দগুলো আমাকে আপন ভেবে বললো, অশালীন হবে বিধায় উল্লেখ করতে চাইনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুরোহিতরা শিক্ষার উন্নতির কাজে ব্যস্ত নেই বুঝলাম। কীসের উন্নতি করছেন? একদণ্ড চোখ বুজে ভেবে দেখি তো, আইনের শাসন এদেশে আছে কি-না? এক বছর পরেই আইনের শাসন এদেশে ফিরে আসবে কি-না? আমি দীর্ঘ বছর ধরে এমনই শতেক অনিয়ম, আইনহীনতা দেখে আসছি; কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভজন গাওয়া শুনে আসছি। এই একটা কারণেই এদেশের ক্ষুদ্র শিল্প দীর্ঘদিনেও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। অনেক বড় বড় সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিলীন হয়ে গেছে। বাজেট আলোচনায় কি এগুলো আসতে পারে না? যাহোক, যে কথাগুলো ঐদিন বাজেট আলোচনায় বলিনি, তা এখানে সাদামাঠাভাবে বলতে চাই।

আলোচনায় মূল কথা একটাই: কয়েক বছরে বাজেট বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের কোনো কমতি নেই, ঘাটতিও নেই। ঘাটতি– বাজেট বাস্তবায়নে, মানবসম্পদে, বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে যা অর্জন করি সেই কর্মে; ঘাটতি সেবা অর্জনে। পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সেবা অর্জন হচ্ছে না। এদেশে এটা একটু ভিন্নধর্মী আলোচনা। বাজেট তো বার্ষিক উন্নয়নের রূপরেখা, তাহলে বাজেট পথের দিশা দিচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই বাজেটে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অভাব। নিশ্চয় বাজেট যা বলে তা আমরা বুঝিনে, কিংবা বুঝেও নির্দেশনা মতো কাজ করিনে। বাজেটের কমবেশি ৬২ শতাংশ পরিচালন ব্যয়। ব্যয়ের বিনিময়ে কমপক্ষে যদি এর সমপরিমাণ সেবাও এদেশ অর্জন করতো, দেশের প্রভূত উন্নতি হতো। এ হিসাব আমরা সাধারণত করিনে। আমরা সবাই জানি, এক সম্পদ সময়ের অতিক্রমণে আরো সম্পদ

বাড়ায়। আমরা শুধু দৃশ্যমান সম্পদই চোখে দেখি, ব্যায়ের বিনিময়ে অর্জিত কর্ম ও সেবাও দেশের জন্য সম্পদ– এটা ভাবিনে। শিক্ষা বিভাগ নিয়ে একটা উদাহরণ দেবো। আগামী অর্থবছরে শিক্ষার জন্য ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেকে এ বরাদ্দকে গত বছরের তুলনায় কিংবা জিডিপি-র তুলনায় অপ্রতুল বলবেন। তাহলে বেশি বরাদ্দ দিলে কি শিক্ষার মান ও উন্নয়ন বেশি হতো? বাস্তবতা কী বলে? এদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে কমপক্ষে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আছে অগণিত টেকনিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সাধারণ স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা। শহরে, গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো অভাব নেই। তারা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারছে কি-না? যদি না পারে, ধরে নিতে হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তি বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা দেশকে দিতে পারছে না। জনসম্পদ হিসেবে শিক্ষার্থীর মান যার-পর-নাই নিম্ন। প্রায় ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা। বিদেশে শিক্ষিত, দক্ষ ও টেকনিক্যালি সক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রচুর চাহিদা। এই অধিকাংশ নিম্নমানের অদক্ষ জনগোষ্ঠী বিদেশে রপ্তানি করে কেউবা হচ্ছে উটের রাখাল, কেউবা ড্রেন-ক্লিনার; কারো ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে সলিল সমাধি হচ্ছে। খুব কম সংখ্যক লোক বিদেশে গিয়ে আশানুরূপ বেতনে চাকরি করছে। আমাদের দেশ জনসংখ্যাধিক। যদি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষকরা বাজেট বরাদ্দ মোতাবেক দক্ষ-সুশিক্ষিত, টেকনিক্যালি সক্ষম ও সৎ জনসম্পদ জাতিকে দিতে পারতো, তাদেরকে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতাম, দেশেও জনসম্পদ বাড়তো। বৈদেশিক ঋণের চাপ কম পড়তো। অসম্ভব কিছু না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তা-ই করছে। আমরা বেতনটা দাবি-দাওয়া করে বাজেটের মাধ্যমে বাড়িয়ে নিতে চাই (যা যৌক্তিকও বটে), কিন্তু অর্পিত মানসম্মত দায়িত্ব পালনে কার্পণ্য করে জনসেবার তুলনায় 'রাজনৈতিক কর্তাভজন'কে অধিক 'সওয়াবের কাজ' ও দায়িত্ব বলে মনে করি। বাজেট-ঘাটতি বাড়ে; দেশ পিছিয়ে যায়। এটা আমাদের সংস্কৃতি।

এদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা মানে– বিরুদ্ধমত দমন, গ্রেফতার-বাণিজ্য; চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজ দমন নয়; আইন বিভাগ সে-রকম দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে চাঁদাবাজও চাঁদা আদায়-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের কোথায় চাঁদাবাজ নেই! আইন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দেশকে সেবা দিলে কলা-বিক্রেতা গংয়ের প্রতিদিন 'মস্তানি চাঁদা' গুণতে হতো না, সেবায়ও সিস্টেম-লস হতো না। এদেশে অনেক ছোট-বড় শিল্প

গড়ে উঠতো, যারা চাঁদার ভারে পর্যুদস্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনশক্তি বাজেট বরাদ্দের বিনিময়ে মানসম্মত সেবা দিলে আইনত কর প্রদানযোগ্য ব্যক্তি যথাযথ পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য হতো। সরকারি কোষাগারে অনেক টাকা জমা হতো। বর্তমানে রাজস্ব কর্মকর্তারা করাদায়ে সিস্টেম-লস কমানোর জন্য সহজ বুদ্ধিতে, সহজ পথে আদায়যোগ্য করারোপ করে বোর্ডের মান-সম্মান রক্ষা করছেন, পাশাপাশি ব্যাপক সিস্টেম-লস অব্যাহত আছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সেবার দিকে তাকালে দেখা যায়, অবৈধভাবে ব্যাপক রাজস্ব ফাঁকি চলছে। অনভিপ্রেত-অত্যধিক উৎপাদন ব্যয় ও অগ্রহণযোগ্য সিস্টেম-লস ঢাকতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের সকল বিভাগের 'সর্ব গায়ে ব্যথা'। স্বল্প পরিসরে সে 'গুণকীর্তন' গাওয়া এখানে সম্ভব নয়। জানি, সচেতন মহল সম্যক অবহিত। মূল প্রশ্ন হচ্ছে: সরকারের বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের কমপক্ষে সমপরিমাণ সেবা ও সম্পদ কি দেশ অর্জন করতে পারছে? প্রতিবছর নীট সম্পদ উদ্বৃত্ত কত? দেশের নীট সম্পদ ঘাটতি ক্রমশই বাড়ছে। অথচ আমরা মঞ্চ কাঁপিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছি। আসল জায়গায় হাত দিচ্ছিনে। দেশের যে সার্বিক পরিস্থিতি, মুর্শিদ ছাড়া পথের দিশার জন্য আর কে আছে!

এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই বললেই চলে। যত দুর্যোগ সবই মনুষ্যসৃষ্ট। মনুষ্যসৃষ্ট বোঝা বায়ান্নটা বছর ধরে দেশকে বহন করতে হচ্ছে। 'চাটার দল সব চেটে শেষ করে ফেললো' কথা শুনতে হয়েছে। কেউ রাজনৈতিক দলকে চাটছে, কেউ কেউ চাটছে বাজেট বরাদ্দকে, কেউবা অর্থনীতিকে। দেশটাই হয়ে গেছে 'চাটাচাটির দেশ'। এখান থেকে মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। প্রয়োজন সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মতো ওষুধ খাওয়া। দেশ তো শুধু রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নয়, প্রতিটা নাগরিকের। রোগী ওষুধ না খেতে চাইলে দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষীরা ওষুধ খেতে বাধ্য করতে পারেন। আমাদের অনেক দেশ-চালকদের বায়ান্নটা বছরেও অর্ন্তদ্বন্দ্ব, দলীয়-স্বার্থান্ধতা, জিভ ঘোরানো-ফেরানো ও দলবাজিই গেল না, তো আমরা দেশ গড়বো কখন! কয়েকজন ধর্মভক্ত দোহারকে এভাবে জারি গানের ধুয়ো ধরতে শুনেছিলাম, 'কালী এবারও ত্বরাইতে হবে ওহে ত্রিনয়না-আ-আ, কালী এবারও'।

(প্রকাশ: ২৫ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আস্থাহীনতাই আমাদের কাল হয়েছে

যুগান্তর পড়তে গিয়ে দেখলাম সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে ‘রাজনীতিতে আল্টিমেটাম’ (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। রাজনীতি নিয়ে লিখতে আমার মনে সায় দেয় না। কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলেও তো থেমে থাকা যায় না, ধানের হাটে ওল নামালেও বিক্রি হতে চায় না। তাই এ মনোভাবের প্রকাশ। তাছাড়া ঘুরানো পেচানো কথাও আমার পছন্দনীয় নয়। যা বলি সোজাসাপটা বলি। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় ‘সংকট নিরসনে পর্দার ভেতরে ও বাইরে দেশী-বিদেশী নানা মহলের তাগিদ ও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বড় দলগুলো রাজনৈতিক অসহনশীলতা, অনমনীয় মনোভাব এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে সৃষ্ট সংকটের প্রেক্ষাপটে বিদেশী কুটনীতিকরা আগে পর্দার আড়ালে তৎপরতা চালালেও এখন প্রকাশ্যে শুরু করেছেন দৌড়ঝাঁপ। ভিসা নিষেধাজ্ঞাসহ নানা পদক্ষেপও নিতে দেখা যাচ্ছে।...আলোচনার মাধ্যমে যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ বের করা না যায়, তাহলে এর মাশুল দিতে হবে পুরো জাতিকে।... পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, নিত্যপণের অযৌক্তিক ঊর্ধ্বগতি জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে সংকটে ফেললেও রাজনীতির মাঠ এখন ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা টিকে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এদেশের রাজনীতি কি শুধুই ক্ষমতা লাভের, জনস্বার্থের নয়? আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কোন দল ক্ষমতায় যাবে, তা ভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে জনগণ। তাহলে জনগণ উপেক্ষিত থাকবে কেন?’

ছোট্ট একটা ডোবায় ভেসে ওঠা ব্যাঙের প্রতি অপরিণামদর্শী বালকদের খেলাচ্ছলে নির্দয়ভাবে ঢিল ছুঁড়ে প্রাণনাশের প্রচেষ্টার গল্প আমরা সবাই ছোটবেলায় পড়েছি। বালকদের খেলা, কিন্তু ব্যাঙগুলোকে তো শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে ভেসে উঠতেই হয়। তাদের পরিণামের কথা বালকগুলো কি একবারও ভাবে? বালকগুলো তো খেলায় মত্ত। হয়তো বলে চলেছে, ‘খেলা হবে’, ‘খেলা হবে’। এটাকে তারা নিছক একটা খেলা ভেবেছে। সব খেলা বিনোদন নয়। কোনো কোনো খেলা খেলে বালকরা আনন্দ পেলেও কোনো না কোনো পক্ষের জীবন-সংহারকও বটে। জীবনের সবকিছুকে খেলাচ্ছলে নিলে চলে না। সবাই কথাগুলোকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেও না, যদিও আমরা খেলায় ‘মজনুন’ হয়ে যায়। গল্পে পড়েছি, লাইলি-মজনু প্রেমে মজেছিলেন। আমরা বলি লাইলির প্রেমে ‘মজনু পাগল’। সব পাগলামী সুখকর নয়। কথাটা শুনতে আমার বেখাপ্পা লাগে। আরবি ‘মজনুন’ শব্দটাকে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলায় ‘মজনু’ বলি, যার অর্থ পাগল, উন্মাদ ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে

'মজনু পাগল' বলা মানে 'পাগল পাগল'; তা কি হয়? বাচ্চারা মজনুন হয়ে ব্যাঙের দিকে নির্বিচারে ঢিল ছুঁড়তে পারে, যদিও এতে ব্যাঙের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। দেশটা নিয়ে আমাদের কি খেলা (তামাশা) করা সাজে? খেলা এক ধরনের বিনোদন– এটা মানতেই হয়। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা প্রত্যেকেই এদেশের সম্মানীত নাগরিক, তাদেরকে কষ্ট দিয়ে, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এ আবার কেমন খেলা? কেমন জেদাজিদি? সেজন্যই হয়তো সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে সংকটে ফেললেও রাজনীতির মাঠ এখন ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা টিকে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ'।

আমার প্রশ্ন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা কোথায় যাব? আমাদের উপায় কী? দেশ চালানো নিয়ে খেল-তামাশা আদৌ সাজে না। আমরা বিশ্বাস করি দেশের মালিক জনগণ। আমরা তো দু-পক্ষের তামাশা দেখার জন্য বসে নেই। এদেশে বিভিন্ন পেশায় লক্ষ লক্ষ লোক আছেন, যারা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেরকে কোনো রাজনৈতিক নোংরামীতে জড়ান না, অথচ বাস্তবতা ও দেশের ভালো-মন্দ বোঝেন। এমন কি দেশটাকেও পরিচালনা করতে পারেন। প্রমাণ তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পর পর তিনবার হয়েই গেছে। যারা তিন মাস দেশের ভালো করতে পারেন, তারা পাঁচ বছর সময় পেলে দেশের আরো ভালো করতে পারেন। এতে প্রমাণ হয়, রাজনীতিকরা ছাড়াও দেশ চলতে পারে। রাজনীতিকরা দেশের জন্য অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়। তবে আমরা চাই দেশে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা বজায় থাক। রাজনীতিকরা দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে কাজ করুক, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে নয়। আমরা তো পারতপক্ষে কোনো রাজনীতিতে জড়াতে চাইনে। কোনো পক্ষের স্লোগান হাঁকতেও বেরোইনে। তবে এদেশের রাজনীতিকদের দায়িত্ববোধ দেখে প্রায়ই হতাশ হতে হয়। প্রতিদিনের পত্রিকা আমাদের প্রতিদিন হতাশার খবর দেয়। ভাবলেই খারাপ লাগে 'দুপক্ষের খেলায়' আমাদের দেশের এ দুগর্তি কেন? আমেরিকাসহ পশ্চিমা শক্তি যদি কোনো খারাপ কথাই বলে থাকে তাহলে আমরা চীন ও আমেরিকার স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজেদের জড়াচ্ছি কেন? ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে আমেরিকাকে একটা বুঝ দিতে পেরেছিলাম, এবার তা পারছি না কেন? ভারত এবং চীনের দ্বন্দ্বেই-বা আমরা পক্ষ হচ্ছি কেন? বিগত দুটো নির্বাচন বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও ভারত নিজস্বার্থে আমাদের সাপোর্ট দিয়েছে। ভারত নিজদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও আমাদের অগণতান্ত্রিক ভোটাভুটিতে কোন নৈতিকতায় সাপোর্ট করে? এটা কি তাদের উচিত হয়েছিল? কথায় আছে, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের

বেলায় চুপটি আসি'। এ আবার কেমন নীতি? ক্ষমতাসীন দলকে তো ভারত নিজেই সংশোধন করে নিতে পারতো। ভারত নিজস্বার্থে তা করে না; এটা এদেশের সাধারণ মানুষ অবশ্যই বোঝে।

আমি তো দেখি এদেশের রাজনীতির সকল সংকটের মূল পারস্পরিক আস্থাহীনতা এবং এ আস্থাহীনতার জন্য আমাদের অতীত কর্মই দায়ি। মানুষ নিজের চোখ ও কানকে কোনোক্রমেই অবিশ্বাস করতে পারে না। তাই দলীয় ব্যবস্থাপনায় ভোটে মানুষ আস্থা না রাখতে পারলে, সেটা কি সাধারণ মানুষের দোষ? ক্ষমতাসীন দলও তো সাধারণ মানুষের উপর আস্থা রাখতে পারে না, তাই বিদেশী সাপোর্ট খুঁজে বেড়ায়। আমরা এ অবস্থায় তো একদিনে উপনীত হইনি। তাহলে আস্থা আসবে কী করে? এমন কি আমরা নির্বাচনে হেরে-যাওয়া দল বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো নিয়েও বাজে মন্তব্য করতে তখন একটুও দ্বিধাবোধ করিনি, এটা আমরা দেখেছি। এটা আমাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এই অনাস্থা ও সব রাজনৈতিক সংকটের মূল আমাদের 'বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটা আমার' এই মনোভাব। তালগাছটা আমার না হলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। স্বার্থের ব্যাপারে 'মজনুন' হয়ে যায়। শুধু আবোল-তাবোল বকতে থাকি। আমাদের বুঝ, 'আমি যা বুঝি এবং কথার চাতুরতা দিয়ে যে যুক্তি খাঁড়া করি, তা অন্য কেউই ধরতে পারে না; আমি ভাত খাই আর অন্য সবাই বোকা, চিঁড়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে'। 'দেশটা আমাদের, আর অন্য সাধারণ সব মানুষ এদেশের কেউ না, বানে ভেসে এসেছে'– এই বদ্ধমূল ধারণা। অর্থাৎ রাজনীতিকদের দায়িত্বহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জবাবদিহিতার অভাব আমাদের পেয়ে বসেছে। আমাদের দেশের মান-সম্মানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। আমরা সাধারণ মানুষ এতে লজ্জা পাচ্ছি। আমি জানি আমার মতো মাস্টারসাহেবের এরকম চাঁছাছোলা কথায় অনেকে আমার প্রতি নাখোশ ও বিরক্ত হন। কিন্তু আমি আরোও জানি, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজেদের সংশোধনের এখনই উপযুক্ত সময়। জোর করে নির্বাচন করা সম্ভব, কিন্তু ফল ভালো হবে না, যা হবে তা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। জিদের ফল কখনো ভালো হতে পারে না।

রাজনীতিতে মুখের লাগামহীন কথা ও লাঠিয়াল বাহিনী বিনিয়োগ করতে পারলে অনেক লাভ। বিনা পুঁজির ব্যবসা। কারো কাছে জবাবদিহি করা লাগে না। এর চেয়ে বড় ব্যবসা এদেশে আর একটিও নেই। এজন্য এ দশা। এই সুবিধা পাওয়ায় আমাদের অনেকেই, যাদের বিবেকের দংশন নেই, রাজনীতিতে নাম লেখাচ্ছি। ইচ্ছে হয়-না তবুও নেতা-নেত্রীর সামনে হাসি ধরে রাখি। নিন্দনীয় কাজকেও

সাপোর্ট করি। বলতে পারেন কয়টা রাজনৈতিক দলের অপকর্মের সাথে তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রের মিল আছে? রাজনৈতিক দলের এইসব আস্থাহীনতা ও অপকর্মের কারণে ভুগছে কারা? নিশ্চয়ই দেশ ও সাধারণ মানুষ। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে– এরা মন থেকে স্বীকার করে না যে, দেশটা জনগণের– তারা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সেবা করার কাজে নিয়োজিত; তারা ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে নিয়মিত শপথ ভঙ্গ করে চলেছে। সেজন্য এদেশের এ দশা। এই যে, আমার মধ্যে এদেশের রাজনীতি নিয়ে একটা ঘৃণা কাজ করে, এটা আমার প্রতিটা লেখার মধ্যে বিরাজমান। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। রাজনীতিতে নৈতিকতা ও দেশপ্রেম বলতে কিছু থাকবে না, রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হবে, এদেশের একজন শাশ্বত শিক্ষক হয়ে এটা কি মেনে নেওয়া যায়? এভাবেই আমরা দলীয় স্বার্থে বিভিন্ন দেশের সাথে তলে তলে জোট বেঁধে আমাদের উন্নতিকে খর্ব করছি, দেশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছি, ভবিষ্যতকে নষ্ট করছি; সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছি। অথচ দোষ চাপাচ্ছি অন্যের ঘাড়ে।

ক্ষমতাসীন দলের প্রতিপক্ষ ধোয়া তুলসীপাতা নয়, এটা আমরাও বুঝি; কিন্তু তাদের নির্দলীয় সরকারের দাবি তো অযৌক্তিক নয়। ‘খেলা হবে’ দু পক্ষের, আর রেফারি হবে আপনার পক্ষের, এটা কে মেনে নেবে বলুন? এর আগের খেলাগুলোয় রেফারি তো আস্থা ভঙ্গ করেছে। তাহলে দলমত নির্বিশেষে ‘নির্দলীয় রেফারি’ নিয়োগের দাবি কি বাঞ্চনীয় নয়? ক্ষমতাসীন দল কি এর আগে নির্দলীয় নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করেনি? নির্দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি? অথচ আমরা পশ্চিমা দেশের পদ্ধতিকে কখনো আমাদের সাথে তুলনা করছি, কখনো আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলছি। এ করে আমরা যুক্তির অসারতা প্রমাণ করছি। ভারত সরকারের প্রতি নির্ভর করে অনেক আকাশ-কুসুম কল্পনা করছি। আমাদের উচিত ভারত সরকারের প্রতি আস্থা না এনে জনগণের প্রতি আস্থা আনা। যে কোনো পরিবেশে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কোনো আইন বা বিচারের সম্মুখীন হলে তা আইনগতভাবে মোকাবেলা করা।

আবার ভিসা নিষেধাজ্ঞার কথায় বিরোধী পক্ষ পুলকিত ও খুশি হোক এটাকে আমি ভালো-চোখে দেখতে পারিনে, কারণ আমি এদেশের একজন নাগরিক। এদেশ আমার। এদেশ আমার গর্ব। এদেশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা মানে আমার মানহানি হওয়া। আমাদের অব্যবস্থা, অপচিন্তা, মানসিক বিকৃতি আমাদেরই সংশোধন ও সমাধান করতে হবে। প্রতিবেশী হোক বা দূরের দেশ হোক, কথায় কথায়

বিদেশীদের ডেকে শালিসের আয়োজন করা কোনো পক্ষেরই মর্যাদা বাড়ায় না। যদিও অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া বিবদমান দু-পক্ষই বজায় রেখেছে।

এদেশের উন্নয়নের মেকানিজমের অনেক সমালোচনা হলেও, খরচ নয়ছয় হলেও বর্তমান সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেক করেছে, এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। নিজের কর্মের প্রতি বিশ্বাস না রেখে আমরা প্রতিবেশী দেশের প্রতি আস্থা এনে সমগ্র বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে যায় কী করে? এটা প্রমাণ করে নিজেদের করা উন্নয়নের ওপর নিজেরা আস্থা হারাচ্ছি। প্রতিবেশী দেশকে আমাদের জন্য ওকালতি করতে বলি কোন সম্মানে? স্বাধীনতার পর পর আমরা রাশিয়াকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। একথা অস্বীকার করার জো নেই। তার পরিণতিও ভালো হয়নি। ভারত নিজেও সে-পথ থেকে ফিরে এসে দুই পরাশক্তিকে ব্যালান্স করে চলছে। এখান থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে। চলার পথে একটু ভুল করলে, অনেক বড় ক্ষতির কারণ হবে। কোনো রাজনৈতিক দলেরই ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে দেশের এবং সাধারণ মানুষের। চোখের সামনের ক্ষুদ্র বুড়ো আঙুল সুদূরের বৃহৎ হিমালয়কেও ঢেকে দিতে পারে। আর দেশের কথা না ভেবে যদি শুধু নিজের দলের কথা ভাবি, সে-কথা আলাদা। সে হবে ‘তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই’ কিসিমের জেদাজিদি। দলাদলি বাদ রেখে দেশের উন্নতির কথা ভেবে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, সে আশা নিয়ে বলি, ‘আমি বসে আছি আশা-সিন্ধু তীরে সদায়’।

(প্রকাশ: ৪ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার’

জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম, ‘মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার, সবাই বলে মিথ্যে-বাজে বকিসনে আর খবরদার!’ উঠতি যুবক বয়সেও কিছু উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা করতাম, কবি সুকুমার রায় যাকে ‘বিষম চিন্তা’ বলেছেন। আমার এক বন্ধু এক পিরের মুরিদ। আমারও ইচ্ছে পিরের মুরিদ হয়ে ভবিষ্যতে কামেল পির হওয়া। সে সন্ধ্যা ও রাতে নামাজের পর জিকির (স্মরণ) করে। গলার ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বের হয়ে আসে। অনবরত মাথা উপর-নীচে ঝাঁকাতে থাকে। আমি ভয় পেয়ে যাই। কি জানি মাথার ঘিলু ওলট-পালট হয়ে যায় কি না! একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললো, জিকির করার আগে নিয়ত করতে হয়। ‘আমি আমার পির কেবলার কলবের (মন, হৃদয়) দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছি, আমার পির তার পির হযরত ...এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে, তার পির বড় পির আব্দুল... কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে। বড় পির আব্দুল ... হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কলবের রুহানির (আত্মিক) দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে। এখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কলবের রওশনি (দীপ্তি, আলো) আমার কলবে আসুক।’ নিয়তটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমি ভাবলাম, এত কলব পেরিয়ে রওশনি আমার কলবে না এনে আমি নিজেই যদি আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-নীতি, বিধি নিষেধ মেনে চলি, সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করি, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)কে মান্য করি, তাহলে এত পিরের মাধ্যমে কামেল পির হওয়ার প্রয়োজন কী! সরাসরি খাজা-বাবা বা খাজা-দাদা বা খাজা-দাদার-বাবা হওয়া যায়। এর চেয়ে ভালো আর নেই। এর পর থেকে পির ধরার সখ আমার মিটে গেছে।

গত ৪.১০.’২৩ বিবিসি নিউজ বাংলায় পড়লাম “কেউ নিষেধাজ্ঞা দেবে না, তলে তলে আপস হয়ে গেছে– সেতুমন্ত্রী; কোথায় নিষেধাজ্ঞা? কোথায় ভিসানীতি? তলে তলে আপস হয়ে গেছে। দিল্লি আছে। আমেরিকার দিল্লিকে দরকার। আমরা আছি, দিল্লিও আছে। দিল্লি আছে, আমরাও আছি। শত্রুতা কারো সঙ্গে নেই। ... ভারসাম্য সবার সঙ্গে করে ফেলেছেন, আর কোনো চিন্তা নেই।” এ ছাড়াও আরো পড়লাম, “তিনি বলেন, ‘দুই সেলফিতেই বাজিমাত। এক সেলফি দিল্লি, আরেক সেলফি নিউইয়র্কে। শেখ হাসিনা আর পুতুল, জো বাইডেনের সেলফিতে দিল্লিতে বাজিমাত। তারপর নিউইয়র্কে বাজিমাত। কোথায় স্যাংশন, কোথায় ভিসানীতি?’... ‘নিষেধাজ্ঞার হুমকি-ধমকি শেষ’।” (বণিক বার্তা, ৪.১০.’২৩)। দেশের ভোট, দেশের গণতন্ত্র, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার; আর তলে তলে

আপস হবে পিরদের সাথে– এটা কীভাবে সম্ভব? তাহলে এদেশের সাধারণ নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়ার মূল্য কোথায়? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি পির ধরার অভ্যাস এদেশের অনেকের আছে, রাজনৈতিক দলেরও আছে। বড় পির (প্রধান পির)-এর কাছে পৌঁছতে মাঝখানে অনেক পিরের মাধ্যম লাগে, কলবে নুরের পরশ আসা লাগে, অসিলা লাগে। বর্তমান যুগেও সেলফি একটা বড় অসিলা। সবার ভাগ্য ও সুযোগ তো সব সময় সুপ্রসন্ন হয় না। লালন বলেছিলেন, কপালের নাম গোপাল চন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে-গোবরে, সকলি কপালে করে'। বলতেই হয়, এদেশের মুরিদ (ভক্ত, চেলা, শিষ্য)-দের কপাল ভালো। কিন্তু সাধারণ মানুষের কপাল এমন 'গোপাল চন্দ্র' হলো কেন? আমি তো কোনো দলের সাতে-পাঁচে থাকিনে। যেটা মনে মেনে নেয় না, প্রকাশ করে ফেলি।

সাদাসিধে কথায় রাজনীতির উদ্দেশ্য জনসেবা করা, দেশসেবা করা, দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মজবুত করা, মানুষের কল্যাণ করা, সমাজে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা, সুশিক্ষিত জাতি গঠন করা ইত্যাদি। এহেন হরিলুটের মেলা (পত্রিকায় প্রকাশিত) কি জাতি গঠনের অঙ্গীকার? সর্বৈব মিথ্যাচার, দুরাচারবৃত্তি কি সুনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত? জনগণ আমার, তো দেশই আমার। জনগণই রাজনৈতিক দলের প্রধান শক্তি। জনকল্যাণই রাজনৈতিক দলের প্রধান কর্তব্য। আমরা কি এসব কাজে আছি? আমরা পির তোষণে মত্ত। যে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল দেশের মানুষকে সামাজিকভাবে কুপথে চালিত হতে শেখায়, দুর্নীতির ছবক দেয়, জনগোষ্ঠীকে জনআপদ বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়, পারস্পরিক প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলে– তাকে কি রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল বলা যায়? আমরা সবাই একটা বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, এদেশে রাজনীতির নীতিতে খুবই দুর্ভিক্ষ চলছে। রাজনীতির উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। রাজনীতির চিন্তাধারা থেকে জনগণ হারিয়ে গেছে। পিরের আস্থাভাজন হতে পারলেই যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকা যায়। আমরা আবার কেমন দেশের জনগণ হলাম! 'যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগ আলীর ঘোড়া।' পির সন্তুটির ঘোড়া। পির খুশি তো রাজত্ব খুশি। সে-কথা আবার হাসি মুখে ফলাও করে প্রকাশ করি। ভাবতেও অবাক লাগে, রাজনীতিতে লোকলজ্জা ও আত্মজিজ্ঞাসাও হারিয়ে গেছে। দেশ, জনগণ ও গণসমর্থনের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য পির খুশি তো আমি খুশি, আমার ক্ষমতা বলবৎ, পির আমাকে রক্ষা করবে। সাধনা, 'পিরের কলবের (মনের) রওশনি (দীপ্তি, আলো) আমার কলবে আসুক'। তাহলেই আমি সুরক্ষিত। আমার এ কথায় কারো সম্বিত ফিরে আসবে কি না? পত্রিকার পাতা

জুড়ে অনেক প্রাবন্ধিক বার বার একই কথা লিখে তো কোনো লাভ নেই– যদি এমনটিই হয়, ‘কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো’– তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের মতামত দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার কোথায়? আমরা সংবিধানের দোহায় দিচ্ছি। সংবিধান কে পরিবর্তন করেছে? আজ এ কথা বলতে পারার অজুহাত দেখাতে ইচ্ছে করেই আগে পরিবর্তন করেছি। কারো এত সহজ কথাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়?

আমার এক বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার ভাই শেষ বয়সে ‘দৈনন্দিন ন্যূনতম ইবাদত’ নামে একটা বই লিখেছেন। আমাকে পড়তে দিয়েছেন। এক জায়গায় দেখলাম ‘ জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু’য়া’। বাংলা অর্থ এরকম: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই’। এটা নিছক ইচ্ছা ব্যক্ত করা। এটা নামাজের পর বার বার তসবিহ পড়তে হবে। পড়ে খুব ভালো লাগলো। ইচ্ছা ব্যক্ত করে, দু’য়া পড়েই যদি জান্নাত পাওয়া যায় এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা যায়, তবে দুনিয়ার এত ভালো কাজ-কাম করার নির্দেশ, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, ‘সৃষ্টিবিধান’ মেনে চলার কী দরকার? কেয়ামতের দিন ‘কর্ম-বিবরণী’ (আমলনামা; আমল অর্থ কাজ, নামা অর্থ বিবরণী; অর্থাৎ ভালো ও খারাপ কাজের বিবরণী)-এরই বা কী দরকার? দেহে রক্তশূন্যতার জন্য খাবার ও ওষুধ না খেয়ে ঘরে বসে শুধু ‘ক্যাপসুল’, ‘ক্যাপসুল’, ‘ক্যাপসুল’ হাজার হাজার বার তসবিহ জপলেই তো দেহে রক্ত ভরে যাবার কথা। দুনিয়াদারির এত আয়োজনের কী প্রয়োজন ছিল? আমার প্রশ্ন, আমরা কাজের বিনিময়ে, না তসবিহ জপের বিনিময়ে জান্নাত পেতে চাই? আমরা কি পিরের নিরঙ্কুশ সমর্থন আদায় করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে চাই? মূলত আমরা সব সময় সহজ পথে বেশি লাভ পেতে চাই। জনসাধারণ এতে উপেক্ষিত। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি। যদি আমরা কোনো পক্ষকে দমন করেই ক্ষমতায় থাকতে পারি বা যেতে পারি, তবে জনগণের স্বীকৃতি আর পেতে চাইনে। জনগণ তো তাহলে এখানে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। জন-স্বীকৃতি পেতে তো কাজ করতে হয়, কোষাগার লুটপাট বন্ধ করতে হয়, চাটুবাদ-চাটুবৃত্তি বন্ধ করতে হয়, দেশকে ভালোবাসতে হয়, নিজস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, দেশে সুনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। নির্বাচিত হওয়ার জন্য কাজ ও সুস্থ চিন্তাধারা দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আসতে হয়। সাধারণ মানুষ তো দুর্নীতিবাজ, প্রতারক, মিথ্যাবাদি, তহবিল তছরুপকারি, ফেরেববাজ, যারা নিজস্ব পিরের কাছে দেশকে বন্ধক রেখে ক্ষমতার স্বীকৃতি আদায় করে; জনমানুষকে, গণরায়কে উপেক্ষা করে, হেয় প্রতিপন্ন করে– তাদেরকে ভালো চোখে দেখতে

পারে না। পারাটা উচিতও নয়। নইলে যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা বা আসার জন্য গণরায়কে অবমাননা করে পির ভজন করতে গিয়ে 'কর্তাভজা সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়ে গেছে, যা এ জাতির জন্য লজ্জাকর; গ্লানিকরও বটে। সাধারণ মানুষের স্বীকৃতি যেখানে মুখ্য, এসব বাচবিচার যে দেশে আছে– এর নামই গণতন্ত্র। এসবের চর্চা যে দেশে আছে, তারাই তো উপরে উঠে যাচ্ছে। এদেশের রাজনীতিকদের আমলনামা তারা পিরভজন করতে গিয়ে কেজি দরে বেচে খেয়েছেন। প্রতি বছর কোনো এক অমাবস্যার রাতে তারা মুখের লাইসেন্স রিনিউড করিয়ে নেন। কোনো বাড়তি ও হালকা কথাবার্তায় এদের জুড়ি মেলা ভার, এদের কথাভিত্তিক ট্যাক্স দিতে হয় না। তাই এ পির-ভজন তরিকা। এদেশে গণতন্ত্র ও দেশসেবা আনতে গেলে আগে এদের কথা ও কাজ জবাবদিহিতার মধ্যে আনা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। রাজনীতিকদের জন্য 'কোড অব এথিক্স' চালু করতে হবে। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বিশ্বের দামি দামি খেলোয়াড়দের জন্য হলুদ কার্ড, লাল কার্ড দেখানোর বিধান আছে। এরা কোনো বিধানমুক্ত থাকবে কেন? জনস্বার্থেই এসব দরকার। এদেশে মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনুমানিক সর্ব্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো শতাংশ লোক সক্রিয় রাজনীতি করে। এদের রাজনীতিজীবী বলা যায়। এদের অপকর্মের দায় বাকি পঁচাশি শতাংশ জনগোষ্ঠী বহন করবে কেন?

উন্নয়ন নিয়ে কিছুটা বয়ান করি। আমি অনেকবার বলেছি যে, উন্নয়ন অর্থ কোনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন অর্থ বসবাসকারি জনগোষ্ঠীর (রাজনীতিক সহ) মানসিকতার উন্নয়ন। মানসিকতার অবনতির কারণে আমাদের কোষাগার দুরবস্থায় ধরেছে। দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি লাগামহীন হয়েছে। আর্থিক লুটপাট হচ্ছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় দেশ ভরে গেছে। আমরা বিশ্বের নিম্নমানসম্পন্ন দেশের কাতারে ঠাঁই করে নিয়েছি। আমাদের রাজনীতি যেখানে দেশব্যাপী মিথ্যা, কুশিক্ষা, দুর্নীতির প্রশিক্ষণ দেয়, সেখানে সুশিক্ষা আসবে কোত্থেকে? জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন হবে কীভাবে? জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নতি না করে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলে যে দশা হয়, এদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উন্নয়নের মাপকাঠি বলতে আমি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট গোলস'কে বুঝি। এখানে সতেরোটা বিষয়ের (দফার) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া আছে। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার আবার সাব-দফা আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে যা অর্জনযোগ্য। নয় নম্বরে আছে 'ইন্ডাস্ট্রি, ইনোভেশন এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার'। চার নম্বরে আছে 'গুণগত শিক্ষা'। এক থেকে আট নম্বর দফা বিগত আট বছরে কতটুকু

অর্জিত হয়েছে বা অন্য দফাগুলোরই-বা অবস্থা কী, তা আমাদের জানার বাইরে। আমরা শুধু 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' নিয়ে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছি। আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হয়, আমাদের অবস্থান খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। আমাকে এ দফাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বললে আগেই দু-তিনটা নতুন দফার অবতারণা করতাম, যে দফাগুলোর উন্নয়নের অভাবে অনেক দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। আমাদের দেশের উন্নতির অবস্থাও সেই একই কারণে ভুগছে। কোনো সুহৃদ এ কলামে বাস্তব তথ্য দিয়ে এ বিষয়ে এদেশের প্রকৃত অর্জন তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা উপকৃত হতাম।

আমাদের উন্নয়ন হবেই-বা কেন। আমাদের মৌখিক কথা আছে, অন্তরে ইচ্ছে নেই। লিখিত উদ্দেশ্য আছে, বাজেট বরাদ্দ আছে, বাস্তবায়ন নেই, তাই অর্জন নেই। এর সাথে আরেকটা কথা আছে 'সিস্টেম লস'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রথিতযশা অধ্যাপকের সাথে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমার আলাপচারিতা হচ্ছিল। তিনি একজনের লেখাপড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 'শুনেছি আন্ডার ম্যাট্রিক'। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কত ক্লাস আন্ডার'? উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। আজ যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন, 'এদেশের প্রতিটা সরকারি ও প্রজেক্টের কাজে সিস্টেম লস কত'? আমাকে উত্তরে বলতে হবে, 'যা কিছু ঘটছে, আপনি তো নিজ চোখেই দেখছেন। আপনি যতটা উচ্চ-মাত্রা অনুমান করতে পারেন, ততই সঠিক'।

(প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আমার স্মৃতিকথা ও বর্তমান স্বাদেশিকতা

(প্রকাশিত শিরোনাম:একই চিকিৎসা বারবার চলে না)

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে স্মৃতিচারণ করতে খুব ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে মনের গভীরে পুঞ্জীভূত স্মৃতির সাথে না-পাওয়ার বেদনামিশ্রিত বর্তমানকে মেলাতে। তাই অনেক অবাঞ্ছিত কথামালা। এটাই মনে হয় ইহজীবনের পরিণতি। মনে হয় বলছি এ কারণে যে, এর আগে কখনো জীবনসায়াহ্নে উপনীত হইনি, তাই। 'নতুন নামে ডাকবে মোরে ডাকবে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে, আসবো যাব চিরদিনের সেই আমি' তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাস, অনন্ত এ জীবনের জীবন ও ঘটনার প্রতিটি মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা চির নতুন, অবিরাম নতুনের আলিঙ্গনে সামনে ধেয়ে চলেছি। ফিরে আসা নিয়মের লঙ্ঘন। কিছু স্মৃতি কখনো বেদনা হয়েও মনের কোনে উদ্ভাসিত হয়, যা হয়তো জনসমক্ষে বলা হয়ে ওঠে না। আবার গতকাল বা পরশু যে নীতিকথা ও যুক্তিতে অনড় ছিলাম, আজো যে সে একই বক্তব্যে অনড় থাকবো, এটা নাও হতে পারে। কারণ সময় ও স্বার্থ পরিবর্তনশীল। জিহ্বার দায়িত্বজ্ঞান কম, সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্যের বিকাশও সমাজ থেকে বিলীয়মান, তাই।

এদেশের স্বাধীনতা এসেছিল আমার কিশোর ও উঠতি বয়সের সন্ধিক্ষণে। বাস্তবতার জ্ঞান যতটা না-ছিল, ছিল দুরন্ত-বেয়াড়া একটা মন, আবেগপ্রবণতা। স্বাধীনতার পরে রিলিফ হিসেবে অনেক কিছুই দেওয়া হতো। বণ্টন তালিকায় গ্রাম থেকে আমার ভাগে একবারই একটা বরাদ্দ এলো, ছোট্ট একটা এক ব্যাটারির রেডিও। রেডিওটা ছিল আমার সর্বক্ষণের সাথি। রিলিফ অনেক চুরি হতে দেখেছি, শুনেছিও। 'মহান নেতাকে' মনের কষ্টে বলতে শুনেছি, 'এত কম্বল এলো, আমার কম্বলটা কোথায়!' 'মানুষ পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।' 'মহান নেতার' অকপট স্বীকারোক্তি তার প্রতি আমার কিশোর মনের ভক্তি বাড়িয়ে দিত। অপরিপক্ক বয়সের কারণে দেশের অবস্থা গভীরভাবে ভাবার অবকাশ তখনও মনে তেমন একটা জন্মায়নি। ভাবতাম, দেশটা কেবল স্বাধীন হলো; আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝি। স্বাধীনতার পর পরই আমাদের অনেক নেতা-কর্মীর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের যে দীনতা শুরু হয়েছিল, মাঝপথে কখনো ঊনিশ-বিশ, কখনো পনেরো-বিশ হয়েছে মাত্র– সে থেকে পতন অদ্যাবধি অব্যাহত আছে এবং তা হালে দিগন্তবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। তখন আমার আবেগপ্রবণতা ছিল রেডিওর যত গান নিয়ে। ছয় মাসের মধ্যে রেডিওতে যত গান শুনতাম তার শুরুর বাজনাটা শুনলেই গানের কলিটা মুখে বলে দিতে পারতাম, যেমনটি

বর্তমানে এদেশে কি হতে চলেছে পত্রিকার সংবাদ পড়ে আগেভাগেই মোটামুটি আঁচ করতে পারি। যাকে বলে, 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়'।

যত গান শুনেছিলাম, প্রায়ই ভুলে গেছি। একটা গানের মাঝের কোনো অংশ এরকম ছিল, '... ও তোর আসা-যাওয়া হলো সার, একদিন ভবে দেখবি রে ঘোর অন্ধকার'। ২০১৪-এর নির্বাচনের আগে জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ অনেককে মধ্যস্ততা করতে অনেকবার এদেশে আসতে হয়েছিল; ফল হয়নি। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনে অনুপস্থিত ছিল। তাতে কি যায় আসে! ভারতের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বে ও হস্তক্ষেপে নির্বাচন হয়েছিল। ভারত নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বলে সমর্থনও করেছিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন শেষে আশা দিয়ে বলেছিল 'এটা নিয়ম রক্ষার নির্বাচন'। নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো এ নির্বাচন সাময়িক ভেবে আশায় আশায় দিন গুনছিল। নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে দিনে দিনে পাঁচ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। আঠারো সালের আগে আবারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। বিদেশী প্রতিনিধিদের আবার অনবরত আসা-যাওয়া শুরু হলো। মধ্যস্ততার চেষ্টা। সবই ব্যর্থ হলো। 'কামার যা গড়ে, মনে মনে গড়ে।' গড়া শেষ হলে বোঝা যায় এটা 'কোন চিজ' হলো। অবশেষে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিরোধী জোট বাদে নির্বাচন আরেকটা হলো। ভারতও বিনা-বিবেচনায় স্বীকৃতি দিলো। পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু হলো 'নিশী রাতের নির্বাচন'। আমরা দেখলাম, 'কেউ কথা রাখেনি', গণরায় উপেক্ষিত হয়েছে। প্রতিবেশী ভারত ক্ষমতাসীন বন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে নিরাশ করেনি। এতে যে উভয় পক্ষেরই প্রকাশিত-অপ্রকাশিত স্বার্থ জড়িত।

আমি ঘরছাড়া, দলছাড়া পুরোনো রেডিওওয়ালা। কোনো দলের সাতে-পাঁচে থাকিনে। যদিও দেশের কর্তাব্যক্তিদের এ নীতিছাড়া কর্মকাণ্ড ও গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখানো আমাকে দারুণভাবে আহত করে। আমি বলি, কলিকাল; মৌলবি-মাওলানারা বলেন, আখেরি জামানা; মানুষের মতিগতির সাথে কথার কোনো মিল নেই, নৈতিকতারও দৈন্যদশা। যেনতেনভাবে পকেটে স্বার্থ ভরে ফেলতে পারলেই, স্বার্থটাকে নিজের বলে দাবি করা যায়। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ক্ষমতায় যেতে পারলেই হলো। বিবেকের দংশন? আত্মজিজ্ঞাসা? –সবই ওল্ড মডেলের কথাবার্তা!

আমি দেখি এদেশের নেতা-নেত্রীরা তাদের অশুভ আছর করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেশের জনগোষ্ঠীকে জনআপদে রূপান্তরিত করে চলেছেন; ইচ্ছে করলে

জনগোষ্ঠীকে তারা জনসম্পদে পরিণত করতেও পারতেন। আগে নিজে ভালো হতে হতো। দেশের মানুষ রাজনীতিকদের কাছ থেকে সামাজিক সুশিক্ষা দাবি করে। এখন আমড়া গাছ থেকে মিষ্টি আম আসবে কোত্থেকে? আমি তো আমাদের রাজনীতিকদের এই একটা দোষই প্রায় প্রবন্ধেই বার বার দিয়ে আসছি। এদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছি জনগোষ্ঠীকে জনআপদ তৈরি করে। এটাই আমাদের প্রধান ব্যর্থতা। আমাদের 'মহান রাজনীতিকরা' শুধু নগদটাই ভালো বোঝেন। দূরে তাকানোর অভ্যাস এদের নেই বললেই চলে। তাই আজ এই অশুভ পরিণতি। মাঝখান থেকে বায়ান্নটা বছর পেরিয়ে গেছে। এ দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন। তবে বেরিয়ে আসা ছাড়া দেশের উন্নতির বিকল্পও যে নেই। আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবুজ বাংলার ধূর্ত খেঁকশিয়ালকেও হার মানায়, যে কারণে ভুগছে দেশ। তাই একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, যতদিন দেশ পরিচালকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি না হবে, সামাজিক শিক্ষা না গড়ে উঠবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে, দেশের উন্নতি দুরাশা মাত্র। শুধু নির্দলীয় সরকারের অধীন তিন মাসের জন্য নির্বাচন করলেই দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না, যদিও নির্দলীয় নির্বাচন ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবার প্রশ্নই আসে না।

নির্বাচন কিন্তু একদিনের বিষয় নয়। পরিবেশ তৈরি হয় কমপক্ষে ছয় মাস আগ থেকে। আবার চব্বিশের নির্বাচন আসছে। আমার সেই রেডিওর গান আবার মনে পড়লো, 'সর্বহারা হইলাম তবু শেষ হইল না আশা, আবার আমি ঘর বান্ধিলাম সে ছিল দুরাশা রে, সে ছিল দুরাশা।' আমি সেই দূরন্ত উঠতি বয়স থেকে দেখে আসছি, এদেশের প্রায় প্রতিটা নেতা, অন্তত যাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে ভরসা করেছিলাম, আমাকে নিরাশ করেছেন। তারা দেশের কথা ভুলে দলীয় নোংরামিতে জড়িয়ে গেছেন। কেবল আমার ঐ রেডিওটা আমাকে কোনোদিন নিরাশ করেনি। বরাবরই ঠিক গানটা শুনিয়ে গেছে।

যে নীতিহীনতার প্রাদুর্ভাব ও সর্বত্র দলীয়করণের মহোৎসব সকল রাজনীতির অভ্যন্তরে ঘটে চলেছে, আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সামাজিক মঞ্চে কাজ করতে গিয়ে দেখছি; সব যায়গা একই রোগে আক্রান্ত– দুর্নীতি, দলবাজি ও দুঃশাসনের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে মানুষের জিহ্বা ঘোরে ফেরে, বিবেকবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসার কোনো বালাই নেই, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব তলানীতে ঠেকেছে। অথচ আমরা সমাজে চলছি, সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছি। মনুষ্যত্বহীনতার এই রোগের চিকিৎসা রাজনীতিকরা করতে পারেন। অথচ তা না

করে আমরা হাজার হাজার বার উন্নয়নের প্রশস্তি গেয়ে চলেছি। বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি নেই। এতে কোটি কোটি টাকা রসাতলে যাচ্ছে, সবটাই জনগণের টাকা। নীতিহীন জনবল নিয়ে এভাবে কি একটা দেশ চলা উচিত? এই আত্মজিজ্ঞাসার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। আমরা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখিয়ে দেশকে আজ এ পর্যায়ে এনেছি। মানুষের চরিত্র (সৎ প্রকৃতি) ধ্বংস করে ফেলেছি, আবার সেখান থেকে সুনীতি আশা করছি, দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলবে, দুর্নীতির লেলিহান রসনা সমাজ ও জীবনকে উজাড় ও দুর্বিসহ করে ছাড়বে, আর ভোটের ক্ষেত্রে কেবল সুনীতি আসবে, তা কি হয়? এ তো দেখছি 'বিড়াল বলে খাবো না মাছ, ছোঁবো না আমি কাশিতে যাব' অবস্থা। এভাবেই যদি দেশটা চলতে থাকে, তাহলে কি আমরা পূর্বানুমান করতে পারি, আমাদের জন্য কি অশুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে?

আজকের যুগান্তরে (১৫.১০.'২৩) পড়লাম, 'দেশে উন্নয়নের প্রধান বাধা দুর্নীতি: সম্প্রতি এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম ৫ হাজার ৭৫ জন যুবককে নিয়ে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। এতে ৬৯.৪ শতাংশ তরুণের মতে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। এছাড়া অন্য বাধাগুলো হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব (৪৬.৫ শতাংশ)।' এখন বিচার্য বিষয়, কি কি কাজ দুর্নীতির আওতায় পড়ে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই-বা কী!

এদেশের আজকের এ অবস্থা তো রাজনীতিকরাই নিজস্বার্থে তৈরি করেছেন। মাত্রা বাড়তে বাড়তে আজ সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে। এদেশের মানুষ যত দুর্নীতিবাজ হবে; পারস্পরিক হিংসা-হানাহানিতে মত্ত থাকবে, যত ধ্বংসের পথে যাবে, ঐ রাজনীতিক ও তাদের 'পরদেশী বন্ধুয়া'দের জন্য তত লাভ; শোষণ করা তত সহজ। এ সমীকরণটা আমাদের মাথায় যত তাড়াতাড়ি ঢুকবে, আমাদের সুশিক্ষার মান তত বাড়বে, উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

'তলে তলে আপস হয়ে গেছে' কথাটা না কি সত্য নয়, বিরোধী গ্রুপ থেকে বলা হচ্ছে। যদিও আমি জানি, সত্য। প্রশ্ন আসে, 'আপস কার সাথে'? যে আমাকে '১৪ ও '১৮-তে ক্ষমতায় থাকতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে, আমার নিত্যকাজের সহচর। ভারত ও চীন উভয়ের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে মাঝখানে পড়েছিল বাংলাদেশ। ভারত পড়েছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও আস্থাহীনতায়। পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থান এক রকমই আছে। চীন একটু ছাড় দেওয়াতে এবং বাংলাদেশ ভারতকে বোঝানোতে, ভারত আবার বন্ধুর পাশে নীরবে অবিচল। সুদূরের অতিথিদের সেই 'আসা-যাওয়া হলো সার', যথার্থ বলে মনে হয়। আমরা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে

বলছি এক কথা, ক্ষমতায় থাকা স্বার্থ উদ্ধারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বিধায় পিছনে পিছনে চরম সমালোচনা করছি। আবার বলছি, 'আমরা আছি, দিল্লিও আছে। দিল্লি আছে, আমরাও আছি'। একটা চিন্তার বিষয় এখানে আছে। দূরের সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রবক্তারা এবার ভিসা স্যাংশন নিয়ে নেমেছে। পরবর্তীতে যে-কোনো সময় অর্থনৈতিক স্যাংশনও আসতে পারে। এখানেই সমস্যাটা প্রকটের ভয়। তখন কী হবে! ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবো তো! পার্শ্ববর্তী বন্ধুদের তো আমরা চিনি– সবাই 'নেওয়ান সা'ব'। আমি কিন্তু এদেশের রাজনীতিক বলতে ঢালাওভাবে সবাইকে বোঝাচ্ছি না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। সে ব্যতিক্রম দিয়ে দেশের কাজ হবে না।

বয়সের দীর্ঘতায় রিলিফের সে রেড়িও কখন, কোথায়, কিভাবে হারিয়ে গেছে মনে পড়ে না। এখন আশক্ত হয়ে গেছি দৈনিক পত্রিকা নিয়ে। না পড়ে থাকতে পারিনে। আবার পড়লেই এদেশের মানুষের, বিশেষ করে রাজনীতিকদের দায়িত্বহীনতা, মিথ্যাবাদিতা, নীতিহীনতা, হালকামি ও উমেদারি কর্মকাণ্ড আমাকে মানসিকভাবে পীড়া দেয়। এ মাস্টারসাহেব তাতে ভীষণ কষ্ট পায়। তাই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পত্রিকায় লিখি। প্রতিজ্ঞা করেছি, রাজনীতিতে দেশাত্ববোধ ফিরে না আসা পর্যন্ত জীবন থাকতে লিখে যাবো। রাজনীতিতে যারা আছেন, তারা আছেন তাদের মনমাতানো হুশহারা তালে। এতেই দেশ ও সমাজের বারোটা বেজে যাচ্ছে। একই চিকিৎসা বারবার চলে না। অনেকেই যে টোটকা চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তাতে রোগের নিরাময় সুদূর পরাহত। আমি কিন্তু দলকানা হতে চাই না। গত নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। রসে-যাওয়া জরাজীর্ণ দোতলা বিল্ডিং ভেঙে চুারমার করে নীচে কমপক্ষে পনেরো হাত মাটি খুঁড়ে তুলে দূরে কোথাও ফেলে দিতে হবে। তারপর সেখানে মানসম্পন্ন মালামাল ব্যবহার করে আবার কমপক্ষে পনেরোতলা বিল্ডিং তুলতে হবে। বিল্ডিং কোডে জবাবদিহিতা আনতে হবে। অপারেশনের কাজটা রোগীকে দিয়ে না করানোই ভালো।

(প্রকাশ: ২৫ অক্টোবর ২০২৩ দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শ্রাদ্ধ যত আমার, রাম নাম তোমার

'পাগল মন– মন রে, মন কেন এত কথা বলে।' কথা না বলে মনের আর যে কোনো গতি নেই, তাই। কদিন থেকে মনটায় উদাসী ভাব, তাই কলম ধরিনি। ২৮ অক্টোবর '২৩-এর আগের রাত। বিকেলে গিয়েছিলাম ঢাকার অদূরে, গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে– এক জরুরি মিটিংয়ে। মিটিং শেষ হতে রাত সাড়ে আটটা। সাভার থেকে গাবতলী পর্যন্ত যানজট। কেন এই যানজট? গাবতলীতে প্রতিটা যান তল্লাশি করে একটা একটা করে ঢাকার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে তাই। পেছনে কত মাইল জানজট বাধলো– ওটা কোনো বিবেচ্য বিষয় না। উদ্দেশ্য ঢাকায় আসতে মানুষকে পথে তল্লাশির নামে আটকে রাখতে হবে, অথবা ভোগাতে হবে। পুলিশ কি জানে না, ঘটনার আগের রাতে গাড়িতে করে কোনো বিস্ফোরক কোনো পাগলেও বহন করে না? পুলিশ তল্লাশি করছে, এ খবর তারা রাখে। কখন ও কিভাবে বিস্ফোরক আসে– এ বিষয়ে আমার তুলনায় পুলিশের অভিজ্ঞতা ঢের বেশি। তবু তল্লাশির নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি, মানসিক নির্যাতন। যারা আসছেন, সবাই কি মহাসমাবেশে যোগ দিতে আসছেন? তাহলে আমাকে এ ভোগান্তি পোহাতে হবে কেন? এই চার কিলোমিটার আসতে আমার আড়াই ঘণ্টা লেগেছে। ডায়াবেটিস ও প্রেসারের রোগী। পথে অসুস্থ হয়ে অক্কা পাওয়ার অবস্থায় চলে গিয়েছিলাম। তাই এই বিতৃষ্ণ বিষয়গুলো লিখছি। আর কত? দেশচালকরা আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা ভাবেন না কেন? দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে বিদেশে থাকতে পারিনি। দেশে থেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে যদি কিছুই না বলতে পারি, তাহলে কেন এই 'নরকবাস'! আবার দেশে ভালোভাবে বাস করতে গিয়ে শতেক প্রতিবন্ধকতার মুখে কখনো ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণায় মনটা রি রি করে। এদেশে জন্মিয়ে কি পাপ করেছি? কোনো ঠুনকো অযুহাত দেখিয়ে কোনো কোনো দিনে ইন্টারনেট কানেকশন খুব মন্থর থাকে। ফোনের বাটন টিপতে টিপতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। কেন এমন হয়? হঠাৎ করে কোথাও সমাবেশের আগে বা সমাবেশের দিন বাস-ট্রাক, নৌকা, রিক্সা, নছিমন ধর্মঘট শুরু হয়। যারা ধর্মঘট করে তারা কারণ একটা দেখায়। তারা কি মনে করে যে, সাধারণ মানুষ এসব বোঝে না, চিঁড়ে খেয়ে বেঁচে আছে? প্রতিটা প্রতিবাদে ও নির্দিষ্ট দিনে বাস ভাংবে, বাসে আগুন জ্বলবে, টেলিফোন টাওয়ারে আগুন ধরবে, পূজামণ্ডপ ভাংচুর হবে, অগণিত মানুষের নামে কেস-বাণিজ্য, গ্রেফতার-বাণিজ্য হবে; কেবল এর জন্য প্রকৃত দায়ি ব্যক্তি কে বা কারা তা তদন্তে কোনোদিনই বেরিয়ে আসবে না। অথবা তদন্ত রিপোর্টের ওপর

আস্থা রাখা যাবে না যে এটা প্রকৃত ঘটনার রিপোর্ট, না কি দলবাজির রিপোর্ট। এ আবার কোন আজব দেশে বসবাস? প্রতিটি ঘটনা আসে নব নব বেশে, অভিনব বাঙালি কৌশলে, অভাবিত পথে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। বাড়ির সামনে স্কুল, ভোটকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভোট চলছে। স্কুলের মাঠে কমপক্ষে সত্তর-আশিজন ভোটার লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টিভি-ক্যামেরাম্যান এসে ছবি তুলে নিয়ে গেল। একই ভোটার সকাল থেকে বাদ-যোহর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। কেউবা অনেকক্ষণ পর পর ভিতরে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে এসে বাইরে ঘোরাঘুরি করে অনেকক্ষণ পর একই লাইনে দাঁড়াচ্ছে। টিভিতে ছবিসহ প্রচার চলছে, ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে। লাইনে লোকের ঘাটতি নেই। শুধু একদলের লোকজনই ঘোরাঘুরি করছে। আমার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, ভোট দিতে গিয়েছিলেন'? উত্তরে বললেন, "গিয়েছিলাম, কিন্তু ভোট দিতে পারিনি। আমাকে সালাম দিয়ে এক ছেলে বললো, 'স্যার, এসে আর কি করবেন, আপনার কষ্টটা অন্য কেউ করে দিয়েছে'।" এদেশে সংঘটিত কাণ্ডকারখানা ও চিন্তাভাবনার অভিনব কুটিলতা দেখে ভাবি, 'কত রঙ্গের পিরিতি তুমি জানো রে বন্ধু, কত রঙ্গের পিরিতি তুমি জানো-ও! তুমি লাগাইয়া পিরিতের রশি, দূরে বইসা টানো রে বন্ধু, কত রঙ্গের... ।' এদেশের রাজনীতিকদের কুটবুদ্ধি ও রঙ্গ-রসের কি অভাব আছে? আসলে একটা কথা জানি, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। এর পরও রাজনৈতিক দলগুলো জিদ করে তাদের কর্মকাণ্ডের উপর সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস রাখতে বলে। আচ্ছা বলুন তো, দুই সন্তানের জননীর ভার্জিনিটি টেস্টের জন্য টাকা খরচ করে মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

আমি কয়েকদিন আগেও লিখেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কথাটা উচ্চারণ করতে বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো, এখন আর ফুলে ওঠে না। কেন ওঠে না, এর উত্তর সাধারণ মানুষকে এদেশের দলবাজ বুদ্ধিজীবী ও চর দখল-সদৃশ কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত, দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতিতে মত্ত দেশচালকদের দিতে হবে। এ কৈফিয়ত চাওয়া আমার মতো ক্ষুদ্র মাস্টারসাহেবের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকারটুকু পাওয়ার জন্য বায়ান্ন বছর লাগছে কেন? দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতি-সচেতন হলেও আনুমানিক দশ থেকে পনেরো শতাংশ লোক সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ বাকি পঁচাশি শতাংশ জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠনের কৌশল আয়ত্ব করে ফেলেছে। তারা সাধারণ

মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে জনকোষাগার আত্মসাতের ব্যবসা করে। কথাবার্তায়, ইশারা-ইঙ্গিতে দেশের মালিক বলে নিজেদের দাবি করে। এসব তথ্য কোনোটা নিজ কানে শোনা, কোনোটাবা দৈনিক পত্রিকায় পড়া। আমরা তো অন্ধ নই, এ পোড়া চোখে সবকিছুই দেখছি, পর্যবেক্ষণ করছি। মাস্টারসাহেব হওয়ায় ঘোরানো-প্যাঁচানো বিষয় বুঝিনে, লিখতেও পারিনে, তাই সোজাকথা সোজাসুজি লিখি। এতে স্বার্থান্বেষী অনেকের মাথাব্যথার কারণ হয়, এটাও বুঝি। কিন্তু এই দশ-পনেরো শতাংশ লোক দেশটাকে লুটতরাজ করে খাবে, গুরুর সম্পত্তি বলে ভাববে, আর এদেশের একজন দেশ-সচেতন শিক্ষক হয়েও মুখ বন্ধ করে থাকবো, এটা কি হয়?

ভালোভাবে বসবাস করে, কোনো দলে না ভিড়েও অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা এদেশে কই? অশালীন কথা না বলেও শালীন-ন্যায্য কথা বলার অধিকারই-বা কই? বিভিন্ন অপকৌশলে আপনাকে থামিয়ে দেওয়া হবে, কিংবা আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে পচিয়ে দেওয়া হবে; আপনি গুম হয়ে যাবেন, বা আপনার অকাল মৃত্যু হবে। বাঙালির সংস্কৃতি ভিন্ন, কুটবুদ্ধি-কুটকৌশল ভিন্ন, মন-মানসিকতা ভিন্ন। আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে জন্ম নিয়ে, সেখানকার পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে এদেশের রাজনীতিকদের কুটকৌশল ধরতে পারা কঠিন। আমি জানি বাঙালির এ কুটকৌশলের খেলায় আমরা যেভাবে ভুগি, তারা (ভিনদেশি) কোনোদিনই তা বুঝবে না।

অসংখ্য দলকানা প্রাবন্ধিকের লেখা বিভিন্ন পত্রিকার বদৌলতে প্রতিদিন পড়ছি। দলকানা এই প্রাবন্ধিকেরা কি ভাবতে পারছেন না যে, নির্দলীয়-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই ‘পিলো পাচিং খেলা’ তো এদেশে অনেকবারই দেখলাম, লাভটা কী হলো? ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে, আমি নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলছি। আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, নির্দলীয় সরকার আনুন, আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আরো অনেক ফ্যাক্টর বিবেচনায় আনুন। টেকসই উন্নতির ধারা সুনিশ্চিত করুন। ভাওতাবাজির রাজনৈতিক ধারা পরিহার করুন, তা যে দল বা জোটই ক্ষমতায় আসুক, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি কোনো দলের বিরুদ্ধে নই, তাদের কুটিল ভাবনাচিন্তা ও দেশবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, দলবাজির বিরুদ্ধে।

আমরা বারবার মুরগি পোষানি দিই বনবিড়ালের কাছে, কখনো কখনো বনবিড়াল বাদ দিয়ে শেয়ালের কাছে। কিন্তু আমাদের মুরগির যে দশা হবার কথা তাই-ই

হয়। এদেশের প্রকাশ্য বুদ্ধিজীবী, ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবীরা মুরগির অবস্থাকে বিবেচনায় আদৌ আনেন না। আমার মতো অজাত মাস্টারসাহেবের কথা কানেও তোলেন না। আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে আগে তাকাতে হবে। ভাবতে হবে– উদ্দেশ্য বনবিড়াল অথবা শেয়াল পোষা, না কি মুরগিকে রক্ষা করা? না কি মুরগি-বনবিড়াল নিয়ে আজীবন লুকোচুরির খেলা করা? এ খেলার বয়স কিন্তু বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কোনোক্রমেই মুরগিকে নিরাপত্তা দিতে পারছি না। যে কোনো মূল্যে দেশকে টিকিয়ে রাখতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হলে জরুরি ভিত্তিতে বেশ কিছু কাজ এখনই করতে হবে। প্রথমেই নির্দলীয় সরকার নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারলে এদেশের দেশসচেতন ও দেশপ্রেমী মানুষগুলো প্রয়োজনে জাতিসংঘের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানাতে পারেন। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্দলীয় সরকার ও সংবিধান পরিবর্তন বিষয়ে একটা গণভোট হতে পারে। আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এতে সাধারণ মানুষ পজিটিভ মত দেবে। অতপর শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন একটা নির্দলীয় সরকার গঠন করতে হবে। সরকারে যেন দল-তোষণ ও প্রভু-তোষণ লোক না ঢুকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সরকারের মেয়াদ কমপক্ষে তিন বছর হবে। দলমত ভুলে দেশপ্রেমী মানুষ সে সরকারকে সহযোগিতা করবেন। নির্দলীয় সরকারের প্রধান কাজ হবে: সরকারের বেশ কয়েকটা বিভাগকে পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠন করা। যে কোনো মূল্যে শক্ত হাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও দুর্নীতির সাথে জড়িত লোকগুলোকে খুঁজে বের করে আইন ও বিচারের আওতায় আনা। কোনো আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে দেশের স্বার্থের ব্যাপারে মাথা নত না করা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করে যতটা পারা যায় আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা। অবকাঠামো খাতে খুব বেশি টাকা ব্যয় না করে পরিমিত ব্যয় করা। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় টাকা ব্যয় করা। শিক্ষা-প্রশাসন কাঠামো ও শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, এটাকে পুনর্গঠিত করা। এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশি পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করার কাজটা যথাযথ হয়নি। কারণ আগের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল শিক্ষা-প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন ব্যর্থতা। সে কারণে 'মশা মারতে কামান দাগা'র দরকার ছিল না। রিভিউ করলেই চলতো। বর্তমান নব্য শিক্ষাব্যবস্থা সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হবে, তেমনটি আশা করা যায় না। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষামান আরো দুর্বল হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে এজন্য নতুন প্রজেক্টের নামে বেশি টাকা বরাদ্দ না করে রিভিউ করলেই চলবে।

দেশের অর্থব্যয় ও ব্যবহারে 'বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একশ টাকা ব্যয় করে রাষ্ট্রের জন্য চল্লিশ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জননীতি বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতি এমন একটা বিষয় যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে একটা দেশ ধ্বংস হতে দেরি লাগে না। দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধ করতে পারলে অল্প সময়েই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হতে বাধ্য। শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান এর বাস্তব প্রমাণ। দেশ গড়ার জন্য দেশ-পরিচালকদের সততা ও সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। তাই দেশে সৎ, যোগ্য ও সুশিক্ষিত লোকদেরকে দেশসেবা, সমাজসেবা ও নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করা এবং নীতিহীন, গলাবাজ, চাটুকার ও লাঠিয়াল বাহিনীর আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা প্রয়োজন। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির স্বার্থকতা এখানেই। সমাজে প্রতিহিংসা, দলাদলি, বিভাজন, পারস্পরিক বিদ্বেষ সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে রোধ করতে হবে। অতপর সংবিধান পরিবর্তনে হাত দিতে হবে। এ বিষয়ে অনেক কথা আছে, যা এত অল্প পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলবো, সরকারি দলসহ প্রতিটা রাজনৈতিক দলকেই জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে এবং তাদের কর্মব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর হাতে কর্মভার ন্যাস্ত করতে হবে, যাতে সরকার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য বজায় থাকে। এরপর দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। এদেশে 'ভালুকের হাতে খন্তা' চলে যাওয়ায় তারা খন্তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। খন্তাকে ভালুকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে, নইলে শ্রাদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণ ও দেশের এবং রামনাম অর্জন করছে লাঠিয়ালবাহিনী সজ্জিত রাজনৈতিক দল।

(প্রকাশ: ৪ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয়

'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় সংলাপ' শিরোনামে যুগান্তরে (৬/১১/'২৩) যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার অনেক কথাই গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য, অতীতের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আমি সে আলোচনা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে চাইনে। তবে ঐ শিরোনামের সাথে আমার চিন্তাধারা ও বাস্তবতার বেশ অমিল রয়ে গেছে। সব কথা যেহেতু এখানে লিখতে পারবো না, বাস্তবতাই প্রমাণ দেবে। আমার মনে হয়, সংলাপের মাধ্যমে স্বল্পকালীন সংকটের সমাধান চলে। অতীতে তা হয়েছেও। বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করেছে। অবস্থাটা জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে। কথায় আছে, 'ঘরে বাইরে এক মন, তবেই করো কেষ্ট ভজন'। আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে। আমাদের এখন দেশের জন্য কোনটা ভালো, সে চিন্তা করতে গেলে চলছে না, ভাবছি ক্ষমতায় থাকা, না থাকা। তাই এত সহজে উত্তরণ সম্ভব নয়। কবিরাজি ঝাড়ফুঁকে সাময়িক উপশম হতে পারে, কিন্তু রোগের নিরাময় সুদূরপ্রসারী। এদেশের রাজনীতিকদের রোগ-বালাই সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়েছে, সামাজিক সিস্টেম ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের অবস্থা 'সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা'য় রূপ নিয়েছে। 'পরদেশী বন্ধুয়া'দের কবলে আমরা ধরাশায়ী হয়ে গেছি। সংলাপ, সংলাপ খেলা এখন 'ভুল, সবি ভুল...'। আমাদের সংকটের আরো গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণে নামতে হবে।

আমার প্রশ্ন, সংলাপ তো কারো না কারো মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হয়েই চলেছে, সংকটের সমাধান হচ্ছে কই? এ সংকট তো সাময়িক সময়ের না। সে-ই একানব্বই সাল থেকে। আমার বিশ্বাস, উভয় পক্ষের আগে শুভবুদ্ধির উদয় হওয়াটাই সংকটের সমাধান। কোনো 'ধনুক-ভাঙা পণ' গ্রহণযোগ্য না। পরিবেশ ও মানসিকতার উন্নতি হওয়ারও প্রয়োজন, যা এমনি এমনি হয় না। আমাদের আগে অহংবোধ (ইগো); একগুয়েমি ভাব; দেশের যত ক্ষতিই হোক, আমার বিদেশী শক্তির পুতুল হয়েও ক্ষমতা চাই; 'তোমরা যত যা-ই বলো, যে কোনোভাবে আমাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে বা যেতেই হবে।' –এগুলোই দেশীয় গণতন্ত্রের পথে মূল সমস্যা, দেশের উন্নতির পথেও সমস্যা। চিন্তা-চেতনায় ও কাজে নির্ভেজাল সততা ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে আপন করে নেওয়ার কোনো বিকল্প রাজনীতিতে নেই। রাজনীতিকরা জনসাধারণের আস্থার জায়গা। এখানে 'মুখে মধু পেটে বিষ' হলেই সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। এর ব্যতয় যে-দেশেই হয়েছে, সেখানেই দমন-পীড়ন করে শাসকগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর ঘাড়ে চেপে বসে

রাজত্ব করে যাচ্ছে। সবই শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা। লুটেপুটে খাচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণ ও শাসকগোষ্ঠী কেউই শান্তিতে নেই। এমন দেশও বিশ্বে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, এমনটি নয়। আগে ভাবতে হবে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? রুচিটা কেমন? আমরা কি কি কথা বলে জনসাধারণকে সংগঠিত করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম? আমরা কি সে কথা রেখেছি বা রাখছি? আমরা বিদেশী শোষকদেরকে তাড়িয়ে নিজেরাই কি শোষকগোষ্ঠীতে পরিণত হইনি? আমরা কি সে-কথাগুলো কখনো ভাবি?

সংলাপে বসলেই এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এক দল অন্য দলকে আক্রমণ করে বিশ্রী ভাষায় অশালীন কথা বলা, গালাগালি করা– এখানেও সমস্যা। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ডাহা মিথ্যা কথা বলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে ইতঃস্তত না করা, একের দায় অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, দেশসেবার জন্য রাজনীতি করার কথা বলে প্রকাশ্যে দেশ-শোষণ ও চরদখলের ন্যায় রাজনীতি করা উচিৎ নয়। দমন-পীড়ন করে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না, এটা সত্য। বাক্য যত দীর্ঘই হোক যতিচিহ্ন তার থাকবেই। রাত যত বিপদের ও অন্ধকারঘন হোক না কেন, ঊষার সূর্যের আবির্ভাবে ঘোর অমানিশা কাটবেই। খোদার তৈরি মানুষ যখন খোদাকেই অস্বীকার করে, প্রকৃতির প্রতিশোধকে আমলে নেয় না, তখন তাকে তো আর মানুষ বলা যায় না। অতিমানব বলা যায়। মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' (আমিই সত্য) বলার শামিল। জাত রাজনীতিকদের উচিত দেশের দিকে তাকিয়ে সোজাপথে জীবনবিধানটা অন্তত মান্য করা। অতীত ঘাটলে দেখা যায়, এদেশের সব ক্ষমতাসীন দলই কাজের বদলে রাজনৈতিক কুটিলতা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। মাত্রার রকমফের আছে। 'মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট' আদৌ গ্রহণীয় নয়। আমরা জনপ্রতিনিধি হবো জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নয়, বহিঃশক্তির খুঁটোর জোরে এবং ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে। এ উদ্দেশ্যে শক্তি প্রদর্শন যখনই হয়, তখনই দেশ গড়ার ভালো চিন্তার বিষয়টা ওলট-পালট হয়ে যায়; চর দখলের প্রসঙ্গ চলে আসে। যেখানে চর দখল হয়, সেখানে মানবতা, নীতি-নৈতিকতা, জনস্বার্থ থাকে কি-না? চর দখলের জন্য সকল অন্যায় জায়েজ হয়ে যায়। সেজন্য সংলাপ, সংলাপ খেলা সাজানো নাটক মনে হয়। কোনো অন্যায়কে, কোনো না কোনো রাজনীতিকের কুটবুদ্ধিকে সংলাপের নামে চাপিয়ে দিতে পারলেই সংলাপ স্বার্থক বলে দাবি করি। এতে গণতন্ত্র মুক্তি পায় কি? বিগত ত্রিশ বছরে পেয়েছে কি? এগুলো প্যারাসিটামল খেয়ে সাময়িক উপশম অথবা সময় পার করার শামিল। মানুষের মগজ যখন বাইরে-বলা কথার সাথে মনে মনে বিপরিতমুখী কাজ করে। জ্বালাময়ী বক্তব্যের

সাথে কাজের অমিল থেকে যায়। তা সাধারণ মানুষ বোঝে। দেশের ভালো-মন্দ বুঝতে রাজনীতি করা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা বলি, দেশে সংকট দেখা দেয়। আমি বলি, যুগ যুগ ধরে উন্নতির ভাঙা ঢোল অনবরত বাজাতে থাকি, উন্নতির নাগাল ধরতে পারিনে, বা নিম্নমানের চিন্তাধারার কারণে প্রকৃত উন্নতি কাকে বলে বুঝিনে।

গ্রামের হাটে ডুগডুগী বাজিয়ে মানুষ জড়ো করে গমের আটার বড়ি ক্যানভাস করে ধন্বন্তরি ওষুধ বলে বিক্রি করে। এদেশের রাজনীতিকরা দেশ চালানোর নাম করে, আন্দোলনের নাম করে সন্ত্রাসী তৈরি করছে, অসৎ ব্যবসায়ী তৈরি করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণের সুযোগ করে দিচ্ছে। এসবই সংকট। এ দায় কোনো দলই এড়াতে পারে না। এসব আমার নিজ চোখে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেখা। তাই দেশ দখলকে চর দখল ও সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা বলে অভিহিত করছি। এটা অমূলক নয়। ষাটের দশক থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুকে তো নিজ চোখে দেখছি, তাহলে কে কি বললো, সত্যকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দিলো, সেটাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তা সে যে দলই করুক না কেন। এ কলামেই বহুবার লিখছি, বর্তমান পেক্ষাপটে শুধু নির্দলীয় সরকারই সমাধান নয়; কারণ রাজনীতি পচে গেছে, বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও দেশসেবা-বিরুদ্ধ মানসিকতাকে যে করেই হোক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। রোগের চিকিৎসা রোগীকে দিয়ে হবে না, দক্ষ ডাক্তার দিয়ে করাতে হবে। এরও একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকবে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ থাকবে, থাকবে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আমি বিশ্বাস করি, টেকনোলজির এই উৎকর্ষের যুগে মানুষের চেষ্টায় অসাধ্য কিছু নেই। এটাতো কঠিন কিছু না। অক্ষয় কুমার বড়াল লিখেছিলেন, ‘কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়–হৃদয়’। আমি কবি নই, তাই হৃদয়কে মন-মানসিকতা বলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুন্দর অকৃত্রিম মন-মানসিকতাই পারে এদেশকে গড়তে। এই ছোট্ট একটা উর্বর মাটির দেশ, মানুষগুলোও কর্মঠ, যদিও একটা অংশ পলিটিক্যাল টাউটে পরিণত হয়েছে। এটাকে গড়ে তোলার জন্য শুধু একজন সৎ, দূরদর্শী ও দেশপ্রেমী মানুষ, তার মনমতো একটা টীম গঠন করে নিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন। এসব বাস্তব এবং সত্য কথা বলার এখন সময় এসেছে। তাই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। পরবর্তী সময়ে রাজনীতিকরা তাদেরকে অনুসরণ করতে পারেন। গত প্রবন্ধেও অনেক কথার মধ্যে এ বিষয়ে কিছু কথা লিখেছিলাম। এ দেশের রাজনীতিতে যে লুটতরাজের

রাজনীতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজনীতির নামাবলীতে নিজস্বার্থ অর্জনে রাজনীতিতে যোগদান বহাল রয়েছে, লাঠিবাজি ও চাটুকারিতা বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, 'খুঁটোর জোরে পাঁঠা কোঁদে'র গুপ্ত নীতির তরিকা বলবত হয়েছে, মনুষ্যত্বের যে নির্লজ্জ অপমান নীতি চালু হয়েছে, সত্য যেখানে বিদূরিত হয়েছে– তাতে টোটকা চিকিৎসায় কাজ হবে না। সংলাপে পরিবেশ ফিরবে না। বরং পরিবেশ ক্রমশই খারাপের দিকে যাবে। আগে দেশচালকদের চিন্তাধারার পজিটিভ পরিবর্তন বাধ্যতামূলক। তারপর সেটার প্রাকটিস। আমি এসব কথা লিখছি সাইকোলোজির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে। যে মানুষগুলোর মগজ একবার বিকৃত হয়ে গেছে, সে মগজ আর ভালো চিন্তা করতে অপারগ। বানু মোল্লা তার সায়েরিতে বলেছিলেন, 'যার যে স্বভাব দোষ না যায় কখন, হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। বিকৃত মানসিকতার লোকগুলোকে বাদ দিয়ে এদেশে অসংখ্য ভালো নীতিবান-সুশিক্ষিত লোকবল আছে, পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করুন। দেশ আবার ভালো হয়ে যাবে।

সরকার কোনোভাবে কোনো কিছু পরোয়া না করে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও একটা নির্বাচন অতীতের মতো করে ফেলতে চাইলে তা পারবে, এ বোধটুকু আমার আছে কিন্তু পরিণতি শুভ হবে, পারিপার্শ্বিকতা তা বলে না। শুভবুদ্ধির উদয় যদি না হয়, তবে কার কি বলার আছে! আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশের সরকার তেমন কিছুই করবে না বা করতে পারবে না। এটার বুঝ ক্ষমতাসীন সরকারের আছে। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ সহযোগিতা করবে, এ বিশ্বাসও এদের আছে। দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা, টাকার মূল্যমান ক্রমেই কমছে। এটা অবশ্য ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তেমন বিবেচ্য বিষয় নয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে রাজনীতি ও সরকারের যে উদ্দেশ্য লেখা আছে, তা থাকবে না। তবে দেশ অচল হবে না; শত বাধা-বিপত্তির মুখেও পরাধীনতার আদলে দেশ চলতে থাকবে। আমরা কেউই দেশ ছেড়ে যাব না, আমাদেরও যার যার কাজ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কি দেশ চলেনি? চলেছে। তারা শেষতক চেয়েছিল এদেশের মাটির দখলদারিত্ব, বাঙালিও নয়, উন্নতিও নয়। তবু তো দেশ চলেছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে চালিয়েছিল। এভাবে দেশ চললে, আন্দোলন, গ্রেপ্তার-বাণিজ্য, গাড়ি পোড়ানো চলবে, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, জনদুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যদিও এটা আমাদের কারো কাম্য নয়।

দেশটাকে ভালোভাবে একটা স্বাধীন দেশের মতো চলতে গেলে রাজনীতিতে আগে 'কোড অব এথিক্স', 'কোড অব কন্ডাক্ট' চালু করতে হবে। অপরাজনীতির

চর্চা বন্ধ করতে হবে। বোতলের লেবেল বদল করলে হবে না, বোতলের ভেতরের মালামাল বদল করতে হবে। প্রয়োজনে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। আগে রাজনীতির নিয়মনীতির খোল-নলচে বদল করতে হবে, রাজনীতির নীতিতে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার-কাঠামো বদল করতে হবে। তারপর তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর রাজনীতিকদের জন্য মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। দুর্নীতিবাজ, সোস্যাল টাউটদের মহান রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, দেশসেবক বলা বন্ধ করতে হবে। 'যার গায়ের গন্ধে ঘুম আসে না, তার নাম আতর আলী' বলে ডাকা যাবে না। এতে দেশে মানুষের হাতে টাকা-পয়সা যা-ই থাকুক না কেন, চলে ফিরে খেতে পারবে, সমাজে শান্তি আসবে। নইলে এদেশে রাজনীতি থাকবে, সরকারও থাকবে। দেশটা আরো অরাজকতায় পরিণত হবে। একসময় আরো খারাপ কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হবে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনে বহাল থাকবে, বাস্তবে উদ্দেশ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মানসিকতার উন্নতি না করে ভৌত-অবকাঠামোগত উন্নতিকে এ জন্যই আমি কোনোদিনই উন্নতি বলে গণ্য করি না। এতে অনেকেরই বাক্যবাণে জর্জরিত হই। কিন্তু এদেশের শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে আমার এ কলমযুদ্ধ আমৃত্যু চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লেখা আমার শেষ জীবনের অবলম্বনও বটে।

(প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

এইতো এক সপ্তাহ আগেও পড়েছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় সংলাপ'। আমি লিখেছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয়'। আমি জানি, সংলাপ হলেই সংকট উত্তরণ হয় না। 'মনে যারে চায় রে বন্ধু, দিলে যারে চায়, তারে কি ভুলিতে পারি পরের কথায়।' মনে এক, বাইরে আরেক। জেগে ঘুমানো লোককে তো জাগানো কঠিন। 'খলেরও ছলের অভাব হয় না।' এ-কথা দেশীয় রাজনীতির সব দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো বড় দল যদি তাদের লাভালাভের কথা বাদ দিয়ে দেশের কল্যাণের কথাকে ভেবে কাজ করতো, তাহলে এত সংঘাতময় পরিস্থিতিরই তো উদ্ভব হয় না। আমরা জাতীয় নির্বাচনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে কোনোভাবে যদি একটা নিজস্ব কূল খুঁজে পেতে চাইলে, ক্ষমতাসীন দল যেদিকে যাচ্ছে, তা ঠিক আছে। কারণ তারা তো নিজের ইচ্ছাকেই শুধু গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি তাদের রাজনীতির কৌশলের তারিফ করি, দোষ দিতে চাইনে। যদি কোনো দল মনে করে, অতশত বুঝিনে, যে কোনোভাবে আমাদের আরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার লাইসেন্স নবায়ন চাই, তখন তারা যা করছে এর বিকল্প নেই। তখন সংকট সমাধানেরও প্রয়োজন নেই, তাই সংলাপেরও দরকার নেই। সে কথা তারা প্রকাশ্যেও বলছে। সেক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে, সচেতন মানুষ মাত্রই তা বোঝেন।

আমাদের পাশের গ্রামের একজন তুতলিয়ে কথা বলতো। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করতো, কোথায় যাবে গো বাপু শুনি? সে পু-পু-পু করলেই সবাই বুঝে নিত আর বলতো, 'কষ্ট করে আর বলা লাগবে না, তুমি পুটিমারি গ্রামে যেতে চাও, এই তো?' সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতো। আমরাও মাথা নাড়ি, কিন্তু মতলবটা খুলে বলিনে। সবাই বুঝলেও 'মুখে মধু পেটে বিষ' থাকায় অসম্মতি জানাই। এখানেই সমস্যা। আসলে এক যাত্রায় দুই ফল হতে পারে না। কেউ শ্যামও রাখবে, আবার কুলও রাখবে– এটা হয় না, হতে পারে না। লালন গেয়েছিলেন, 'হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখতে চাও দিল্লির শহর, সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর সদাই মনের ঘোর গেল না।' স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের মনে দিনে দিনে যে ঘোর পাকিয়েছে, তার গভীরতা অনেক বেশি। এ ঘোর সহজে যাবে না। এ ঘোর রাজনীতিকরা তাদের অপকর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা অনর্থক দিল্লি কিংবা ওয়াশিংটনকে দোষারোপ করে নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীপাতা বলে দাবি করি। এটা অযৌক্তিক। লালন আরো গেয়েছিলেন, 'আপন ঘরের খবর লে না।' আমরা আপন ভুলে পরকে তোষামোদ করে বেড়াই।

রাজনীতির উদ্দেশ্যের পথ ভুলে দলীয় গোপন মনবাঞ্ছা পূরণে মত্ত হয়ে পড়ি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তো ওয়াশিংটন দিল্লির উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। এবার দিচ্ছে না কেন? নিয়মটা হয়েছে এরকম– এদেশে ক্ষমতার মসনদে বসতে গেলে জনরায়ের আর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় পার্শ্ববর্তী শক্তি ও পরাশক্তির আশির্বাদ। কথাটা আমাদের মনে গেঁথে গেছে। তাই আপনকে বাদ দিয়ে দিল্লি-ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াচ্ছি। দিল্লিরও উচিত কোনো নির্দিষ্ট দলকে অন্ধের মতো সাপোর্ট না করে এদেশের মানুষকে ভালোবাসা। তাদের দেশে গণতন্ত্র চাইলে এদেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা। তাতে তারা ভালো থাকতে পারবে। আমার এ সোজাসাপটা কথায় আবার খালু বেজার হবার ঢের সম্ভাবনা।

ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি কুমির আর শিয়ালের ভাগাভাগির চাষবাসের গল্প। প্রথমবার আলু চাষ করতে গিয়ে শিয়াল কুমিরকে উপরের অংশ দেবে বলে কথা দিয়েছিল, করেছিলও তাই। কুমিরের অসন্তুষ্টি দেখে দ্বিতীয়বার শিয়াল নীচের অংশও দিতে চেয়েছিল। কুমির খুব আশা করে নীচের অংশ নিয়েছিল। দ্বিতীয়বার চাষ করেছিল আখ। কুমির যত চেষ্টাই করুক ফসল ঘরে তুলতে, বুদ্ধিটা তো করে শিয়াল। অবস্থা ভেদে বুদ্ধি বদলায়। কুমিরের কি শিয়ালের উপর আস্থা রাখা উচিত? কোনোক্রমেই না। তৃতীয় পক্ষ লাগবেই। যা উভয়ের জন্যই ভালো। রাজনীতিতে কেউ কথা রাখে না। ছিয়ানব্বইয়ের আগে মাগুরা উপনির্বাচনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে পাশ করার চেষ্টা বিএনপি-র জন্য কাল হয়েছিল। একানব্বই-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বচনে ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভুলে গিয়ে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জিদ ধরা কি বিএনপির জন্য সঠিক হয়েছিল? খেসারত বিএনপিকেই দিতে হয়েছিল। এখনো দিতে হচ্ছে। আবার একানব্বইয়ের মেয়াদে বিএনপি যতটা ভালোভাবে দেশ চালিয়েছিল, সে তুলনায় ২০০১ এ দেশচালনায় তাদের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এদেশের সচেতন মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরও তাই। '৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদের দেশ পরিচালনার তুলনায় ২০০৮ সাল থেকে দেশ পরিচালনায় অনেক ফারাক। পরিচালনার নীতিতে বেজায় ঘাটতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে ভরা। এদেশের রাজনীতিকদের দেশের প্রতি কতটা দরদ, নিজের কোলে ঝোল টানা, দলবাজি করা, স্বজনপ্রীতি করা– এসব সাধারণ মানুষের না-বোঝর কথা নয়। এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আওয়ামী লীগ বড় ভূমিকা রেখেছিল, কোনো শত্রুও তা অস্বীকার করবে না। দেশের মানুষের জন্যই যদি স্বাধীনতা, তবে স্বাধীনতার কেন আজ এ দশা! এতই যদি করলে, তবে আবার উদ্দেশ্যচ্যুত হওয়া কেন?

একটা গানের অন্তরাটা এরকম–‘ভুল করে তুই বারে বারে করিস কেন ভুল, গলায় মালা পরলি যদি ছিঁড়িস কেন ফুল, ও তুই ছিঁড়িস কেন ফুল।’ বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল যদি জোর করে নির্বাচন একটা করেও ফেলে, তা হবে আবারো ভুল। দেশের জন্য তা হবে লেজেগোবরে অবস্থা। তা হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্তমান সময়ের চেয়েও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ও অশান্তির সূচনা। এতে শুধু ভারতের ওপর নির্ভর করে বিশ্বসমাজ বাদ দেওয়া আদৌ ঠিক হবে না। এজন্য ‘পীরিতে মজেছে মন. কী-বা মুচি, কী-বা ডোম’ অন্ধের মতো অনুসরণ না করে সুপথে আসাটাই রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল হোক না-হোক দেশের জন্য ভালো। তাই ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোটের শুভবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের শান্তি ও মুক্তি নেই। যে মানসিকতার অভাবে সেই একানব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে এদেশ ভুগছে। এর মূল যে এদেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থার অভাব এটা বুঝতে আমরা ভুল করি। আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ করছি, ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোট উভয় জোটেরই লোকজন ক্ষমতার ও স্বার্থ হাসিলের জন্য যারপরনাই মজনুন হয়ে গেছে। কারণ দেশ লুটপাট ও ক্ষমতা খাটানোর একমাত্র সুযোগ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পেশা ও রাজনৈতিক আনুগত্য। তাই নির্বাচনে জিততে এত আগ্রহ। পদপ্রার্থী হতে প্রতিটা ফরম পেতে গোপনে কত লেনদেন করতে হচ্ছে, আল্লাহ মালুম। পদে গিয়ে এ খরচের অন্তত একশ গুণ তো এদেশ থেকেই আদায় করতে হবে, সাথে ক্ষমতা। এই এক রোগেই তো দেশের বারোটা বেজে যাচ্ছে এবং দিন যত সামনে এগোচ্ছে রোগের প্রকোপ বাড়ছে। দেশ ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি জোট যদি নির্বাচনে না আসে তখন ক্ষমতাসীন জোট আসলেই সুষ্ঠু নির্বাচন করবে। তারা তো বিভিন্ন বক্তৃতায় বলছে, এদেশের সত্তরভাগ ভোটার তাদের। সত্তরভাগের মধ্যে অন্তত দশ ভাগ ভোট দিতে এলেও তো তাদেরই জয়। বাকি ভোটার কেন আসেনি, এর একটা সদুত্তর তারা হয়তো প্রস্তুত করে রেখেছে। নিজেদের লোক নিয়ে আসন ভাগাভাগির সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। আসন ভাগাভাগি কাদের সাথে করবে, তাও ইতোমধ্যে গোছানো শেষ। ভাত ছিটালে কাকের যেমন অভাব হয় না, ক্ষমতা ও লাভ ছিটালে পদান্বেষী ‘খাঁটি বাঙালি’ খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। ক্ষমতাসীন দল সে সুযোগ নিচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরো নেবে। এ অবস্থায় বিএনপি জোট নির্বাচনে এলে ক্ষমতাসীন জোটের ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ বুদ্ধি কিন্তু উল্টে যেতে এক দিনও সময় লাগবে না। ভোট শুরু হয় ছয় মাস আগ থেকে। তারা কিন্তু মাঠ প্রশাসন নিজেদের মতো করে আগেই সাজিয়ে রেখেছে।

সামাজিক অবক্ষয় দেখলে বোঝা যায়, স্বাধীনতার সময় বাঙালির যে একনিষ্ঠতা ও দেশের জন্য ত্যাগ ছিল; সে অবস্থান থেকে বাঙালি অকল্পনীয় দূরে স্থান করে নিয়েছে। এগুলো আমাদের দেশ গড়ার ব্যর্থতা। আমরা মানুষ দিয়ে দেশ ভরে ফেলি কিন্তু মানবসম্পদের স্বল্পতায় ভুগি। আমাদের দেশের ভোগবাদী সমাজও আমার এসব কথার পাত্তা দেয় না। আপনাদের অনেকেই আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, রাজনীতি এদেশে এখন আর কোনো 'নীতি' নয়, নয় দেশসেবা, সমাজসেবা; সত্য হচ্ছে বর্তমান যুগে রাজনীতি একটা যৌথ প্রচেষ্টা, কৌশল, লাভজনক মিথ্যা বলা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবসা। কোনো দলই একথাটা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবে না। প্রতিদিনের পত্রিকা দেখলে আর চোখ-কান খোলা রেখে পথ চললে প্রমাণের অভাব হয় না। এদেশে নীতি-আদর্শের রাজনীতি করতে হলে, দেশ গড়ার ইচ্ছে থাকলে মানুষ মঙ্গল গ্রহ থেকে আনতে হবে, অথবা বসবাসরত মানুষদের আগে শিক্ষা ও পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে হতে হবে শিক্ষা সংগঠন। এর কোনো বিকল্প তো আমি দেখিনে। তাছাড়া ভোঁদড়কে মাছ পাহারা দিতে দিয়ে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাবে না, যাকে আমরা অরণ্যে রোদন বলি।

আমরা তো কোনো কলকারখানা, পুরোনো দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, কোনো সিস্টেম বারবার খারাপ হতে থাকলে, আশানুরূপভাবে কাজে লাগাতে না পারলে রিনোভেশন (নবরূপদান, পুনঃসংস্কার, নবীকরণ, পুনরায় নতুন) উপযুক্ত সমাধান বলে ভাবি। ভালো ও মনমতো ফল দেয়-না বলেই এগুলো করি। এদেশের যথাযোগ্য ব্যক্তিদের মাথায় কখনো 'পলিটিক্যাল রিনোভেশনের' কথা এলেই আমাকে খোঁজ দিতে ভুলবেন না। আমি এই শেষ বয়সেও হতে চাই অগ্রপথিক। এদেশে এর কোনো বিকল্প নেই। এদেশে নীতিহীন, প্রতারক, আত্মপ্রবঞ্চক, যুযোগসন্ধানীদের পোয়াবারো। যত অসুবিধা সাধারণ ছা-পোষা সাধারণ মানুষ নিয়ে। তারা অনন্যোপায়, নিম্ন আয়ের লোকজন। যাবার কোনো জায়গা নেই। ভাত জোটাতেই গলদঘর্ম– বিদেশে টাকা পাচার করবে কীভাবে? বেগমপাড়াই-বা গড়বে কীভাবে? রাজনৈতিক অনৈক্য, হানাহানি, মারামারি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, প্রতিটি পদে প্রতারণা এদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর কত! প্রকৃতিপ্রদত্ত কোনো গজব তো এদের নেই বললেই চলে। সবই রাজনীতিবিদের মগজ-সৃষ্ট। তাই বিধাতাকেও তো এরা দোষারোপ করতে পারে না। এদের চিহ্নিত প্রকাশ্য

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এদেশের রাজনীতিবিদ। বিলাপ করেও এ বিপদের মুক্তি নেই। শুধুই দীর্ঘশ্বাস। যত আপদ-বিপদ, জীবন-সংহারক উপাদান এই বিকৃত ও জীবনঘাতি রাজনীতি। এই কুলনাশা রাজনীতি এদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও যুব-সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে ছাড়ছে। লেখাপড়া শিঁকেয় উঠেছে। মাস্টার-মানুষ হওয়াতে এদেশের ছাত্রছাত্রী ও যুব-সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ধ্বংসলীলা নিজ চোখে দেখছি।

আশির দশকে সাগরের বিক্ষুব্ধ জলরাশি, প্রবল জলোচ্ছ্বাস-ঘর্ণিঝড় এদেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। রাতের অন্ধকারে গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, মানুষজনকে উড়িয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলেছিল, তার কোনো ইয়ত্তা ছিল না। অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা পরিবারের এক পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা মহিলা বাদে সে পরিবারের আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। পরদিন সকালে অগণিত মৃত গবাদিপশু ও লাশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে ভেসে কিনারে আসছে। সেই পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা সাগর-কূলে হাঁটু পানিতে নেমে হাঁটু গেঁড়ে বসে দু-হাত একবার পানিতে থাবড়াচ্ছে আর একবার নিজের বুক চাপড়াচ্ছে। বিলাপ ধ্বনীতে অনবরত বলে চলেছে, 'রাইক্ষসী দইরার হানি, তুই আঁরে আর কত কান্দাইবি।' এদেশের রাজনীতির কদাকার ও বিভৎস রূপ দেখলেই অতীতের সেই মহিলার গগনবিদারী বিলাপের ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কেউ বলতে পারেন, এ থেকে নিস্তারের উপায় কি?

(প্রকাশ: ২৮ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে...’

আমাদের গ্রাম এলাকার মানুষ প্রায়ই একটা কথা বলে– ‘শিখেছিলে কোথা থেকে? ঠেকেছিলাম যেখানে’। শুধু আউলিয়া-দরবেশরাই ঠেকে শেখে না, চোর-ডাকাত, মহান রাজনীতিকরাও ঠেকে শেখে। এ জন্যই মনে হয় এমন একটা প্রবাদ চালু আছে, ‘নেড়া একবারই বেলতলায় যায়’। সত্যিই কি নেড়া একবারই বেলতলায় যায়? আমি ভাবি, একবারই বেলতলায় গেলে চলে কীভাবে? হয়তো বারবারই বেলতলায় যায়, কিন্তু ভিন্নভাবে, সতর্কতার সাথে। হতে পারে কখনো মাথায় পাগড়ি পেঁচিয়ে, কখনো মাথায় কম্বল জড়িয়ে, কিংবা আরো বহুরূপে। ভিন্নভাবে বেলতলায় না গেলে বেল কুড়োবে কীভাবে? এ দুর্দিনে নেড়াকে নিয়ে এত চিন্তা না করাই ভালো; নেড়া তার অভিনব চিন্তা ও পদ্ধতি নিজের প্রয়োজনে নিজেই আবিষ্কার করে ফেলবে।

আমি ভাবছি, এদেশের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন একটা আপেক্ষিক কথা। একজনের দৃষ্টিতে যেটা অংশগ্রহণমূলক, অন্যের দৃষ্টিতে সেটা অংশগ্রহণমূলক নাও হতে পারে। বিষয়টা নিয়েও মহান রাজনীতিকদের তর্ক সামনে আসছে। ধৈর্য ধরে আমরা ‘রূপালি পর্দায়’ দেখার অপেক্ষায় থাকি। সমস্যাটা আদৌ এরকম নয়। এদেশের শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষই মুসলমান। শুনেছি, ‘মুসলমানের এক জবান’। সেটাই এদেশের কাল হতে চলেছে। কেউ বলছে, ‘বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে হবে। আমরা সংবিধানের অতন্দ্র প্রহরী।’ অন্য পক্ষ বলছে, ‘আমরা তো তোমাদের পর পর দুবার দেখলাম, তোমাদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তোমাদের কুটকৌশলের অভাব নেই। ভোট ব্যবস্থাপনায় তৃতীয় দু-চোখওয়ালা পক্ষকে আনো। নইলে যাব না, যাবই না।’ বুঝলাম, মুসলমানরা জবানের মূল্য বেশি দিচ্ছে। কিন্তু কার প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা বেশি, এটা নিয়েও তো ভাবা যেতে পারে। গতকাল ৩১ নভেম্বর টিআইবি-র নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, ‘হয়তো এ নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে... সত্যিকার অর্থে জনগণের ভোটের অধিকারের যে নির্বাচন, সেটি নিশ্চিত করা যাবে না। এ নির্বাচনের ওপর জনগণের আস্থা বা ভোটের আস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব হবে’। আমার মনে হয়, বিপরিতমুখী দুটো জোট যেহেতু প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না, এ বিষয়ে প্রয়োজনে যারা এই দেশের মালিক (জনগণ) বলে বলা হয়, তাদের কাছে যাওয়া যেত। ইচ্ছে হলে গণভোটের ব্যবস্থা করা যেত। ইচ্ছে যদি থাকে সমস্যা সমাধানের, তবে অনেক পথ খোলা থাকে। প্রয়োজন অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা এবং আত্ম-অহংবোধ একটু কমানো।

এখন এই ভোটে যাওয়া না-যাওয়ার পালা আপাতদৃষ্টিতে শেষ বলে মনে হচ্ছে। এখন 'জোর যার মুল্লুক তার' পর্যায়ে চলে গেছে। কেউ যেভাবেই হোক নির্বাচন করবেই। কেউবা নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা দেবেই। উভয়ে যার যার অবস্থানে বদ্ধপরিকর। কার কি মনের উদ্দেশ্য, আমরা সাধারণ দু- চোখওয়ালা মানুষ কিন্তু বুঝি। আমরা দল-বিচ্ছিন্ন বলে, আমাদের কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। আমরা (এদেশের নাগরিক হিসেবে) এদেশের মালিক– একথা কেউ মানেও না। মানলেও মুখে মানে, অন্তরে অস্বীকার করে। দীর্ঘ বছর ধরে দেখতে দেখতে এইসব 'এক-জবানি' মুসলমানদের কথার ওপর আমিও আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। এরা বারবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। এরা '৯১ সালে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট একটি গণতন্ত্র উত্তরণের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিল। এরা এ রূপরেখায় স্বাক্ষর করে 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, সার্বভৌম সংসদ গঠন, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিল।' আমার প্রশ্ন, সেসব অঙ্গীকারের কী দশা হলো? 'কেউ কথা রাখেনি।' জোটবদ্ধ স্বার্থবাদী মনের আকাশে অমাবশ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার চাঁদের সবটুকু আলো ক্রমশই ঢেকে দিয়েছে। জাতিগতভাবে বাঙালি খুব আত্মবিস্মৃত। আত্মজিজ্ঞাসা এদের খুব কম। কুটবুদ্ধি ও কুটকৌশলে বাঙালি চমৎকার! ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে! ইতিহাস তাই-ই বলে।

নেড়া যে একবারই বেলতলায় যায়, এর প্রমাণ পেলাম এবার নির্বাচনে ডামি ক্যান্ডিডেট ব্যবহারের কৌশলের কথা শুনে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে অটো-পাশ সার্টিফিকেটের কারণে অনেক শ্রুতিকটু কথা দুর্মুখেরা বলেছিল। এবার আগে থেকেই মহান রাজনীতিকরা সে বিষয়ে সজাগ। আমাদের তো শিক্ষার ও যথার্থতার দরকার নেই, পাঁচ বছরের জন্য অটো-পাশ সার্টিফিকেট দরকার। এটা নিয়ে যতটা বুদ্ধি খাটানো যায়– ততই মঙ্গল। দেশ নিয়ে তো আমাদের কোনো ভাবনা নেই, ভাবনা ক্ষমতায় থাকা না-থাকা নিয়ে। আমার একটা ভুল ধারণা এতদিন ছিল। গবেষণা করার সময় ইকোনোমেট্রিক্স পড়তে গিয়ে মাল্টিপল রিগ্রেশন এনালাইসিস-এ ডামি ভেরিয়েবলের ব্যবহার-কৌশল শিখতে হয়েছিল। এখন দেখছি এদেশের রাজনীতিকদের রাজনীতিতেও ডামি ক্যান্ডিডেটের বিষয় অবিদিত নয়। আমার এখন শিক্ষকতা পেশা ধরেই টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। রাজনীতিকরাও এখন ডামি ভেরিয়েবল কৌশল বোঝেন।

এদেশে রাজনীতি করতে গেলে এক চোখ ব্যবহার করতে হয়। যদিও প্রকৃতি আমাদের দুই চোখ দিয়েছে। দুই চোখ ব্যবহার করলেই আর রাজনৈতিক দলে ভেড়া যায় না। সে জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই রাজনীতি করার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত রাজনীতির পথ মাড়ানো আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সাধারণত শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে লিখতে চাই। রাজনীতির এই অপচর্চা, বিকৃতভাবনা ও কর্মকাণ্ডের চলতি বাজারে মনটা সবসময় বিষিয়ে থাকে। মন থেকে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন ভাবনা কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তাইতো ইদানীং চলতি ঘটনা নিয়ে কিছু কিছু উদ্ভট কথা লিখি। এতে অনেক এক-চোখা দলবাজ মুখে খিস্তি কেটে গালি দেন, আবার অন্য-চোখা কোনো দলবাজ বাহবা দেন। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু গালি খাওয়া বা বাহবা পাওয়া নয়। আমি দুচোখ ব্যবহার করে যা ভালো বুঝি, সেটাই লিখে প্রকাশ করি। কিছু একটা লিখে মনের ক্ষোভ প্রশমিত করি। বেয়াড়া মনের কারণে দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দলের দিকে সমর্থন চলে যায়। সে বিচারে রাজনীতি-বাতিকগ্রস্ত এই দেশে আমাকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থক বলা যায়। এজন্য কোনো নির্দিষ্ট দলে নাম লেখাতে পারিনে। এছাড়া এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের সাথে তাদের কৃতকর্মের কোনো মিলও তো খুঁজে পাইনে। তাই এতে কখনো আমাকে কেউ খাঁটি রাজাকার, কখনো কেউ ভারতের দালাল, কখনো কেউ আমেরিকার দালাল ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেন। আমি নীরবে সহ্য করি। একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগে, কেউ আমাকে বাংলাদেশের দালাল বলেন না।

এদেশের যে রাজনীতি, একটু ভেবে দেখুন তো, একে কি আদৌ রাজনীতি বলা যায়? গত লেখায় লিখেছিলাম, 'রাজনীতি এদেশে এখন আর কোনো 'নীতি' নয়, নয় দেশসেবা, সমাজসেবা; সত্য হচ্ছে বর্তমান যুগে রাজনীতি একটা যৌথ প্রচেষ্টা, কৌশল, লাভজনক মিথ্যা বলা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবসা।' আবার লিখেছিলাম, 'দেশ লুটপাট ও ক্ষমতা খাটানোর একমাত্র সুযোগ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পেশা ও রাজনৈতিক আনুগত্য। তাই নির্বাচনে জিততে এত আগ্রহ। পদপ্রার্থী হতে প্রতিটা ফরম পেতে গোপনে কত লেনদেন করতে হচ্ছে, আল্লাহ মালুম।' 'আল্লাহ মালুম'-ই বা হবেন কেন? আমরা তো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করিনে। সমাজে যা হয় চোখে দেখি, কানে আসে। সমাজে যারা এসব করছে, তারা কেউ আমার আত্মীয়, কেউবা বন্ধু-বান্ধব, কেউ অতি পরিচিতজন। সবকিছুই দেখছি, নিয়মিত শুনছি, কখনো আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে সামাজিক মাধ্যম থেকে ভিডিও প্রমাণযোগে সচোক্ষে দেখছি। রাজনীতিটা হয়ে গেছে অবৈধ টাকার খেলা। রাজনীতির এ বাজার গো-হাটকেও হার মানাচ্ছে। একথা কেউ

কেউ বলছেনও। গো-হাটে গরুর দাম বড় জোর লাখে গণনা করা হয়। মহামান্য রাজনীতিকদের পদপ্রার্থীতা ও আনুগত্য পণ্যের মতো কেনা-বেচা হতে শুনছি। কেনা-বেচার হাটে দরদাম ও লেনদেন আর হাজার-লাখে হচ্ছে না। কমপক্ষে কোটি– কত কোটি, কত'শ কোটি, কত হাজার কোটি এটাই জিজ্ঞাস্য। বেচা-কেনার এ হাটে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা– এ বাচ-বিচার করার বয়স নিশ্চয়ই আমার হয়েছে। চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন তো, এভাবে কি একটা দেশ চলতে পারে কি না? এভাবে দেশ চলা উচিত কি-না? আমরা ক্রমশ কোন দিকে ধেয়ে চলেছি? আমাদের ঠিকানা কোথায়? এদেশের সাধারণ মানুষের অপরাধটা কী? কেউ কেউ এটাকে 'রাজনীতির খেলা' বলে অভিহিত করছেন। কতিপয় জ্ঞানবিধ্বস্ত-দুর্নীতিবাজ, নির্লজ্জ-স্বার্থবাদী লুটেরা রাজনীতির ছায়াতলে পুরো দেশটাকে নানা অজুহাতে লুটে খাচ্ছে। আমরা সবাই তাদের হাতে বন্দী। তারা যা খুশি তা-ই করছে। দেশটাকে বানিয়েছে গুরুর সম্পত্তি। এ লজ্জা রাখবো কোথায়! সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত। নির্বাক, নিস্তব্ধ। বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার যেহেতু কোনো দল নেই, কৈফিয়ত চাওয়ারও কেউ নেই। রাষ্ট্রও আমাকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। রাষ্ট্র ও সরকার একাকার হয়ে গেছে। তাহলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? দেশে আর কী হলে আমাদের চোখ ফুটবে, চৈতন্যোদয় হবে! আমাদের অপকর্ম পুরো বিশ্বের কাছে আমাদের মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে, আমাদের ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, উগান্ডার মতো দেশের কাতারে ঠেলে দিচ্ছে। এদেশেরই কোনো একজন পদাসীন বিচারপতি দেশটাকে 'জাহান্নাম'-এর সাথে তুলনা করেছেন। এসব কি আমাদের জন্য শোভনীয়? স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কি আমরা স্বপ্নেও এদেশের এই করুণ পরিণতির কথা একবারও ভেবেছিলাম? এদেশের রক্ষকরা আজ ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূজনীয় দেবতা শিব 'তার বিশেষ রুদ্ররূপ ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা'য় আসীন হয়েছেন।

ক্ষমতাসীন দলের ভোটের ক্যান্ডিডেটের অভাব নেই। ক্যান্ডিডেট ব্যবস্থাপনায় তারা হিমশিম খাচ্ছে। এখানেও ২০১৪ এর অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য বলে মনে হচ্ছে। তারা সবাই মনে করছে, নোমিনেশন পেলেই পাশ। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা তো নেই। এমন সুযোগ কে ছাড়ে! টাকা থাকলেই রাজনীতির ব্যবসার এ সুযোগ ধরা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা দলীয় নোমিনেশন ও পাতানো নির্বাচন নিয়ে। এবারের নির্বাচন আনুগত্য ও আশির্বাদপ্রাপ্ত লোকদের সুখের 'বাসর ঘর' সাজানোর সাথে তুলনা করা যায়। 'মনে আশা আছে রে বন্ধু যাব তোমার ঘর, মনে আশা আছে রে ব-ন্ধু-উ।'

আমাদের গ্রামে এক গরিব দম্পতি বাস করতো। প্রায় সন্ধ্যা কিংবা রাতে ঘর থেকে মহিলার বেজায় চিৎকার করে কান্না শোনা যেত। স্বামী তাকে বেধড়ক পেটাতো। স্বামীকে কেউ কিছু বললে উত্তর দিত,'এটা আমার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তোমরা এতে নাক গলানোর কে?' একদিন দুই গ্রামের লোক জুটেপুটে এসে চোটপাট দেখানো লোকটাকে কিছুটা উত্তমমধ্যম দিলো। তারপর বললো,'আবার যদি তোমার বাড়ি থেকে কোনো কান্নার আওয়াজ শুনি, তো তোমাকে একঘরে করবো, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দেবো।' এটাকে বলে সামাজিক শাসন। এদেশে তো নাগরিকের অভাব নেই। মাশাআল্লাহ আঠারো কোটি। জাতিসংঘ তো বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষার্থে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করছে। আমাদের দেশ থেকেও অসংখ্য সেনা ও পুলিশ সদস্য সে বাহিনীতে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা কি অন্তত দু-কোটি নাগরিক স্বাক্ষর করে জাতিসংঘের কাছে একটা আবেদন করতে পারিনে– ব্যবসায়ী রাজনৈতিকব্যবস্থা পরিবর্তনে, রাজনৈতিক জবাবদিহি রক্ষায়, রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে, নির্বাচনকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সংস্থাটির মধ্যস্ততায় একটা নিরপেক্ষ গণভোট করে দিতে। প্রয়োজনে এদেশের সন্তান, যারা শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত আছেন, তারাই দেশের কল্যাণে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মোতায়েন থাকবেন। সংবিধান পরিবর্তনের কাজটা রাজনীতিকদের দিয়ে না করানোই ভালো। দেখবেন কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, দিনে দিনে সবার প্রতিই যেন আমি আস্থা হারিয়ে ফেলছি। বিষয়টা হচ্ছে, নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে একজন দরবেশকেও ভূত বলে সন্দেহ জাগে।

(প্রকাশ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

বিশ্বময় মানবতার বিপর্যয়

কবি নজরুল লিখেছিলেন, 'পাতাল ফেড়ে নামব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে/ বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।' কবির স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিশ্ব-জগৎ হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের টেকনোলজি, যোগাযোগব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের অবদান। আমরা গ্লোব্যাল ভিলেজে বসবাস করছি– বিশ্বায়নের এই যুগে একথা আমাদের মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে গিয়ে কোথায় কি হচ্ছে ঘটনাসহ ছবিও দেখতে পাচ্ছি। ঘটনার বর্ণনা ও ছবি দেখে কখনো চমকে উঠতে হয়। মানব সভ্যতার এ আবার কোন ভয়ঙ্কর ও অভিশপ্ত রূপ! আমরা আসলেই কি মানুষ? যদিও আমরা সবাই নিজেদের মানুষ বলে দাবি করি। বিদেশ-বিভূঁইয়ের একজনের হাসি অন্য দেশের কাউকে হাসায়, এক দেশের কারো কান্না অন্য দেশের কাউকে কাঁদায়।

আমি একজন শিক্ষক। আমার ক্লাসে দুজন ফিলিস্তিনি ছাত্র পড়ে, তাদের বাড়িঘর, মা-বাপ কেমন আছে জিজ্ঞেস করি। তাদের কষ্ট আমাকে কাঁদায়। কয়েকজন নাইজেরিয়ান ছাত্র আছে। তাদের সাথে নিয়মিত ভালো-মন্দ ভাব-বিনিময় করি। আছে ভুটানের ছাত্র। সবাইকে আপন ভাবতে শিখেছি। ছাত্র-ছাত্রীকে আপন করে ভাবাই শিক্ষকের স্বভাব ও নৈতিক দায়িত্ব। প্রতি বছর ক্লাসে কোনো না কোনো ভিনদেশি ছাত্র পাই। এদেশে মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রই বেশি আসে। অন্য দেশে সে-দেশ এবং ইউরোপের ছাত্রছাত্রী বেশি পেয়েছি। তাদের খোঁজ-খবর না নিতে পারলে মনটা ভালো থাকে না। তাদের কষ্ট আমার মনকে পীড়া দেয়। তাহলে প্রত্যেক দেশ পরিচালকরা বিশ্বের পুরো জনগোষ্ঠীকে আপন ভাবতে পারে না কেন? তারা কি মানববিদ্বেষী, মানবতাবিরোধী? বিশ্বের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে নিজের দেশের জনগোষ্ঠীর মতো আপন ভাবতে শিখলে অসুবিধা কোথায়? বিশ্ব নিরাপদ থাকবে, কি বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা সমূলে ধ্বংস হবে– সবই তো তাদের হাতে। তারা ইচ্ছে করলে কোনো না কোনো মহাদেশ এক নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারে, বিরাণ প্রান্তরেও পরিণত করতে পারে; যদিও সব দেশের সক্ষমতা সমান নয়।

কয়েকদিন আগে আমার এক সহকর্মীর মনটা খুব খারাপ দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মন খারাপের কারণ কী? তিনি বললেন, তাদের ঘরে একটা পোষা বিড়াল ছিল। বিড়ালটা ছিল তার ছোট মেয়ের খুব প্রিয়। রাতে বিড়ালটা মারা গেছে। মেয়েটা সকালে উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। তার মনটাও সেজন্য খারাপ। একদিকে বিড়ালের মৃত্যু, অন্যদিকে মেয়েটার কান্নাকাটি। আমরা মানুষ। এ সবকিছুই আমাদের মানবতাবোধ থেকে এসেছে, যাকে আমরা মনুষ্যত্ববোধও

বলি। শুধু মানুষ কেন, যে-কোনো প্রাণীর প্রতিও আমাদের মমত্ববোধ আছে, যেমন প্রতিটা পশুর স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি আছে। এসব আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। শিল্পী গান গেয়েছেন, 'মানুষ মানুষের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না, ও বন্ধু...'। এ সৃষ্ট চরাচরে বাঁচতে গেলে, চলতে গেলে সৃষ্টির সবকিছুকে আপন ডোরে বেঁধে ফেলতে হয়। অন্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নইলে নিজে বাঁচা যায় না। সবকিছু মিলিয়েই আমাদের এ বিশ্ব সংসার। এ মমত্ববোধে আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এ মনুষ্যত্ববোধ আমাদের শাশ্বত ও অন্তর্নিহিত। মনুষ্যত্ববোধ আমাদের আছে বলেই আমাদের মানুষ বলা হয়। মনুষ্যত্ববোধ না থাকলে কি আমরা মানুষ নাম ধারণ করতে পারতাম? প্রত্যেক মানুষ– রাজা-বাদশা, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এমনকি একজন পথের ভিখারিরও মানবতাবোধ আছে বলে আমরা বিবেচনা করি। মানবতাবোধ না থাকলে কীভাবে মানুষ হয়! বিশ্বের প্রত্যেক মানুষেরই হাসি-কান্নার ধরন এক, ব্যথা- বেদনা, একই অভিব্যক্তি।

মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাতে শিখেছে, সেদিন থেকে সভ্যতার সূত্রপাত। আমরা গর্ব করে বলি, মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। মানুষের সীমাহীন প্রচেষ্টা, মানবতাবোধ ও বিজ্ঞান আমাদের সভ্যতা দিয়েছে। কোনো কোনো বিষয় নিয়ে ভাবলে আমার সন্দেহ হয়, আসলেই কি মানব-সমাজ সভ্যতা অর্জন করেছে? মানুষ সভ্যই যদি হবে, তবে কেন এই আদিম নৃশংসতা, পশুসুলভ হিংস্রতা, আত্ম-অহংবোধ, উদগ্র জিঘাংসা, এত নির্লজ্জ একচোখা স্বার্থপরতা, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, ধর্মীয়-রাজনৈতিক বৈষম্য, মারণাস্ত্রের ব্যবসা? হিংস্রতা প্রকাশের জন্য পশুর নখর আছে, মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের নামে কৃত্রিম নখর তৈরি করে নিয়েছে। মানুষের মধ্যে যখন মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তখন কৃত্রিম নখর ব্যবহার করে। সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের দুর্দশার কারণ হয়। নারি-শিশুসহ জনপদের পর জনপদ ধ্বংসলীলা ঘটায়। কোনো কোনো মানুষ একাজ করে আত্মতৃপ্তি পায়, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে; এতে একদল অসহায় মানুষ পৃথিবীর এই ক্ষণিক লীলাভূমি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পিছনে তাকানো মানবজাতির স্বভাব নয়। আমরা বিবেকের দংশন ও অনুশোচনা ভুলে দ্রুত সামনে ধেয়ে চলি। মনুষ্যত্বের অভিশাপ পিছনে পড়ে থাকে। এটা কি মানবসভ্যতার জন্য গ্লানিকর ও কলঙ্কজনক নয়? যে যা-ই করুক ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। কত ক্ষমতাধর দিগ্বিজয়ী, কৌশলী তলোয়ারচালক, পারমাণবিক বোমাবর্ষণকারী– কেউ-ই এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী আসন গাড়তে পারেনি। কী জানি কীসের টানে আমরা পৃথিবী ছেড়ে নির্দিষ্ট সময় শেষে অনন্তের উদ্দেশ্যে বিদায় নিই। কোথায় যায় তার খোঁজ

কেউ কোনোদিন রাখে না। শেকসপিয়র তার টেমপেস্ট কাব্যে লিখেছিলেন, 'The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,/ The solemn temples, the great globe itself,/Yea, all which it inherit, shall dissolve; And like this insubstantial pageant faded,/ Leave not a rack behind.' কেবল পিছে পড়ে থাকে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম। তবুও আমাদের স্বজাতি নিধনের এত দাম্ভিকতা কেন?

মানবতার এ বিপর্যয় বিশ্বময়। দিন যত সামনে এগোচ্ছে, সভ্যতার অতিকথন তত ম্লান-বিশীর্ণ হয়ে অতীতের হারানো পথে মুখ লুকাচ্ছে। এসবই বিশ্ব-বাস্তবতা। ১৯৪৮ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলে মধ্যপ্রাচ্যে একটা ইসরাইল রাষ্ট্র নামের বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল যা ফিলিস্তিন সমস্যা নামে খ্যাত। আরব জনগোষ্ঠীর বাপ-দাদার ভিটে থেকে তাদের উচ্ছেদ করে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম। এই বিষবৃক্ষ সেই থেকে ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিষ উদগীরণ করে চলেছে এবং বিশ্বময় বহু নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ব্রিটিশ-আমেরিকাসহ মিত্রদের একচোখা মানবতাবিবর্জিত নীতির কারণে মানুষে মানুষে বিভেদ বেড়েছে। মানবতার ভিত ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগ আলীর ঘোড়া'। ইসরাইল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও ক্রমেই বসতি গড়ে দখলে নিচ্ছে। তারা ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ উচ্ছেদ চায়। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই বলছে, পাশাপাশি দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে দিলেই বিবাদটা আপাতত মিমাংসা হয়ে যায়। না, তা হওয়া চলবে না। সাথে বিশ্ব-মোড়লদের একচোখা সমর্থন আছে না! তারা বিষয়টাকে ধর্মীয়-রাজনৈতিক (theo-political) বিবাদ হিসেবে বিবেচনা করছে। তাই বিষয়টাকে নানা অজুহাতে ঝুলিয়ে রাখতেই হবে। সাথে আছে রূপকার্থে ব্যবহৃত এ যুগের দজ্জালসদৃশ আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রবলয়। এদের দ্বৈতরূপী ভূমিকা বিশ্বময় সকল অশান্তির মূল কারণ। মানবতার ধ্বজাধারী মানবসভ্যতা-বিনাশী অপশক্তি। ইতিহাস অন্তত তা-ই বলে। বিশ্ব-মোড়লদের ইতরপনা কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনা এর জন্য একমাত্র দায়ী।

পূঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোধা-শক্তি রাশিয়া ও চীন মানবতা-বিরোধী আরেক অপশক্তি। সমাজতন্ত্রের নামাবলীতে এ বিশ্বে কত কোটি অসহায় মানুষের যে হত্যাযজ্ঞ ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ভ্লাদিমির পুতিন কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারছেন না। ইতিহাসের অনেক ঘটনাপ্রবাহ গড়িয়ে ২০২২ সালে পুতিন ইউক্রেনিয়ার সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন, একাংশ দখলও করে নেন। সেখানে মানবতার বিপর্যয় অবিরাম চলছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি ও বিভিন্ন

রকমের বোমা-মিসাইল সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সাধারণ জীবনযাপনকে দুর্বিসহ ও কখনো নিঃশেষ করে দিচ্ছে। মানুষ হয়ে মনবজাতির ধ্বংসলীলা মানসিক বিকৃতির শামিল। চীন উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসম্প্রদায় নিশ্চুপ। মানবতা বিপর্যস্ত, সততা ও আত্মজিজ্ঞাসা অপসৃত।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের ঘোড়ারোগে ধরেছে। বিজেপি নামক মৌলবাদী সরকারের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় ভারত উপমহাদেশব্যাপী রামরাজত্ব কায়েম করতে চায়– নাম দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র। তাদের তৈরিকৃত মনগড়া মানচিত্র থেকে পার্শ্ববর্তী দেশের নামনিশানা মুছে ফেলতে চায়। ফলে আরেক মানবিক বিপর্যয় সামনের দিকে ধেয়ে আসছে। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের দোহায় দিয়ে সেখানে শত শত বছর ধরে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন অবিরাম চলছে। চলছে নির্বিচার গণহত্যা। মুসলমানরা নিজ দেশে পরদেশী, অথচ হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে লিখিতভাবে দাবি করে, বাস্তবে 'ধর্মঅহিংস' রাষ্ট্রের ঠিকানা বিলীনের পথে। বাস্তবতা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের জনগণের সাথেই ভারত নামের রাষ্ট্রের সদ্ভাব-সুসম্পর্ক নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী আরেকটা দেশের নাম মিয়ানমার। সেখানেও জাতিগত সংঘাত। মানবিকতা বিপর্যস্ত ও পরাজিত। শত শত বছর ধরে বসবাসকারী নাগরিক রহিঙ্গারা আজ সেদেশে বাস্তুহারা, সামরিক জান্তার অত্যাচার ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের কারণে ঘর-বাড়ি ফেলে আজ আমাদের দেশে আশ্রিত হিসেবে তাঁবুতে বসবাসরত, মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। তাদের ভবিষ্যৎ বেঁচে থাকার স্বপ্ন দুরাশার এক-ফালি চাঁদের মতো অসীম আকাশের কোনো এক দিগন্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! এখানেও মানবজাতি ও মানবতার পরাজয়। লালন গেয়েছিলেন, 'কেউ মালা কেউ তসবিহ গলে, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে, যাওয়ার কিংবা আসার কালে জাতের চিহ্ন রয় কারে...'।

মানবতার পরাজয়ের ইতিহাস কয়টা বলবো! মানবজাতির ইতিহাসই অনেকাংশে মানবতার পরাজয়ের ইতিহাস। মানবজাতির পরাজয় মানবতা-সংহারক বিকৃত চিন্তা-চেতনার মধ্যে নিহিত। বিশ্বে এমন কোনো রাষ্ট্রের নাম আমার জানা নেই, যেখানে মাত্র একটি ধর্মের লোক বসবাস করে। তাহলে কেন ধর্মীয় ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন, সবলে উচ্ছেদ? কেন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভিন্ন চোখ দিয়ে ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে দেখে? এ কেমন মানবতা ও মানবতাবোধ! রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার। রাষ্ট্রনায়কদের মনের কাছেও তাই-ই হওয়া উচিত। অথচ তাদের অনেকেরই ক্ষমতার দাপট, 'মুখে মধু পেটে বিষ'। ভাবতে পারি না,

সভ্যতার নামে মানবজাতির এহেন অসভ্যের গ্লানি কেন পেয়ে বসবে। দেখা-চোখে এ ধরাপৃষ্ঠে মানবজাতির পরিণতি আরো অনেক করুণ, ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে হয়। গলদটা কোথায়? সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ও মানবজাতিকে সুস্থ ও শান্তির সাথে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটাকে আরো পরিবর্তনশীল ও মানবসভ্যতার উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ নামের যে বিশ্ব সংস্থা আমরা তৈরি করে রেখেছি, সেটাও বিশ্বব্যবস্থায় তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। চলতে হচ্ছে কোনো কোনো বিশ্ব-মোড়লদের অঙ্গুলিহেলনে। এটা দুঃখজনক। আমরা জাতিসংঘের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও ব্যবস্থাপনা শুধু পাঁচ মোড়লের ওপর নির্ভর না করে ঢেলে সাজাতে পারি। বিশ্বের মানবতাবাদী শক্তিকে সরব হয়ে উঠতে হবে। মানবতাবাদী আন্দোলন হতে হবে বিশ্বব্যাপী। তাহলেই বিশ্বে অনেকটা শান্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বস্তি চলে আসবে। এটা নিয়ে আমরা ভাবি না। ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রদ করতে হবে। প্রতিটা স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে সব অধিকার ভোগ করবে। বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটা সঙ্কট সমাধানে সব সদস্যের সরাসরি ভোটদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধু পাঁচ ভেটো প্রদানকারি দেশের নেতৃত্ব বদল করে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির ভিত্তিতে সব সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। যে কোনো দেশ জাতিসংঘের নির্দেশনা ও সমাধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জন্য এ বিশ্বব্যবস্থা ও পরিচালনার অযোগ্য এমন কিছুই নেই, সবই সম্ভব। এসব কাজে শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নির্ভর না করে আরো যথাযোগ্য অসংখ্য মানবপ্রেমী পেশাদারের ওপর জাতিসংঘের বিদ্যমান সিস্টেম ও নিয়মাবলি বদল এবং সিস্টেম ও নিয়মাবলি পুনর্নির্মিত, পুনর্যাত্রা ও পুনর্গঠিত করে ঢেলে সাজানো যায়। এতে সমষ্টিগতভাবে মানবজাতি যে দারুণভাবে উপকৃত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সব আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিসংবাদ পেছনে ফেলে এ বিশ্বকে বসবাসের উপযুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এর কোনো বিকল্প অন্তত আমি দেখিনে।

(১৫ মে ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে...’

নিন্দুকেরা প্রায়ই আমাকে একহাত দেখিয়ে ছাড়েন। বলেন, আমি সুযোগ পেলেই না-কি রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে দু-কলম ঠুকে বসি। কথাটা অমূলক নয়, এটা আমি জানি। এ ছাড়া যে আমার আর কোনো গত্যন্তর নেই, তা বোঝাবো কেমনে। কেন জানি সুদীর্ঘ বছর পেরিয়ে বেলাশেষে এসে এ ধারণা আমার মাথায় ঢুকেছে যে, একটা দেশের উন্নতি ও অবনতির মূলে থাকেন রাজনীতিকরা। এখানে যদি দুর্নীতিবাজ, ভাঁওতাবাজ, ফন্দিবাজ ব্যবসায়ী, ফেরেববাজ এসে আস্তানা গাড়ে, তাহলে দেশটার বিচ্ছিরি-বিতিকিচ্ছি দশা হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয় কি? এই রাজনীতিকদের কারণেই দেশটা রসাতলে যেতে বসেছে। কারণ তারাই তো একজোট হয়ে দেশ পরিচালনা করেন। সে বিবেচনায় এদেশের সব অনিষ্ঠের মূল এই বিকৃত রাজনীতি, রাজনীতির নামে দেশ শোষণ-লুটপাট, তা সে যে দলেরই হোক না কেন। সেই স্বাধীনতার পর থেকে কখনো দলগতভাবে, আবার কখনো জোটবদ্ধভাবে অধিকাংশ দলই ক্ষমতায় থেকেছে। তাদের কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি, এখনো দেখছি। দেখতে দেখতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, ‘বিকৃত রাজনীতি’ ও মতলববাজি এদেশের মূল রোগ। এই চাঁচাছোলা কথা যাদের বিরুদ্ধেই যাক না কেন, এ রোগের চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত দেশ গড়ে তোলা অসম্ভব।

আসলে রাজনীতি একটা বিমূর্ত ধারণা। এটা আবার খারাপ হয় কী করে? খারাপের দায়টা এসে রাজনীতিকদের ওপরেই পড়ে। রাজনীতিকরা চিন্তাধারায় উন্নত হলেই দেশের উন্নতি হতে বাধ্য। রাজনীতিকদের চরিত্র (প্রকৃতি, স্বভাব) খারাপ, তাদের উদ্দেশ্য খারাপ, তাই রাজনীতি খারাপ। মাঝখান থেকে ভুগতে হচ্ছে দেশকে, দেশের সাধারণ মানুষকে। আমার মতো এক-পা কবরে থাকা মানুষের তো আশায় আশায় জীবনটা পার হয়ে গেলো। এখন বেলাশেষের ভাবনা ভাবতে গিয়ে হতাশা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভাষাও অনেক কর্কশ হয়ে গেছে। এর সাথে হিউম্যান সাইকোলজি জড়িত। এ নিয়ে অনেকেই আমার সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আমাকে হতাশাবাদী বলেন। কিন্তু আমি আর কতদিন আশায় আশায় দিন পার করবো? তাদের আমি মনে মনে দলকানা বা বিবেকবোধহীন বলি, যদিও কথাটা সামনে বলিনে। মানুষের মনুষ্যত্ব ও কর্মকে বিবেচনা না করে শুধুমাত্র অন্ধ দলীয়-সমর্থক হওয়া কোনো রাজনীতি-সচেতন শিক্ষিত লোকের শোভা পায় না। এমনটি হলে তাকে শিক্ষিতও বলা যায় না। যে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলতে জানে না, তাকে শিক্ষিতই-বা বলি কী করে? কেউ বলেন, অমুক দল খারাপ, তাই দেশের উন্নতি হচ্ছে না, অন্য দল

ক্ষমতায় এলে ঠিকই ভালো কিছু হতো। এ ধরনের কথায় আমি আস্থা রাখতে পারিনে, বিশ্বাসও করিনে। আমি দেখি সব দলের রাজনীতির মাথা থেকে পা পর্যন্ত পচে গেছে, সেখান থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। যে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন প্রয়োগের দ্বৈত-মান ও জিঘাংসার আগুন রাজনীতিকরা এদেশের মানুষের মনে জ্বেলে দিয়েছেন ও এখনো দিচ্ছেন এর পরিণতি আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। এই পচনের রেশ সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে ছেড়েছে। রবি ঠাকুরের কথায়, 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, সে আগুন ছড়িয়ে গেল, সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে-এ, তুমি যে...'। তা দেশ ভালো চলবে কী করে? একটা ভালো আলুকে পচানো সম্ভব; পচা আলুকে পূর্বাবস্থায় আনা কি সম্ভব? আলুটাকে মাটিচাপা দিতেই হবে। নইলে গন্ধ ছড়াবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পচা আলুর যে কী দুর্গন্ধ, কখনো ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছেন কি? যতই আতর-থেরাপি প্রয়োগ করুন, গন্ধ দূর হবে না। আমি প্রকৃতির নিয়ম থেকে কথাগুলো বলছি। এ নিয়ে মাথায় আরো অনেক খারাপ শব্দ চলে আসে। নিজেকে সংযত করি। কথা বলে মনের তিয়াস মেটে না। কারণ এই পচা রাজনীতি এদেশে আমার মতো কোটি কোটি মানুষের নিষ্কলুষ জীবনের ভবিষ্যৎ, লালিত স্বপ্ন ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই আমি এসব কথা বলতে বাধ্য। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অনেক কথার উত্তর দিতে পারি না। মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে (আমার ছাত্র-ছাত্রীদের) কোন নরকে রেখে মরতে চলেছি, সে-কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। আমার এসব ক্ষোভের কথা ছাপাতে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের অনেক ভাবতে হয় জানি। কিন্তু এসব কথা না লিখতে পারলে আমি যে অসহায় হয়ে উঠি, রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটাতে হয়। আমরা কি দলবাজি করবো, না উচিত কথা বলবো? এর বিকল্প আমি আর তো কিছু খুঁজে পাই না। যদিও কথাগুলো কেউ আমলে না নিলে এ পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো পরের দিন ঝাল-মুড়ি বিক্রির দোকানে ব্যবহৃত হয়।

রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারতাম। তা সম্ভব নয়। যা দেখছি, সুবিধা না দিতে পারলে ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে এদেশে কেউ আমার রাজনৈতিক দলে যোগ দেবে বলে মনে হয় না। একথা ভাবলে বড় বড় নেতারা সাগরেদদের সুবিধা দিতে বাধ্য হচ্ছেন কেন, তা বুঝে আসে। মূলত জনগোষ্ঠী জনসম্পদ না হয়ে জন-আপদে পরিণত হয়ে গেছে। আমরাই তাদের জন-আপদ বানিয়েছি। একথা অনেকবার যুক্তি দিয়ে এ কলামে লিখেছিও। একথা বুঝতে পেরেই হয়তো কেউ নতুন দল গঠন ঘোষণা করার পরেও মনোভাব প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হাঁড়ি চাটতে না দিলে দলে লোক পাওয়া দুষ্কর। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত,

নৈতিকতাবোধ-সম্পন্ন জন-মানুষের সংখ্যা এদেশে অতি অল্প। তারা কোটরের প্যাঁচার মতো অতি সন্তর্পণে দিনযাপন করছেন; বিড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে চলছেন। দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতাধরদের সীমাহীন দাপটে তারা দেশের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এর মধ্যে আবার উদয়াস্ত গতর খেটে জীবনযাপন করে, কারো সাতে-পাঁচে থাকতে চায় না এমন নিরীহ জনগোষ্ঠী রাজনীতিতে আসবে এমনটিও ভাবা উচিৎ নয়। এদের 'অন্নচিন্তা চমৎকার'। তাদের সবসময় গণনা থেকে বাদ রাখি। এরা নিজে ভোগে, অন্যকে ভোগায় না। একমাত্র সুশিক্ষা এদেশকে রক্ষা করতে পারে। শিক্ষার মানেরও শীর্ণদশা, ক্ষীয়মান; তা নিয়েও রাজনীতি ও ব্যবসা। এ নিয়েও দেশী-বিদেশী চক্রান্ত। মাথা ন্যাড়া হলে মাথা চাটা সহজ হয়।

বর্তমানে কয়েকটা সংবাদ 'টক অব দ্য কান্ট্রি' বলা যায়। এর মধ্যে দুই-তিনটাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে এখানে টেনে আনি। আগেই এমপি আনার 'যার জনসমর্থন দেখে সরকার তিনবার এমপি মনোনয়ন দিয়েছে' সে কথায় আসি। তার হত্যা নিঃসন্দেহে মর্মন্তুদ, বীভৎস ও করুণ। পাষাণ হৃদয়ও এমন ঘটনা শুনলে ব্যথিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকা ও সামাজিক মিডিয়া তাকে নিয়ে অনেক রকম কথা লিখে চলেছে। অনেক পত্রিকায় স্বর্ণ-চোরাচালানি, মাদক চোরাকারবারি, নারী পাচারকারী, কালোবাজারি, রাতচরা-বাহিনীর গডফাদার ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে খবর বেরোচ্ছে। তার নামে এর আগে অনেক খারাপ মামলাও নাকি ছিল। এমনভাবে কথা বলা হচ্ছে যে, না বিশ্বাস করে পারা যাচ্ছে না। যদিও চলতি সমাজব্যবস্থায় নিজের কান ও চোখ ছাড়া কোনো কিছুকে বিশ্বাস করা কঠিন। এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, তিনি এত খারাপ লোকই যদি হবেন, কেন তিনি পর পর তিনবার এমপি নির্বাচিত হলেন? কারা তাকে মনোনয়ন দিলো? তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতা ছিলেন না জানি। এর আগে কোনোদিন তার নামও শুনিনি। মনোনয়ন দেওয়ার আগে কি সরকারের কোনো বিশ্বস্ত বিভাগের মাধ্যমে খবরও নেওয়া হয়নি? সেখানকার রিপোর্ট কি বলে? একজন মরার পরই সব তথ্য প্রকাশ পায়, আগে তথ্য আসে না কেন? এলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কেন? না-কি রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের দাগি আসামিদেরই বেছে বেছে মনোনয়ন দেয়? না-কি পেশিশক্তিধারী দাগি আসামি ছাড়া রাজনীতিতে ইদানীং ভালো কোনো লোক নাম লেখাতে চাচ্ছেন না? না-কি দাগি লোক ছাড়া বর্তমান রাজনীতিতে সুবিধা করা যায় না? এ ক্ষেত্রে আমি শুধু ক্ষমতাসীন দলকেই বলছি না।

এমপি আনার না-কি প্রথমে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে বাতাস বুঝে বিএনপিতে যোগ দেন। এলাকার জনপ্রতিনিধিও ছিলেন। রাজনীতির অঙ্গনে মাশাআল্লাহ পদের অভাব নেই। পরে অনুকূল বাতাসে আওয়ামী রাজনীতিতে যোগ দেন, জীবনে সর্বোচ্চ সার্থকতা আসে। তাই আমি তো শুধু একটা দলকেই এজন্য দায়ী করতে পারি না। এটাই কি এদেশের রাজনীতির প্রকৃত অবস্থা নয়? কালবোশেখি মেঘ ও ঝড়ের কাছে কি চাঁদের স্নিগ্ধ আলো-ঝলমলে রাত আশা করা যায়? দুর্মুখেরা বলেন, বর্তমান রাজনীতিতে না-কি দুর্নীতিবাজ, মতলববাজ লোক বাছতে গেলে রাজনীতির কম্বল উজাড় হয়ে যাবে। কথাটা দেখাদৃষ্টে সত্য। আরো সত্য আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে দেখছি। খুলনা অঞ্চল থেকে রাজশাহীর বাগমারা পর্যন্ত বর্ডার-বেল্ট যত রাতচরা বাহিনীর বিচরণক্ষেত্র। কত গডফাদার ও তার সাগরেদ যে জন্মালো ও কালের আবর্তে বিলীন হয়ে গেল, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। সবই এ দু-চোখ দিয়ে দেখলাম। একটা নিদেন বুঝ এ থেকে জন্মেছে যে, অন্ধগলিতে (যে গলির একমুখ বন্ধ) ঢোকা সহজ, সেখান থেকে ফেরার পথ বন্ধ। জীবন থেকে নেওয়া আরেকটা অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে, সাপের খেলোয়াড় ও ওঝা যত কৌশলীই হোক, সাপের ছোবলে তার মরণ। এ অভিজ্ঞতা পুরো রাজনীতির ক্ষেত্রেও কার্যকর। কথা হচ্ছে, সন্ত্রাসী, নীতিহীন, অতি-কৌশলী খেলোয়াড়রা এদেশের রাজনীতিকে গ্রাস করবে কেন? রাজনীতির মাঠই-বা তাদের অভয়ারণ্য হবে কেন?

কলুষিত রাজনীতির এই অভয়ারণ্য তো দেশের প্রতিটা পেশা, পেশাদারিত্ব, সরকারের প্রতিটা বিভাগ ও সেক্টরকে ধ্বংস করে দিয়েছে ও এখনো দিচ্ছে। ওদের এখন 'ফুলের বনে যার পাশে যায় তাকেই লাগে ভালো' অবস্থা। আমার বিবেক তো বলতে পারে না– অমুকের রাজনীতি ভালো, তমুকের রাজনীতি খারাপ। আমি তো দেখি, এদেশে 'সব শেয়ালেরই এক রা'। পরশ পাথরের সংস্পর্শে যে কোনো পদার্থ সোনায় পরিণত হয়। এদেশের রাজনীতির স্পর্শে প্রতিটা পেশা ও সেক্টরে কর্মরত মানুষ দুর্নীতিবাজ, ঘুসখোর, হাঁড়িচাটায় পরিণত হয়েছে। যারা নিজেদের এখনো কলুষমুক্ত রাখতে পেরেছেন তারাই দেশের সম্পদ, তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে; যদিও সংখ্যায় তারা অতি নগণ্য। পুলিশ বাহিনী ও দেশরক্ষা বাহিনীর বড় কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও শত শত কোটি টাকা বানানো নিয়ে যে প্রচার সংবাদপত্রে পড়ছি, এগুলো তো বলা-কথার প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ। প্রতিদিনের পত্রিকা এমনই হাজার হাজার অপকর্ম, অপ-কর্মী, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, টাকাপাচার ও দেশ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে সামনে হাজির হচ্ছে। কোনটা রেখে

কোনটা পড়বো! কোনো কোনো রাজনীতিক সবকিছুকে তুড়ি মেরে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেটা সবাই বোঝে। কিন্তু এই যে হাজার হাজার পতনমুখী ঘটনা, এত কিছুকে ধামাচাপা দিতে গেলে অত বড় ধামা ওরা পাবেটা কোথায়? সেজন্য আমরা অগত্যা 'নিম্নস্বরে মুখচাপা' এবং 'পত্রিকায় কলম-চাপা' দিয়ে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সে চেষ্টাইবা কতটুকু সার্থক হবে!

স্বাধীনতার ঘোষণায় যে উদ্দেশ্যের কথা আমরা প্রচার করেছিলাম, সে উদ্দেশ্য কি এখনোও বলবত আছে? থাকলে সে উদ্দেশ্য সাধনের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করা জরুরি। কীভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে তার বিস্তৃত রূপরেখা আমাদের জানা প্রয়োজন। রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা এদেশে প্রতিষ্ঠা করা অতি প্রয়োজনীয়। সে-সাথে তাদের 'কোড অব এথিক্স'ও নির্ধারণ করা সময়ের দাবি। নইলে আমার ছোটবেলায় শোনা জারিগানের অবস্থা এদেশে হতে বাধ্য। 'গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা-আ, ওরে এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা, আহা-আ-আ-আ'।

(৬ জুন ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

নীতি–দুর্নীতি ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ

(প্রকাশিত শিরোনাম: কোবাদ আলীর এমন দশাই হয়েছিল)

আমি সমাজবিজ্ঞানী নই, সমাজদর্শক; তাই সমাজকে দু-চোখ ভরে আমার মতো করে দেখতে চাই। এবারের বাজেট নিয়েও একটু ভিন্ন ধাঁচের আলোচনায় যেতে চাই। প্রথমে একটা গল্প সংক্ষেপে বলি। আমাদের পাশের গ্রামের এক পরিবারের অতীত কথা। পরিবারপ্রধানের নাম কোবাদ আলী মণ্ডল। মাঠে বেশ ক'বিঘা জমি। বিয়ের পরে পর পর চার ছেলের গর্বিত পিতা। ছেলেদের শিক্ষার কোনো নামগন্ধ নেই। তারা যত বড় হতে লাগলো, মাঠে লাঙলের সংখ্যা তত বাড়তে লাগলো। গ্রামের এক মাতব্বর কোবাদের উন্নতি দেখে সুপরামর্শ দিল– 'কোবাদ, তুমি আরেকটা বিয়ে কর, তোমার একসঙ্গে চারটা লাঙল মাঠে চলে, তোমার আরও লোক দরকার'। কোবাদ গোপনে তা-ই করল। বছরখানেক পর সুযোগ মত দ্বিতীয় বউকে ঘরে তুলে নিল। দুই বউ মিলে কোবাদের সাত ছেলে তিন মেয়ে। সোনার সংসারে কোবাদের পা আর মাটিতে পড়ে না। দুই বউয়ের ছেলেমেয়েদের দুর্মতিতে ধরলো, কারো সঙ্গে কারও বনিবনা নেই। বড় ছেলে ক্ষেতে ধান বোনার জন্য দুই ধামা বীজ বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। জমিতে এক ধামা বোনা হয়। আরেক ধামা বীজ পথ থেকে উধাও। বীজ বিক্রির টাকা বড় ছেলের নামে জমা হয় মাতব্বরের কাছে। ফসলের চারা গজালে বোঝা যায় ধানগাছ হয়েছে ফাঁকা ফাঁকা। ছেলে পাঁড়ায় মুখচাপা দেয় 'ধানের বীজ সবটা গজায়নি'। কী আর করা! গ্রামের দুই মাইল দূরে সপ্তায় দু-দিন হাট বসে। দ্বিতীয় বৌয়ের ছেলেটা হাটে বাজার করতে যায়। ধান বেচে বাজার। দুই মন ধান বাজারে নিয়ে গেলে মেপে হয় তিন মন। এক মন ধানের টাকার হিসেব কেউ জানে না। বাজার-খরচ বেশি বেশি দেখিয়ে সংসার ফাঁকির টাকা আরেক মাতব্বরের কাছে জমা হয়। ক্ষেতের ফসল খামার থেকে বিক্রি হয়ে ছেলেদের পকেট ভারী হতে লাগলো। সংসারে উড়নচণ্ডে দশা। দিনে দিনে মাঠে লাঙলের সংখ্যা কমতে লাগলো। আয়ে ঘাটতি, ব্যয় অতিরিক্ত। মাথাভারী সংসার। সংসারে যে যেখানে পারে নিজের পকেট ভারী করে। বড় মেয়ে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে দুই মেয়ে নিয়ে বাপের সংসারে ফিরে এসেছে। সংসারে প্রতি ওক্তে পাত পড়ে ১৮টি। কোবাদ আলী ক্রমেই ঋণে জর্জরিত হতে লাগলেন। মাঠের জমিগুলো পালাক্রমে মাতব্বর দুজনের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। কোবাদ আলী রোগাক্রান্ত হয়ে কিছুদিন বিছানায় থেকে মারা গেলেন। এক বছরের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ প্রকাশ্য রূপ নিল। মাতব্বররা গিয়ে সবাইকে পৃথক করে দিল। প্রত্যেকের কাঁচি-মাথাল ও

দিন-মজুরি সম্বল। কারও দিন থেমে নেই, প্রকৃতির নিয়ম মতো সামনে এগিয়ে চলেছে।

এবারের বাজেট নিয়ে অনেক কথাই পড়লাম ও জানলাম। অত উপাদানের ব্যাখ্যা এত ছোট্ট পরিসরে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামান্য একটা অংশ জুড়ে বাজেট। আমি জানি, বাজেট একটা দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার স্বল্পমেয়াদী অংশ। এক বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিক-নির্দেশনা থাকে। এদেশের বাজেটে দিক-নির্দেশনার বিস্তারিত আলোচনা থাকে না বলেই আমি বাজেটকে কোন কোন পণ্যের বা সেবার উপর কর বা শুল্ক বাড়বে অথবা কমবে তার একটা তালিকা বলে থাকি। পত্রিকা অফিসগুলোও সেভাবেই বাজেটকে প্রকাশ করে। আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যুতসইভাবে করতে নেই। নামমাত্র একটা করা লাগে, তাই আমরা একটা করে দেখাই। কারণ এদেশে নূন আনতে পান্তা ফুরায়। পাঁচ বছরের প্রজেক্ট শেষ করতে দশ-পনেরো বছর সময় লাগে। এ সবই বাস্তবতা। আমাদের বর্তমান বড় পরিকল্পনা '২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার' সামনে রেখে করা হচ্ছে বলা হলেও বাজেটের মধ্যে সে অঙ্গীকারের ছিটেফোঁটা অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। বয়সের ভারে চোখে কম দেখি অথবা এটা কাগুজে অঙ্গীকারও হতে পারে। তবে আগেই বলেছি, বাজেট তো আর সামগ্রিক অর্থনীতির সবটুকুই নয়, সেজন্য সরকারের আলাদা কোনো শুভ পরিকল্পনা থাকতেও পারে, যা 'সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত' বাংলাদেশ গড়ায় কাজে লাগবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করারোপের দিকে বেশি ঝুঁকতে দেখা গেছে। এ কর চাপানো ও আদায় অতি সহজ। এতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে করের অভিঘাতে নিষ্পেষিত হতে হবে। এটা প্রগ্রেসিভ কর-নীতির খেলাপ। এদেশের মানুষ তো ভারবাহী ট্রাকের মতো; ফলে করের এ নিষ্পিষ্ট ভার দলমত নির্বিশেষে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে বইতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। বরং ট্রাকে ভার কম চাপালে ধিতাং ধিতাং নাচতে নাচতে পথ চলে। যেটা দৃষ্টিকটু লাগে। বর্তমান সরকার '৯৬ সালে একবার ক্ষমতায় এসেছিল; ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় আছে। অতীতের যে কোনো বছরের বাজেটের সাথে এ বছরের বাজেটের পাশাপাশি তুলনা করলে তারা নিজেরাই পার্থক্যটা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে আবার অন্যান্য ফ্যাক্টরকে কর্মশীল রেখে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অতটা সহজ হবে না।

এর সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন তো আছেই। মাত্র এক বছর তো; এরই মধ্যে বাস্তবতা ফুটে উঠবে। প্রত্যক্ষ কর চাপিয়ে আদায় করা খুব কঠিন। যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কিংবা সততা দেখিয়ে সঠিক পরিমাণে আয়কর দেন, সমাজের চোখে তারা বোকা। যে-সব প্রতিষ্ঠানে উৎস স্থলে কর কেটে নেয়, কর্মকর্তারা কর দিতে বাধ্য হন– এরাও মহাবিপদে। ত্রিশ শতাংশ টাকা কর্তন করে এদের ক্রয়ক্ষমতা সত্তর টাকায় নামিয়ে আনা হয়। এরা কর ভারে নিষ্পেষিত। অধিকাংশ কোম্পানিতে দুটো বিকল্প হিসাবের খাতা তৈরি করে প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের করভারকে অনেকটাই লাঘব করা হয়। এদের নামমাত্র কর দিতে গায়ে লাগে না। এছাড়া অবৈধ রোজগারকারীদের পোয়াবারো। কর নেই; কোনো আইনে অবৈধ রোজগারে ধরা খাওয়ার ভয়ও নেই। এরাই এদেশের করিতকর্মা ও সুযোগ্য নাগরিক। তাই বলছিলাম, প্রত্যক্ষ কর আদায় বিষয়টা এত সহজ নয়। যে হতভাগারা কর দিচ্ছেন, সরকার সুযোগমতো তাদের ঘাড়ে আরো করের বোঝা কিভাবে চাপানো যায় তার মওকা খোঁজে। নীতিটা হচ্ছে– 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। অধিকাংশ ব্যবসায়ী দুটো হিসাবের খাতা তৈরি করে, কিছু খরচপাতি করে করের অঙ্ক ছোট করে ফেলেন। দিনে দিনে টেকসই কৌশল আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তবে আমার মতো পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের কাছে দেশের আর্থিক বাস্তবতা ঢাকা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার শামিল। আমদানী-রপ্তানী ব্যবসাতে আন্ডার ইনভয়েসিং, অবৈধ লেনদেন ও শুল্ক ফাঁকির যথেষ্ঠ ব্যবস্থা আছে, আছে কালোবাজারি। ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ উপযুক্তভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তাহলে সরকারি কোষাগারে টাকা আসবে কোত্থেকে! একমাত্র সম্বল আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার, যা এদেশে বিরল। আমাদের পরিকল্পনার বড় দোষ হচ্ছে লিকেজগুলো মেরামত না করে পানি ঢেলে ড্রাম ভরার নিষ্ফল চেষ্টা করা। এদেশে জন্ম নিয়ে কর আইন মান্য করা এবং সততা দেখানো নিজে নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনার শামিল। এদের হতভাগা বলা ছাড়া নতুন কোনো শব্দ এ মুহূর্তে মাথায় আসছে না।

বাজেট শুধু বছরের প্রথমে আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনাই নয়, প্রশাসকের হাতে সারা বছরের আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও বটে। এদেশে এই নিয়ন্ত্রণের দিকটা পুরোপুরি উপেক্ষিত। রাজস্ব খাতে যে ব্যয় হচ্ছে, সেখান থেকে দেশ সমপরিমাণ সেবা পাচ্ছে না। আবার উন্নয়ন বাজেট ব্যয়ও ভীষণভাবে অনিয়ন্ত্রিত, যা দেশবাসী কেবলই অনিমিষচোখে দেখছে। 'মঘা, এড়াবি কয় ঘা'! দেশের কোষাগার থেকে উন্নয়ন ব্যয়ের নামে খরচ হচ্ছে একশ টাকা, দেশ অর্জন করছে একশ টাকার

অনেক অনেক কম মূল্যের সম্পদ; বাকিটা সিস্টেম লস। এ সমীকরণ মেলাতে চেষ্টা করা ভাঙা একতারায় বেসুর বোলে সুর সাধার শামিল। গত পাঁচ-ছয় দিন আগে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় একটা খবর পড়লাম। আমাদের দেশে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো রাশিয়া ভারতেও একই আকারের আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে দিচ্ছে। খরচ আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'বালিশ কাণ্ড' পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে আছে। ঘটনাটা আরো হাজার হাজার 'নতুন কাণ্ডে' চাপা পড়ে গেছে। একটা বালিশ নিচতলা থেকে ওপরতলায় ওঠাতে খরচ লেগেছিল মোটামুটি আট'শ টাকা। এরকম প্রতিটা জাজিম আনতে ট্রাক ভাড়া লেগেছিল কয়েক হাজার টাকা (সঠিক তথ্যটা এতদিনে ভুলে গেছি)। এমনই লাখ লাখ 'বালিশ কাণ্ড' এদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। কোষাগারে কুলোবে কতক্ষণ! প্রতিটা সেক্টরে একই অবস্থা। কোনটা রেখে কোনটা বলবো। এদেশে 'জন্মই আমাদের আজন্ম পাপ'। যারা স্বেচ্ছায় কর দেন বা কর দিতে বাধ্য হন, তারা করের ভারে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছেন– এটা নিরঙ্কুশ সত্য। কোন দেশে করের হার কত, এই বয়ান আমার সামনে কেউ না করতে বিনীত অনুরোধ করছি। যাহোক, পাপের কথা কম বলে পুণ্যের কাজের কথা বলি।

ছোটবেলায় রামপ্রসাদি গান শুনেছিলাম, 'মক্কা-কাশি শ্রীবৃন্দাবন, অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর ...'। রাজনীতির দেশীয় স্বভাব ভালো নয়। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশসেবা ও সমাজসেবার নামে রাজনীতি করি। স্বভাবটা আগে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশাসনিক দক্ষতা দেশ-উন্নয়নের উপযুক্ত হতে হবে। উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ব্যয় করার আগে 'যথার্থতা অডিট', যাকে বলে 'যথাযথতা অডিট' (প্রপ্রাইটি অডিট) এক বা একাধিক সৎ ও যোগ্য টিমের মাধ্যমে করাতে হবে। টিমের সদস্যরা রাজনীতিক কিংবা তোষামোদকারী হবেন না। অতপর টিমের নির্দেশনায় বরাদ্দের টাকা ছাড় করতে হবে। এতে কোষাগার থেকে একশ টাকা ব্যয় করলে দেশ একশ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করবে। অনেকে অবৈধ টাকা অর্জন করে কর ফাঁকি দিচ্ছে, কখনো টাকা বিদেশে পাচার করছে। এ অবৈধ টাকা দিয়ে দেশে কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেও অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হয়। অথচ কালো টাকা সাদা করার ব্যবস্থা আছে। কর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না, টেকনোলজির এমন উৎকর্ষের যুগে কর ফাঁকিবাজ ধরার উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব নেই। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মহলের সদিচ্ছা; এছাড়া কর ও শুল্ক প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো দরকার। বেড়ায় ক্ষেত খেয়ে গেলে সে ক্ষেত পাহারা

দেবার কেউ থাকে না। এদেশে কর কারো জীবনব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ছে, কেউবা কর ফাঁকি দিয়ে কিংবা অবৈধ রোজগার করে আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছে এবং সমাজে ফাঁকিবাজ, দুর্নীতিবাজরা কদর ও সম্মান বেশি পাচ্ছে। আমরা মুখে মুখে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছি, কাজে করছি তার বিপরীত। এই বৈপরীত্যের মাঝখানে পড়ে গেছে জনসাধারণ। মূলত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সৎ লোকের জন্য এদেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অনেক সহকর্মী ও সাধারণ লোকের মুখে সে বার্তা শুনতেও পাচ্ছি। কোনো দেশের দেশ-পরিচালকরা যদি সাধারণ মানুষের প্রতি সদয় না হন, সাধারণ মানুষের আর কোনো অবলম্বন থাকে না। এবারের বাজেট দেখলে তাই মনে হয়। সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালে রেডিওতে একটা গান শুনেছিলাম, করের ভার দেখে গানটা আজো মনে পড়ে। কথাগুলো এ রকম: 'ও সোনার ময়না রে, চলো এ দেশ ছেড়ে আপন দেশে যাই। হেথায় আছে রে এক কুলের মায়া, হেথায় আপন বলতে কেহই নাই, চলো এ দেশ ছেড়ে ...'।

এখন থেকে দিন যত ঘনিয়ে আসবে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করে অতীত ঋণের টাকা সুদাসলে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। এটাই এদেশের সামনে কঠিন বাস্তবতা। কোবাদ আলী মণ্ডলের শেষ বয়সে এসে এমনটিই হয়েছিল।

(প্রকাশ: ১৪ জুন ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশ শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠুক

ছাত্রাবস্থায় একটা কথা কোথায় যেন পড়েছিলাম, স্মৃতির পাতা হাতড়িয়ে মনে করতে পারলাম না। কথার মূল ভাবটা এরকম: রাজনীতি হচ্ছে অসংখ্য মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত অল্পসংখ্যক মানুষের সুবিধার্জনের একটা ব্যবস্থা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময়টার কথা এবং বর্তমান অবস্থার কথা মনে হলেই ভুলে যাওয়া বাক্যটার ভাবার্থটা মাথায় নাড়া দেয়। আমি দেখি, এদেশে এই তেপ্পান্ন বছর ধরে একই প্রবাদ চলছে। তাই অনেক নির্ভেজাল সত্য কথা বলতে গিয়েও ভয়ে চেপে যায়, শেষে কিনা নামের সাথে 'রাজাকার' তকমা কেউ যোগ করে দেয়। এটা আমার অকপট স্বীকারোক্তি। জানি এদেশে যারা সক্রিয় রাজনীতি করেন, তাদের অধিকাংশ এক চোখে দেখেন, তারা দুটো চোখ ব্যবহারে অনভ্যস্ত। আমি দুচোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে অপরাধ করে ফেলি। আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে এদেরকে বলে এক-চোখা। এক চোখ দিয়ে কি দুচোখের কাজ চলে? কখনোই না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বয়সে কৈশোরের শেষ প্রান্তে ছিলাম। অনেক কিছুই সামনে ঘটেছে। নিজের চোখে যা দেখেছি, তাকে তো কারো মনগড়া কথায় অস্বীকার করতে পারিনে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে মিছিলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মিছিলে যোগ দিয়ে 'গাড়ির চাকা ঘুরবে না, দোকানপাট খুলবে না' উচ্চারণ করা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠতে একটা তেমাথা রাস্তা। পাশেই করিম নানার বাড়ি। পাশের তেমাথায় বসে অনেকেই করিম নানার কথা শুনতেন। করিম নানা প্রায়ই হাত উঁচু করে নেড়ে নেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বঞ্চনার কথা উপস্থিত সবাইকে বলতেন। ঐদিন সেখানে কাঙালী ভাই, ফটিক ভাইসহ অনেককেই দেখলাম। ফটিক ভাই, কাঙালী ভাইয়ের মতো আরো অনেকে দিনমজুর। বেশ বেলা হয়ে গেছে তবুও তেমাথায় বসে স্বাধীকার ও বঞ্চনার কথা বলাবলি হচ্ছে দেখলাম। করিম নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নানা, আজ লাঙলে যাবে না?' তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন, 'না, আজ হরতাল করবো'। এই অজপাড়াগাঁয়ের কোনো এক প্রান্তের কয়েকজন দিনমজুর ও ক্ষুদ্রচাষি কাজে না গেলে পশ্চিম-পাকিস্তানের তক্তে বসে-থাকা শাসকদের কাছে যে সে সংবাদটা কোনোদিনই পৌঁছবে না, এ অনুভূতি ঐ করিম নানা, ফটিক ভাই, কাঙালী ভাই গং কোনোদিন বুঝে তেমাথায় অবস্থান করেননি। তাদের এ মনোভাব ছিল, কোনো নেতার কাছে ভালো হওয়ার জন্য নয়, স্বতঃস্ফূর্ত সরল মনের চাওয়া, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় ঐ এলাকার দু-একজন রাজাকার বাদে সকলকেই একজোট হয়ে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে যারপরনাই

সাহায্য সহযোগিতা করতে দেখেছি। দেশের কথা, দাবি আদায়ের কথা বলতো বলে অধিকাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতেন। সাধারণ মানুষের এই অকুণ্ঠ-সর্বাত্মক সমর্থন ও ঐকান্তিক ত্যাগের মানসিকতা ছিল বলে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, নইলে বর্তমান অবস্থায় টাকা ও পদ দিলেই অনেক নেতা কিনতে পাওয়া যায়, এমন হলে নয় মাসে দেশ স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। মুক্তিযুদ্ধ শেষে তারা কোনো সার্টিফিকেটও দাবি করেননি, পানওনি । তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও কাঁচি-মাথাল সম্বল হয়েছে, কেউ এখন ছাত্রছাত্রী কিংবা ছাত্রছাত্রীর বাপ। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, স্বাধীনতার পরও ঐ ফটিক ভাই, কাঙালী ভাই কমপক্ষে ২৫ বছর বেঁচে ছিলেন। তাদের কোনোদিন অর্ধ-লুঙ্গি ছাড়া পুরো-লুঙ্গি পরে মরতে কেউ দেখেনি।

আমার এক আত্মীয় গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতেন। খানসেনারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে অমানবিক নির্যাতন করেছিল। তার সাথে আরো অনেককে বধ্যভূমিতে গুলি করতে নিয়ে যাবার সময় এক বিহারি কসাই, যার কাছ থেকে আমার ঐ আত্মীয় প্রতিনিয়ত মাংস কিনতেন, তাকে গোপনে ছেড়ে দিয়েছিল। আমার ঐ আত্মীয়কে বছরাধিককাল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। আজীবন তিনি ভালোভাবে হাঁটতে পারতেন না। তিনি কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দাবি করেননি। গ্রামের যেসব বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত ভাত-রুটি সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানো হতো, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন, তাদের অধিকাংশ পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। যে ক'জন রাজাকার ছিল, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে, কেউবা অন্য কোথাও পালিয়ে থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কাঙালী ভাই, ফটিক ভাই, করিম নানা গংকে এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের কোনো সুফল পেতে আমি দেখিনি। এমন কি তাদের ছেলেমেয়েদের কর্ম ও পেশার ডাইভার্সিফিকেশনও আমি দেখিনি। কেউ কেউ বড়ো জোর চাষ ছেড়ে ছোট্ট দোকান দিয়ে সংসার চালায়। তার এক পুতি নিজের যোগ্যতায় কয়েক বছর হলো একটা চাকরিতে গেছে। আমার প্রশ্ন, আমার দেখা এই মানুষগুলো এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলবো, নাকি 'রাজাকার' বলবো? যাদের হাতে সার্টিফিকেট নেই, তারাই কি রাজাকার? দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে অনেকের মুখে এ ধরনের কথা কি আদৌ শোভা পায়? অন্য দিকে আমি অনেককেই চিনি, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, অথচ মামা-খালুর জোরে হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরছে। তাদের অনেকেই অবসরে গেছে। তাদের সন্তান এবং নাতি-পুতিরাও সুবিধা পাচ্ছে। এদের ব্যাপারে রাজনীতিকদের বক্তব্য কী? ইচ্ছাকৃতভাবে ঢালাও

কথা বলে মুক্তিযুদ্ধকে কলুষিত করার জন্য মূলত এরাই দায়ী। এরা পানি ঘোলা করে মাছ শিকারে মত্ত। এদের অনেকেই তৎকালীন সহজ-সরল বাঙালিকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। দেশকে গুরুর সম্পত্তির মতো নিজেরা ভোগদখল করে চলেছে, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে চলেছে। লুটপাট ও দুর্নীতি-দুরাচারে দেশটা ভরে গেছে। সাধারণ সহজ-সরল মানুষকে বোকা ভাবা ঠিক নয়, তাদের চোখে এটা এখনোও ভালো লাগে না। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না সত্য কিন্তু ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। স্বাধীনতায় দেশ ভিনদেশি শোষকমুক্ত হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য শোষক স্বয়ং নিজের ঘরে তৈরি হয়েছে, যে কথা আমি প্রায় নিবন্ধেই লিখি। সার্টিফিকেটধারী ও নন-সার্টিফিকেটধারী অনেকের বংশধরদেরও অতি প্রতীক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আশাভঙ্গের বেদনার কারণে বিভিন্ন দলে ঢুকে দলীয় সাপোর্টার বা সক্রিয় রাজনীতিক হতে নিজ চোখে দেখেছি। দোষ কার? যারা শপথ করে ভঙ্গ করেছে, কিংবা কথা দিয়ে কথা রাখেনি তাদের, নাকি পরবর্তী বংশধরদের? আমরা কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষে শ্লোগান না দিতে পারলেই তাকে 'রাজাকার' বলার যৌক্তিকতা এবং ছাত্রছাত্রীদের যৌক্তিক দাবি হলেও 'সব রাজাকারের নাতিপুতি'– এ ধরনের ঢালাও কথা ভাবা ও বলার আগে বাস্তবতা নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে ভাবেন, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, দেশকে ভালোবাসেন, কোনো দলবাজি করেন না তাদের সাথে কথা বলে নির্ভেজাল সত্যটা জেনে নিলে ভালো হয়। ঢাকার চার দেয়ালের মধ্যে বসে 'চাটার দলের' স্তুতিবাক্য শুণে আমাদের মুখ দিয়ে 'বেফাঁস' (অসংযত) কথা যত সংযত করা যায়, দেশের পরিবেশ ও স্থিতিশীলতার জন্য ততই মঙ্গল। নির্ভেজাল দলবাজি, দেশ লুট, ব্যাংক লুট, বাধাহীন দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য– এসব কারণে মানুষ খুব ক্ষোভে ও কষ্টে আছে। স্বাধীনতার পর এমন বিক্ষুব্ধ অবস্থা আমি আর দেখিনি। সোস্যাল মিডিয়ার কারণে সবই ওপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। এই ক্ষোভের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হলে দেশের পরিবেশ যারপরনাই খারাপ হবে এটাই আমরা চোখে দেখলাম। কেউ অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে না। 'যা কিছু হারাক ঐ কেষ্ট বেটাই চোর'– এ বচন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আত্মোপলব্ধি থাকতে হবে। 'কোটা সংস্কার' আন্দোলন তখন 'দেশ সংস্কার' আন্দোলনে রূপ নেওয়াটাও অবাস্তব নয়। পদে উপবিষ্ট লোকজনকে দায়িত্বশীলতার সাথে কথা বলা প্রয়োজন। নইলে ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে মায়ের বুক খালি হয়ে যাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি। লিখছি বলেই বিরোধিতা করছি, একথা ভাবার কোনো কারণ নেই।

গত ১৭ জুলাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম' নিবন্ধে এসব কথা নিয়েই একটু ঘুরিয়ে লিখেছিলাম। কল্পিতভাবে লিখেছিলাম: এক নেতার বখাটে পুত্র বন্ধুদের

নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় আড্ডা দিতে হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে সবারই মৃত্যু ঘটে। গতদিন পাঠকসমাজকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি, আজ করছি: এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ভার কার? কুলাঙ্গার চালক-পুত্রের, বখাটে বন্ধুদের, নিউ-মডেল গাড়ির, নেতাজি বাবার, জনসাধারণের, নাকি রাস্তার? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে তেপ্পান্ন বছরের শেষে এসে এ দেশের এই করুণ পরিণতির বাতেনি-তত্ত্ব নিহিত আছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাছ থেকে পুলিশের গুলিতে নিহত 'আবু সাঈদ'-এর গ্রামের বাড়ির গরিব পরিবেশ, তার মা-বাপের চেহারা দেখেও মাথার মধ্যে এমনি শতেক প্রশ্নের জন্ম নেয়। কোটা সংস্কার যতই করা হোক না কেন, আবু সাঈদের মতো আরো অনেক ঝরে-যাওয়া ছাত্রছাত্রী কোটার চাকরি কোনোদিনই আর নিতে আসবে না। আমি এদের মধ্যে করিম নানা ও তার বংশধরদের ছায়া খুঁজে ফিরি। করিম নানাও খুব অসহায় অবস্থায়, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। দেশ আকাশ দিয়েই উড়ুক, আর পাতাল ফেঁড়েই নামুক, এরা কোনো সুবিধা নিতে আর আসবে না। কিন্তু করিম নানা গং-এর নাতি-পুতিদের সমষ্টিগত 'রাজাকার' আখ্যায়িত করলে কিংবা সামান্য ইঙ্গিত দিলেও আমি ধৈর্য হারাতে বাধ্য হই। এদেশের তাবত দুচোখওয়ালা শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র মারা যাওয়া দেখেও একচোখা-রাজনীতিপ্রিয় দলবাজ শিক্ষকদের মতো নির্বিকার হয়ে বসে থেকেছেন। এটা শিক্ষকতার আদর্শ বহির্ভূত। তারা একজোট হয়ে সরকারের সাথে বসে একটা সুরাহা করতে পারতেন। এরা বে-নজীরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রীকান্ডে'ও নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলেন। এদের চিন্তাভাবনা এদেশের শাশ্বত শিক্ষকতা বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

আমার জানা মতে, এদেশে তৎকালীন জনসংখ্যার শতকরা আধা-শতাংশও রাজাকার ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নাম বাদ দিলে যুদ্ধে সামনাসামনি অংশ নিয়েছেন এমন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা এক শতাংশও হবে না। বাকি থাকে আটানব্বই শতাংশ। প্রকৃত প্রস্তাবে তারাও মুক্তিযোদ্ধা। তাদের ত্যাগ ও আন্তরিক সহযোগিতা কোনো অংশে কম ছিল না। কথায় কথায় যে কোনো কল্পিত অযুহাতে কাউকে 'রাজাকার' বলা জঘণ্য অপরাধ। তাও আবার তেপ্পান্ন বছর পর। এটা একটা ঘৃণ্য রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ও গালি, যা উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করার শামিল। সত্য বলতে কি, দেশ গড়ার জন্য, জনসেবা করার জন্য দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নেতা-নেত্রী আমরা আশা করি। সুশিক্ষিত, সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন দূরদর্শী রাজনীতিকদের অভাব এদেশে অনেকদিন থেকে। এদেশে ভাওতাবাজ, মিথ্যাবাদি, লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা ও চাটুকারদের কদর বেশি, তাই আজ এই দশা। এ-কথা ইশারা-ইঙ্গিতে, কখনো

সরাসরি বারবার এ কলামেই আমি লিখে থাকি। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর যে দুরবস্থা এবং দলে যত তোষামোদকারী, সুবিধাবাদী ও নানা অপরাধের সাথে জড়িয়ে শেষে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য রাজনীতির ছায়াতলে দুস্কৃতকারীর ঢোকার যে চিত্র, তা দিয়ে কিন্তু দেশ গড়াও অসম্ভব। একথা সব দলের ক্ষেত্রেই সত্য, তবে এ শ্রেণির সুবিধাবাদী লোকজন ক্ষমতাসীন দলে বেশি ঢোকাটাই স্বাভাবিক। আমার এ অকপট চাঁছাছোলা কথায় অনেকে নাখোশ হবেন জানি, কিন্তু এটা নির্ভেজাল সত্য।

আজ পর্যন্ত হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান এখনোও জানি না, ইন্টারনেটও বন্ধ রাখা হয়েছিল। যেসব ছাত্র মারা গেছে সবাইকে আমি আমার ছাত্ররূপে গণ্য করি। আমার ছাত্র না হলেও আমার ছাত্রের ছাত্র। আমি দেখেছি, কোটা সংস্কার আন্দোলন এবার সহিংস ছিল না। অনেক অপরিণত, দম্ভোক্তি, উসকানিমূলক কথা বলে এটাকে সহিংস করা হলো। ছাত্রদের রক্ত বৃথা যাক এটা আমি চাইনে। তাদের রক্তের প্রতিটা কণা সব অন্যায়, দাম্ভিকতা, সীমাহীন দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অব্যবস্থা, দুরাচারবৃত্তি, দলীয় ছাত্র নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সব জঞ্জালকে ভাসিয়ে চিরদিনের মতো সাগরে নিয়ে গিয়ে ফেলুক, দেশ শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠুক, এটা সবার একান্ত চাওয়া। সবার শুভবুদ্ধির উদয় যত তাড়াতাড়ি হয় ততই দেশের মঙ্গল।

(প্রকাশ: ২৬ জুলাই ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সত্য কথা শুনতে বিস্বাদ— আত্মজিজ্ঞাসাই সমাধান

চারপাশে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে টালমাটাল অবস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন দুর্ভাগ্যজনক ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে এদেশ সামনে এগিয়ে যাবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সকাল থেকেই দেখছি দেশজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল আর মিছিল, কখনো ক্ষমতাসীন দলের পাল্টা মিছিল; ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের ধাওয়ার কাছে তারা পরাজিত, যদিও তারা পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দেশীয় অস্ত্র, রামদা, চাপাতি নিয়ে মেকাবেলার চেষ্টা করছে। আমি বয়স্ক শিক্ষক হওয়াতে বাসায় বসে দেশ-বিদেশের মিডিয়া ও সামাজিক মিডিয়ায় খবর দেখা, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড দেখা, বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, ভবিষ্যতের কথা ভেবে হা-হুতাশ করা ছাড়া এই মুহূর্তে করার তেমন কিছু নেই। কারণ আমার মতো নগন্য মাস্টারের উপদেশের ওপর ভিত্তি করে এদেশের কোনো পক্ষই সিদ্ধন্ত নেবে না। সবাই যে কোনো মূল্যে যার যার সিদ্ধান্ত ও জেদ বজায় রাখতে চায়। আমারা জানি জেদের পরিণতি কোনোদিনই ভালো কিছু বয়ে আনে না। পরিণতি তারা বুঝেও বুঝতে চায় না। পরিণতি যে ভয়াবহ, আমরা বুঝি। পরিণতি দেশের জন্য কোনোভাবেই সুখকর হবে না। ছাত্রদের সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলে চলেছি। গ্রেফতার হওয়ার ভয়েও আছি। আজ তেতাল্লিশ বছর শিক্ষকতা করি। তাদের মতিগতি, চিন্তা-চেতনা অনেক বুঝি। দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রী। গত লেখায় লিখেছিলাম, তাদের আন্দোলন অহিংস। সবাই বিরোধী দলের ছাত্র এটা ভাবা ঠিক না। এদেশে এ আন্দোলনে যত ছাত্র, যত সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছে, অনেকের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি; যত কথাই বলুন, যতই কোটার দাবি মেনে নেন, পারবেন কি কেউ তাদের জীবন ফেরত দিতে? ফলে 'মাথায় বেদম জোরে আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়া আর চলে না'। ওইটা ভুলে যান। এখন আর আন্দোলন সে পর্যায়ে নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দানা বেঁধে এখন তার বিষ্ফোরণ ঘটেছে। 'মরণের সময় হরির নাম কানে দিয়ে খুব একটা লাভবান হওয়া যায় না।' কাউকে না কাউকে একটু সমঝে চলতে হবে, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। সাময়িক আবেগপ্রবণতা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো দাম নেই। যার ফল ক্ষমতাসীনদের ভোগ করতে হচ্ছে।

একটা বিষয় খারাপ লাগছে, যে-ই মরছে কিংবা দারুণভাবে আহত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ জীবন অকেজো হয়ে যাচ্ছে— সবাই আমার ছাত্রছাত্রী অথবা ভাইয়ের ছেলে অথবা ভাই অথবা নাতি; তা সে যে দলেরই হোক। সবাই এদেশের সন্তান, সবাই

আমরা। সবারই এদেশে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিল: 'ওরা এবং আমরা'। এখানেই আমার মর্মবেদনা। এ কথাটা বুঝতে আমরা অনেক দেরি করে ফেলি। এখানেই দেশপ্রেমের পার্থক্য। দেশপ্রেম শুধু দেশকে ভালোবাসা না, দেশের সব মানুষকে ভালোবাসা। এটা দেশপরিচালকদের দায়িত্ব। অনেকদিন থেকেই এই পত্রিকার মাধ্যমে বলে আসছি মূলত আমার কোনো দল নেই; আসলেই নেই। আমার দলের নাম বাংলাদেশ দল। একাত্তর পর্যন্ত দল করতাম, তারপর অনেক কষ্ট পেয়ে কোনো দলের পক্ষে কাজ করা ছেড়েছি। দল যে একেবারে করি না, তা নয়। যুদ্ধের পর থেকে ইস্যুভিত্তিক দল করি। কখনো কোনো দল বা আন্দোলনের পক্ষে যাই, কারো বিপক্ষে যায়। এখন যেমন আমি ছাত্রছাত্রীদের দাবির পক্ষে। অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের অধিকার নিয়ে আমার কাছে আসছে, আমি সহজভাবে তাদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করছি; খাবার, পানি ও টাকা জোগাচ্ছি। এটা কারো চোখে দেখতে খারাপ লাগবে; আমি কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমার প্রিয় ছাত্রদের পাশে দাঁড়াচ্ছি; তাদেরকে আমি পড়িয়েছি। তবে তাদেরকে আমি লাঠি নিয়ে মারামারি করতে নিষেধ করছি। তারা বলছে, 'স্যার আমাদেরও তো আত্মরক্ষার দরকার আছে'। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল প্রথম থেকেই যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে, আমি তার সাথে সহমত জানাতে পারছি না। তারা প্রথমেই ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের রামদা, কিরিছ, চাপাতি হাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমনে নামালো কেন? জানতে হবে, 'বাঁদরের বাঁদরামি সব জায়গায় নয়'। আমার এসব বিস্বাদ কথা অনেকের পছন্দ হবে না জানি। কারণ রাজনীতিকদের চোখ একটা, আমার তো দুটো, একথা আমি সবসময় বলি। আমার মনে কোনো প্রতিহিংসা নেই; তাদের আছে। এ পরিস্থিতিতে এদেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কি কি করণীয় তা আমার এবং আমার মতো সাধারণ নাগরিক, দেশপ্রিয় অনেক সুশিক্ষিত, সরাসরি কোনো দলভূক্ত না যারা, তাদের জানা। ছোট্ট একটা সুন্দর দেশ, এদেশ নির্মোহ ও অহিংসভাবে পরিচালনা করা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় বলে জানি।

এ বিষয়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করি। এ পরিস্থিতির মতো এতটা অরাজক অবস্থা কিন্তু তখন হয়নি। তারপরও হুসেইন মো. এরশাদ সরকার অল্প আন্দোলনে ক্ষমতা ছেড়েছিলেন। তাতে হুসেইন মো. এরশাদ ভালোই করেছিলেন; অন্তত তার এদেশেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং প্রথম থেকেই বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে মিলে দীর্ঘবছর একসাথে কাজ করেছেন। ছিয়ানব্বই-এ ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বিএনপিও ক্ষমতা ছেড়েছিলেন। আবার

বিএনপি এখনোও এদেশে রাজনীতি করে যাচ্ছে। বরিশালে গিয়ে একটা আঞ্চলিক কথা শিখেছিলাম, 'যে সয়, সে রয়'। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল অনেক ভুল করে চলেছে, যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খেসারত দেশ ও ইতিহাসের কাছে তাদেরকেই দিতে হবে। অনেক বছরের পুরোনো একটা শিক্ষণীয় ঘটনা অতি সংক্ষেপে বলি, অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে: শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতের ক্ষমতায়। কোনো এক প্রদেশের জনসভায় (সালটা ভুলে গেছি) ভাষণ দিতে গিয়ে বিশৃঙ্খল উত্তেজিত জণসাধারণ তার দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসছিল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রক্ষা করতে পারছে না। তিনি গুলি ছোড়ার অনুমতি দিলেন না। মঞ্চের পিছনে বাঁশ বাঁধা। উনি তার নীচ দিয়ে মাথা ও কোমর নুয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। অনেক সাংবাদিক সে অবস্থার ছবি তুলে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন; পরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো গুলি ছোঁড়ার অনুমতি দিতে পারতেন; বিশেষ ক্ষমতা আইনে রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তা করলেন না কেন? তিনি তার কারণ বলেছিলেন। আমার পুরোটা মনে নেই। তিনি পরের নির্বাচনে সে রাজ্যে বিজয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এসেছিলেন। জনসাধারণ তাকে আবার ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। এদেশের যারা যেমন রাজনীতি করেন, সব দলের মন-মানসিকতা, কর্মকাণ্ড, নেতা-নেত্রীদের 'চাটার দল' পোষার পরিণতি আমাদের মোটামুটি জানা। সব দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর সততা, কথার গুরুত্ব, লোভ-লালসা, ধরাকে সরা জ্ঞান করা, ডাহা মিথ্যা কথন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সত্য-মিথ্যা, মোসাহেবি, দেশপ্রেম সবই প্রায় আমার মতো অনেকের জানা। এসব 'চাটার দল' সাথে নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। দলের মধ্যেও দোষ ধরিয়ে দেওয়ার কিছু লোক থাকার দরকার। সমালোচনা করলেই সে বা তারা খারাপ তা নয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এসব বিবেচনায় এখন সমঝে চললে ক্ষমতাসীন দলের পরবর্তীতে আবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেকটাই সহজসাধ্য ছিল।

এ অবস্থার জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো অতি সংক্ষেপে বলি। ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করার লোকের খুব অভাব। তারা কোনো সমালোচনাকে ভালোভাবে বিবেচনা করতেও পারেন না। আমিও সমালোচনা করি। ক্ষমতাসীন দল ও কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সিস্টেম, পরিস্থিতি, কর্ম ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে। এই ক্ষমতাসীন সরকারের ছিয়ানব্বই মেয়াদের শাসনামলে দেশ মোটামুটি চলেছে। কিন্তু তার পরের টার্মে প্রায় দেড় যুগ হতে চললো কর্মকাণ্ড ক্রমশই খারাপের দিকে গেছে। উদাহরণ দিতে আমার মতো মাস্টার সাহেবরা পছন্দ করেন, অল্প কয়েকটা দিচ্ছি, যেমন– হরিলুটের ব্যাংক ব্যবসা, সর্বৈব মিথ্যাচার, অব্যবস্থা-অবিচার, দেশব্যাপী

দুর্নীতির হোলি খেলা, নির্ভেজাল দলবাজি, দেশব্যাপী দুষ্কৃতিকারীদের দলভূক্তকরণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের স্বার্থকে বহিঃশক্তির কাছে বিকিয়ে দেওয়া, অফিস-আদালত ও সমাজের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ, 'আয়নাঘর'-'গুমকাণ্ড' করে বিরোধী মত দমন, প্রকাশ্য নানা অভিনব পন্থায় বারবার গণতন্ত্র চুরি, হাজারে হাজার 'বালিশকাণ্ড', 'ছাগলকাণ্ড', 'বেনজির গংকাণ্ড' 'মতিউর রহমান গংকাণ্ড', 'এমপি আনার হত্যাকাণ্ড', দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি– এমনি আরো শতশত ঘটনা। এসব কাণ্ডকারখানায় জনজীবন অতিষ্ঠ, দেশের কোষাগারশূন্য, সম্বল বিদেশী ঋণ, ঋণ করে ঘি খাওয়া আর উন্নয়নের বাহানা ও বিজ্ঞাপন, বাকিটা সিস্টেম লস, 'চাটার দল' প্রতিপালন। সবই নির্ভেজাল বাস্তবতা। এসব কোনো কিছুই দেশ ভালো চলছে প্রমাণ করে না। খোলা সামাজিক মাধ্যমের এ যুগে প্রতিটা সচেতন মানুষই ভালো-মন্দ বোঝেন ও জানেন। ক্ষোভগুলো দীঘদিনে মানুষের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে পুঞ্জিভূত হয়েছে। কেউ চুপ থাকেন, কেউবা সুযোগ বুঝে কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। এখন তা বিষ্ফোরিত হচ্ছে। ফল খাওয়ার লোভে গাছে তোলা লোক অনেক আছে, কিন্তু নিরাপদে নামিয়ে আনার লোকের সংখ্যা নগণ্য। এ অভিযোগগুলো আমি করছি বটে, তবে অন্য কোনো দলের পক্ষেও এসব অভিযোগ করা শোভনীয় নয়। সব দলকেই তেপ্পান্ন বছর ধরে দেখে আসছি; কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অসহনীয় বেশি। এটা আমার সকল দলের প্রতি আত্মবিশ্লেষণের কথা। নিজেদেরকে আমরা খোলা মনে জিজ্ঞেস করতে পারি। আমি জানি, আমি ভুল বলিনি।

ক্ষমতাসীন দল ছাত্রছাত্রী, বিরোধী পক্ষ ও সাধারণ মানুষের এ গণরোষ ও বিক্ষোভ সামলাতে পারবে কিনা আমি বেশি সন্ধিহান। এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অতি কাছের এবং দূরের সমব্যথী অনেক দেশই রসদ ও শৃঙ্খলা-বাহিনী নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। অনেক আশার বাণীও শুনাতে পারে। এটা ক্ষমতাসীন দলের জন্য আপাতত সহায়ক বলে তাদের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে এর মধ্যে অনেক অপাঙ্‌ক্তেয় পরিণতি লুকিয়ে আছে। আমি আন্দোলনকারী অনেকের মুখে দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে বলতে শুনেছি। আমি একমত হতে পারি না। আমি বলি, এটা অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার, আইনহীনতা, লুটপাট ও দুরাচারবৃত্তি, নির্বিচার নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী সকল পেশার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটা আমি আশা করি। প্রয়োজনে অনেক ভেতরের কৌশলগত কথা বলতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু বিদেশী, প্রতিবেশি, দূরদেশী কোনো বেশধারী বন্ধুর প্ররোচনায় সে দেশের রসদ ও শৃঙ্খলা-বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও

শৃঙ্খলা রক্ষা করার আশ্বাস কোনোক্রমেই এদেশের শৃঙ্খলা, শান্তি, স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সহায়ক না হয়ে আত্মঘাতি হতে বাধ্য। কারণ অল্প কথায় বলা যায়, এতে স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধানের কথিত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার এতদিনের ত্যাগ, অবদান ও তিতিক্ষা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পোড়ামাটিতে পর্যবসিত হবে। সবকিছুই আনুপূর্বিক ভেবে দেখার প্রয়োজন। কথায় বলে, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। বাংলাদেশে প্রচলিত এসব প্রবাদবাক্যের নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

(দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ৬.৮.'২৪ তারিখ প্রকাশের জন্য লেখাটি ৪.৮.'২৪ তারিখের রাতে লিখে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারব্যবস্থার পতন ঘটে। পরে প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বিধায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

প্রকৃতির প্রতিশোধ সত্যই হলো

ছোটবেলায় ধুয়োজারির গান শুনতে যেতাম। বয়াতি গাইতেন: ‘গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা–আ–আ, ও রে এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা, আহা–আ–আ–আ।’ এতটা বছর ধরে লিখছি, কিন্তু আজ কলম ধরতে কেন জানি সংকোচ বোধ করছি। দুপুরের আগেই আমার ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিজয় আমাকে ফোনে জানিয়েছে। সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমাকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে। আমি নিভৃতচারী, নিভৃতেই রয়ে গেছি। বিজয় উল্লাসে যায়নি। কেউ কেউ অনেক জায়গায় এটাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করছে। কেউ আবার দ্বিতীয় বিজয় দিবসও বলছে। আমি কোনোটাতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। হতে পারে এদেশের আপসহীন ছাত্রছাত্রীরা ও সাধারণ মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। একটা অগণতান্ত্রিক সরকার বছরের পর বছর জনগণের বুকে চেপে বসে যে মিথ্যাচার ও লুটপাট করে চলছিল, অথচ বিরোধী দল তাদেরকে কোনোভাবেই গদিচ্যুৎ করতে পারছিল না, এদেশের অকুতোভয় ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ তাকে জয় করেছে, তাই দ্বিতীয় বিজয় দিবস। আমি এতে আনন্দিত হয়নি বরং দুটো কারণে কষ্ট ও ভয়ে ভয়ে আছি। একটি হচ্ছে: যত শত শত ছাত্র ও সাধারণ নিরিহ মানুষ এতে প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা স্মৃতি থেকে মুছতে পারছিনে, চোখে চোখে ভাসছে; তাই হাসতে পারছিনে। যারা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে, তাদের কথাও ভাবছি। বারবার তাদের পরিবারের কথা ভেবে মনটা কাতর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া যেসব মানুষকে গণহত্যা করে লাশ গায়েব করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেওয়ারিশ বলে কোথাও গণকবর দেওয়া হয়েছে, অতি তাড়াতাড়ি খোঁজ করলে এখনো হয়তো শনাক্ত করা যাবে। সামাজিক মিডিয়ায় রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে অনেক সারি সারি কবর দেখলাম। সেখানেও খোঁজ করা যেতে পারে। এতে অন্তত গণহত্যায় লাশের মোটামুটি সংখ্যাটা জানা যাবে। রায়ের বাজার বধ্যভূমির কথা মনে হলে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া আন্‌জুমান মফিদুল ইসলামে যোগাযোগ করে অনেক লাশের খোঁজ করা যেতে পারে। বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

না হাসতে পারার আরেকটি কারণ হচ্ছে: গতকাল রাতে একটা লেখা পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। আগামীকাল (৬.৮.’২৪) প্রকাশিত হবার কথা ছিল। আমি যা বলি সামনাসামনি বলি, এটা পাঠকসমাজ জানেন, পিছনে পরচর্চা করা আমার অভ্যাস নয়। অনেক ঝুঁকি নিয়ে অনেকদিন থেকে এই পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় লিখে চলেছি। কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়, সামাজিক অব্যবস্থা, শিক্ষাহীনতা, সামগ্রীক দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, আইনহীনতা, অসহনীয় দলবাজি ইত্যাদির

বিরুদ্ধে। এ নিয়ে আমার অসংখ্য পরিচিতজন ও সহকর্মী আমাকে এসব খোলামেলা লেখায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তবুও আমাকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। আমার ভয় হয় এদেশে দুর্নীতিবাজ, লুটেরা, মিথ্যবাজ, চাটুকারের অভাব নেই। এক গোষ্ঠীর লুটপাটের অবসান হলো, আবার এমন কোনো গোষ্ঠী এসে যদি দেশের ওপর ভর করে! তখন কী হবে? এ পরিবর্তন যদি ইতিবাচক হয়, মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে, তবেই তাকে সমর্থন করি। আমি তো কৈশোরের শেষ প্রান্ত থেকে আশায় আশায় দিন গুনছি, এখন এক পা কবরে চলে গেছে। এ দেশের উন্নতির পরিবেশ দেখে মরতে পারবো তো? আমার মনে হয়, এদেশের উন্নতিটা যদি নিজে করে দেখিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে মনে শান্ত্বনা খুঁজে পেতাম। আমার মতো সাধারণ একজন মাস্টার সাহেবের সে যোগ্যতাও তো নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে একদল এসে নির্বাচন করে দিয়ে সরে যাবেন। আবার যাহা পূর্বং, তাহাই পরং। দেশ পরিচালনায় আমার কিছু সেট নীতিমালা দীর্ঘ বছর ধরে মনে জড়ো হয়েছে। কিছু কথা পত্রিকাতেও লিখেছি। আমি জানি সেটা অব্যর্থ। এই পত্রিকাতেই বিস্তারিত লিখবো, যদি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাকে সে অভয় দেন। আমার দায়িত্ব আমি পালন করে যাবো। বাস্তবায়নের দায়িত্ব পদধারীদের। যে দলই হোক বা ব্যক্তিই হোক, মিথ্যা, দুর্নীতি ও ভাওতাবাজির সাথে কোনো আপস নেই। গতকাল সরকারি দলের উদ্দেশ্যে যা লিখে পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম, তার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরছি। কেউ এখান থেকে সত্য খুঁজে নিতে পারেন।

লিখেছিলাম: "এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল প্রথম থেকেই যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে, আমি তার সাথে সহমত জানাতে পারছি না। তারা প্রথমেই ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের রামদা, কিরিছ, চাপাতি হাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমনে নামালো কেন? জানতে হবে, 'বাঁদরের বাঁদরামি সব জায়গায় নয়'। আমার এসব বিস্বাদ কথা অনেকের পছন্দ হবে না জানি। কারণ রাজনীতিকদের চোখ একটা, আমার তো দুটো, একথা আমি সবসময় বলি। এ পরিস্থিতিতে এদেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কি কি করণীয় তা আমার এবং আমার মতো সাধারণ নাগরিক, দেশপ্রিয় অনেক সুশিক্ষিত, সরাসরি কোনো দলভুক্ত না যারা, তাদের জানা। ছোট্ট একটা সুন্দর দেশ, এদেশ নির্মোহ ও অহিংসভাবে পরিচালনা করা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় বলে জানি।

এ বিষয়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করি। এ পরিস্থিতির মতো এতটা অরাজক অবস্থা কিন্তু তখন হয়নি। তারপরও হুসেইন মো. এরশাদ সরকার অল্প আন্দোলনে ক্ষমতা ছেড়েছিলেন। তাতে হুসেইন মো. এরশাদ ভালোই করেছিলেন; অন্তত তার এদেশেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ছিয়ানব্বই-এ ব্যাপক

আন্দোলনের মুখে বিএনপিও ক্ষমতা ছেড়েছিল। আবার বিএনপি এখনো এদেশে রাজনীতি করে যাচ্ছে। বরিশালে গিয়ে একটা আঞ্চলিক কথা শিখেছিলাম, 'যে সয়, সে রয়'। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল অনেক ভুল করে চলেছে, যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খেসারত দেশ ও ইতিহাসের কাছে তাদেরকেই দিতে হবে। অনেক বছরের পুরোনো একটা শিক্ষণীয় ঘটনা অতি সংক্ষেপে বলি, অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে: শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতের ক্ষমতায়। কোনো এক প্রদেশের জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিশৃঙ্খল উত্তেজিত জণসাধারণ তার দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসছিল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রক্ষা করতে পারছে না। তিনি গুলি ছোড়ার অনুমতি দিলেন না। মঞ্চের পিছনে বাঁশ বাঁধা। উনি তার নীচ দিয়ে মাথা ও কোমর নুয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। অনেক সাংবাদিক সে অবস্থার ছবি তুলে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন; পরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো গুলি ছোড়ার অনুমতি দিতে পারতেন; বিশেষ ক্ষমতা আইনে রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তা করলেন না কেন? তিনি তার কারণ বলেছিলেন। আমার পুরোটা মনে নেই। তিনি পরের নির্বাচনে সে রাজ্যে বিজয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এসেছিলেন। জনসাধারণ তাকে আবার ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। এদেশের যারা যেমন রাজনীতি করেন, সব দলের মন-মানসিকতা, কর্মকাণ্ড, নেতা-নেত্রীদের 'চাটার দল' পোষার পরিণতি আমাদের মোটামুটি জানা। অনেক দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর সততা, কথার গুরুত্ব, লোভ-লালসা, ধরাকে সরা জ্ঞান করা, ডাহা মিথ্যা কথন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মোসাহেবি, দেশপ্রেম সবই প্রায় আমার মতো অনেকের জানা। এসব 'চাটার দল' সাথে নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। দলের মধ্যেও দোষ ধরিয়ে দেওয়ার কিছু লোক থাকা দরকার। সমালোচনা করলেই সে বা তারা খারাপ, তা নয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এসব বিবেচনায় এখন সমঝে চললে ক্ষমতাসীন দলের পরবর্তীতে আবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেকটাই সহজসাধ্য ছিল।

এ অবস্থার জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো অতি সংক্ষেপে বলি। তারা কোনো সমালোচনাকে ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারে না। আমিও সমালোচনা করি। ক্ষমতাসীন দল ও কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সিস্টেম, পরিস্থিতি, কর্ম ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে। এই ক্ষমতাসীন সরকারের এ টার্মে প্রায় দেড় যুগ হতে চললো কর্মকাণ্ড ক্রমশই খারাপের দিকে গেছে। উদাহরণ কয়েকটা দিচ্ছি, যেমন- হরিলুটের ব্যাংক ব্যবসা, সর্বৈব মিথ্যাচার, অব্যবস্থা-অবিচার, দেশব্যাপী দুর্নীতির হোলি খেলা, নির্ভেজাল দলবাজি, দেশব্যাপী দুষ্কৃতিকারীদের দলভুক্তকরণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের স্বার্থকে বহিঃশক্তির কাছে বিকিয়ে দেওয়া, অফিস-আদালত ও সমাজের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ,

‘গুমকাণ্ড’ করে বিরোধী মত দমন, প্রকাশ্য নানা অভিনব পন্থায় বারবার গণতন্ত্র চুরি, হাজারে হাজার ‘বালিশকাণ্ড’, ‘ছাগলকাণ্ড’, ‘বেনজির গংকাণ্ড’ ‘মতিউর রহমান গংকাণ্ড’, ‘এমপি আনার হত্যাকাণ্ড’, দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি– এমনি আরো শতশত ঘটনা। এসব কাণ্ডকারখানায় জনজীবন অতিষ্ঠ, দেশ কোষাগারশূন্য, সম্বল বিদেশী ঋণ, ঋণ করে ঘি খাওয়া আর উন্নয়নের বাহানা ও বিজ্ঞাপন, বাকিটা সিস্টেম লস, ‘চাটার দল’ প্রতিপালন। সবই নির্ভেজাল বাস্তবতা। এসব কোনো কিছুই দেশ ভালো চলছে প্রমাণ করে না। খোলা সামাজিক মাধ্যমের এ যুগে প্রতিটা সচেতন মানুষই ভালো–মন্দ বোঝেন ও জানেন। ক্ষোভগুলো দীর্ঘদিনে মানুষের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে পুঞ্জিভূত হয়েছে। এখন তা বিস্ফোরিত হচ্ছে। ফল খাওয়ার লোভে গাছে তোলা লোক অনেক আছে, কিন্তু নিরাপদে নামিয়ে আনার লোকের সংখ্যা নগণ্য। সব দলকেই তেপ্পান্ন বছর ধরে দেখে আসছি; অন্যায় কাজে কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অসহনীয় বেশি। এটা আমার সকল দলের প্রতি আত্মবিশ্লেষণের কথা। নিজেদেরকে আমরা খোলা মনে জিজ্ঞেস করতে পারি। আমি জানি আমি ভুল বলিনি।

ক্ষমতাসীন দল ছাত্রছাত্রী, বিরোধী পক্ষ ও সাধারণ মানুষের এ গণরোষ ও বিক্ষোভ সামলাতে পারবে কিনা আমি বেশি সন্দিহান। এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অতি কাছের এবং দূরের সমব্যথী অনেক দেশই রসদ ও শৃঙ্খলা–বাহিনী নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। এটা ক্ষমতাসীন দলের জন্য আপাতত সহায়ক বলে তাদের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে এর মধ্যে অনেক অপাঙ্‌ক্তেয় পরিণতি লুকিয়ে আছে। আমি আন্দোলনকারী অনেকের মুখে দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে বলতে শুনেছি। আমি একমত হতে পারি না। আমি বলি, এটা অন্যায়–অত্যাচার, মিথ্যাচার, আইনহীনতা, লুটপাট ও দুরাচারবৃত্তি, নির্বিচার নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী সকল পেশার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিত্ব রক্ষার আন্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটা আমি আশা করি। প্রতিবেশি, দূরদেশী কোনো বেশধারী বন্ধুর প্ররোচনায় সে দেশের রসদ ও শৃঙ্খলা–বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার আশ্বাস কোনোক্রমেই এদেশের শৃঙ্খলা, শান্তি, স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সহায়ক না হয়ে আত্মঘাতি হতে বাধ্য।”

আমার গত দিনের লেখা তাদের স্বভাবের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরিণতির জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা পালিয়ে গেছেন। আমি জানি যে, পতিত সরকার যথাসাধ্য ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে গেছে। অন্য কোনো দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি, নাকি পতিত সরকারই সাহায্য চায়নি– এটা তারাই ভালো বলতে

পারবেন। তিনি পালিয়ে না গেলেও পারতেন। তাদের বিচারের মুখোমুখী হতে এত ভয় কেন? তিনি গেলেন, তবে পিতার পথ অনুসরণ করে আগষ্ট মাসেই গেলেন। পিতাকে কলঙ্কিত করে গেলেন। দেশে মিষ্টির দোকানে সব মিষ্টি বিক্রি শেষ। যে দেশ থেকে এলেন, সে দেশেই আবার ফিরে গেলেন। মাঝখানে রেখে গেলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রী গুম ও গণহত্যার কলঙ্কের দাগ। তিনি গেলেন কোটি কোটি মানুষের অকথ্য গালি নিয়ে; দেশের মাথায় ঋণের বিশাল বোঝা চাপিয়ে, দেশের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিয়ে, কোষাগার শূন্য করে, লুটেরাগোষ্ঠী দিয়ে দেশ লুট করিয়ে, প্রতিটা সেক্টরের রন্দ্রে রন্দ্রে দুর্নীতি ঢুকিয়ে, জনগোষ্ঠীকে জন-আপদ বানিয়ে। উপরিগতভাবে যে যা-ই বলুক, দেশ ও সমাজের এ ক্ষত অনেক গভীর। চিকিৎসা অতটা সোজা নয়! ভবিষ্যৎ ইতিহাস এর সঠিক মূল্যায়ন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ জনমে হেসে মরতে পারবো কিনা বিশ্বাস হয় না। লালনের গান মনে হয়: ‘আশা সিন্ধু তীরে বসে আছি সদাই, আশা সিন্ধু তীরে...’।

(প্রকাশ: ৭ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অপরাধের সুষ্ঠু বিচার কে না চায়!

ছোটবেলায় সম্ভবত প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষক আমাদের পড়িয়েছিলেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। উপর ক্লাসে উঠে আরো শিখেছিলাম, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত কোরো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না'। যত বয়স হচ্ছে, শেখা কথাগুলোর সাথে এদেশের বাস্তবতা ও সমাজের মানুষের কথার সাথে মিল দেখছি না; বিশেষ করে রাজনীতিকদের কথা ও কাজের সাথে তো বটেই। মাঝে-মধ্যে সংশয় জাগে বইয়ে পড়া কথাগুলো কি আমাদের ভুল শেখানো হয়েছিল, যা বাস্তবে ব্যবহার করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়?

পতিত সরকারের সময়ে এ কলামে সত্য লিখতে গিয়ে এক-চোখা অনেকেই আমাকে 'বিরুদ্ধ দলের চামচা' বলতেও দ্বিধা করেননি। ধন্যবাদ দিই পত্রিকা অফিসকে, আমার সত্য কথাগুলো বাদ না দিয়ে ছাপাতেন। পাঠকসমাজ আমাকে দলকানা হতে কোনোদিন দেখেননি, এটা আমার স্বভাব। এখন তো নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অতীতের লেখা কথা কিছুটা চর্বিত চর্বণ করি; সেই সাথে এদেশের নিখাদ বাস্তবতার কিছু বর্ণনাও দিই, সাধারণ নাগরিক হিসেবে কথা বলার অধিকার আমাদের তো আছেই। ভবিষ্যতে কোন দল এসে ক্ষমতায় বসে, আমার জানা নেই। তাদের সব কাজের সাথে একমত হব না; আমি নিশ্চিত। ফলে ফুটবলের মতো দুই বিপরীত গোলপোস্টের দিকে আমাকে সবাই ঠেলে দেয়। আবার তো সেই অতীত অভিধা কপালে জুটবে। এদেশের রাজনীতির পরিবেশ কেন জানিনা, বইয়ে পড়া নীতিকথার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে। রাজনীতিতে নীতিকথা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা, জনসেবা, সুশিক্ষা, মানবতাবোধ, লোকলজ্জা ইত্যাদির কোনো চিহ্ন নেই। এদেশের রাজনীতি মানে জলজ্যান্ত মিথ্যার বেসাতি; যেমন– একটা উদাহরণ 'গায়েবি মামলা'। এ জীবনে যে ভাঁওতাবাজির আর কত কিছু দেখতে হবে! এমনই শত শত আজব কাণ্ড এদেশের 'চির-মহান' রাজনীতিকদের বদৌলতে হজম করতে হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অত্যধিক বেশি। সামাজিক এ অবক্ষয়, দুর্নমিত যথেচ্ছাচার ও দুর্দমনীয় অনাচার শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু করে এ অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মতলববাজ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে। সে কারণেই গত লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম 'আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার'।

কয়েক বছর ধরে ও এখনও লেখাতে যে অভিযোগগুলো করে চলেছি, সেগুলো হলো: ব্যাপক দুর্নীতি ও লুটপাট, দিনে দুপুরে ডাকাতি, বেপরোয়া মিথ্যাচার,

গৃহপালিত চাটুকার সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে ভিন্নমতাবলম্বী হাজার হাজার সম্মানীত মানুষের মনগড়া দুর্নাম রটিয়ে জনসমক্ষে বেআবরু করে দেওয়া (যেমন– জনাব ফরহাদ মজহারের ঘটনা), ব্যাংকের অর্থ লোপাট, প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ, গায়েবি মামলা (নতুন আবিষ্কার), প্রকাশ্যে কিংবা রাতের অন্ধকারে গণহত্যা ও ভুয়া আত্মপক্ষ সমর্থন (যেমন– মরেনি, ওরা রং মেখে শুয়ে ছিল, মৌলবি-মাওলানারা আগুন দিয়ে বায়তুল মোকাররমের কুরআন ও হাদিস পুড়িয়ে দিয়েছে), নিজের বাহিনী দিয়ে মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করে, মিছিলে অন্তর্দ্বন্দ্বের গোলাগুলিতে মারা গেছে বলে উলটো তাদের শত শত নামসহ অজ্ঞাত নামে খুনের মামলা দায়ের করে মিছিলকারীদের ঘরছাড়া ও কেস-বাণিজ্য করা, যাকে-তাকে ভুয়া মামলায় আটক, দেশব্যাপী প্রতিটা অফিস-সেক্টর-বিভাগে খোলা দুর্নীতি, মেগা দুর্নীতি, কাঁড়ি কাঁড়ি অবৈধ টাকা বিদেশে পাচারে সহযোগিতা, জনগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত বিভাজন, শিক্ষার মানহীনতা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্বের নিয়ন্ত্রণ অন্য অদৃশ্য শক্তির হাতে তুলে দেওয়া, এদেশে মানুষ হারালে পার্শ্ববর্তী দেশে খুঁজে পাওয়া (যেমন- সুখরঞ্জন বালিসহ অনেকে, এর ভিতরেও হৃদয়-কাঁপানো কথা আছে, কারণ আছে), রাজনৈতিক কারণে মানুষ হত্যা-গুম, পঁচাত্তরের আগে রক্ষিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো বিনা বিচারে মানুষ হত্যার (আমাদের নিজ চোখে দেখা) আদলে বিগত ১৫ বছর ধরে অগণিত আয়নাঘরের লোমহর্ষক নির্যাতন, গুম ও ক্রসফায়ার, দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অরাজকতা; দেশব্যাপী রামদা, কিরিচ, চাপাতিসহ সর্টগান, বিভলবারধারী মস্তান পোষা ও ইচ্ছেমত যার-তার ওপর লেলিয়ে দেওয়া; নিজের লোক দিয়ে বসতবাড়ি, যানবাহন, মন্দির, শহিদমিনার প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে বা ভাংচুর করে বিপক্ষীয় দলের ওপর দোষ চাপানোর অপকৌশল (বিরুদ্ধ দলও যে ধোয়া তুলসীপাতা নয়, তাও জানি), বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনাবাহিনীর অসংখ্য চৌকস অফিসার নিধন, নেতা-নেত্রীদের হাজার হাজার কোটি টাকার ঘুষ-বাণিজ্য, সাম্প্রতিক গণহত্যাসহ ২০১৩ সালে সংঘটিত রাতের আধারে শাপলা চত্ত্বরের গণহত্যা। ক'টার কথা বলবো। এ এক আরব্য রজনীর কেচ্ছা। বলে এর কোনো শেষ নেই। আমার শুধু খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে: 'কত রঙের পিরীতি তুমি জানো রে বন্ধু, কত রঙের...'। 'বন্ধু' বলছি এই কারণে যে, স্বাধীনতার আগে এদের বন্ধু ছিলাম, মিছিলে যেতাম, তাদের আশাজাগানিয়া কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম ও বিশ্বাস করতাম। স্বাধীনতার পর পরই সব আশা ভেস্তে গেল; অন্য কোনো দলে যোগ দিতে পারিনি। হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছি। ভাগ্যিস এদেশের ছাত্র-জনতা 'এই মগের মুল্লুক'কে আমার

জীবদ্দশায় আবার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশ নামের সার্বভৌম দেশে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে এবং আমি আবার আশাবাদি হয়ে উঠেছি।

এদেশের সাধারণ মানুষ দলমত নির্বিশেষে এসব দেশ-বিধ্বংসী অপকর্মের সুষ্ঠু বিচার চায়। জামাই আদরে ক্যান্টনমেন্ট কিংবা গোপন কোথাও লুকিয়ে রাখলে চলবে না। তাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। প্রত্যেক অন্যায়কারী, খুনি, অপরাধীকে দ্রুত গ্রেফতার দেখাতে হবে। যথাযথ আদালতে দ্রুত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার হতে হবে। এসব দেখার জন্য এদেশের কোটি কোটি ছাত্র-জনতা, ভুক্তভোগী বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আরও অনেক কাজ আছে। সেগুলোও করার পরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। সে-কাজ বেশ কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ এবং এখনও অনেক দেরি। আমি এ আন্দোলনকে ছাত্র-জনতার 'গণবিপ্লব' বলে অভিহিত করি। গত লেখাতেও তা-ই বলেছিলাম। আইনের কোনো ধারা-উপধারা খোঁজার আগ্রহ আমার কম। গণভোটের আয়োজন করে সংবিধান পরিবর্তন সময়ের দাবি।

এতক্ষণ প্রথম করণীয় কথা বললাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমি একজন সাধারণ মাস্টারসাহেব। আমি কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় পারদর্শী একজন পেশাদার ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্টও বটে, এক পা কবরে। সে-সাথে এদেশের একজন সাধারণ নাগরিক। এদেশের জনসাধারণের টাকায় লেখাপড়া করেছি। জনসাধারণের পক্ষে নিজের মনের কথা প্রকাশের অধিকার আমার আছে। সে অধিকার নিয়েই আরো কিছু কথা বলতে হবে। আমি কোনো দলভুক্ত নই। শিক্ষকতা পেশায় এটা মানাই না।

একটা সৃষ্টিদর্শন তত্ত্ব বলি। মানুষ যত্ন করে উদ্ভিদজগৎ টিকিয়ে রেখেছে নিজস্বার্থে– অক্সিজেন, ফল ও কাঠ পাওয়ার জন্য। অক্সিজেন ও ফল না পেলে জীব বাঁচবে কীভাবে! উদ্ভিদজগৎও নিজে টিকে থাকার জন্য মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছে প্রতিদানে ক্ষুধা মেটানোর সুধা দিয়ে। একে বলে পারস্পরিক টিকে থাকা। উইন-উইন সহাবস্থান, গূঢ়তত্ত্ব। এটা সৃষ্টির পজিটিভ দিক। এ তত্ত্ব ব্যবহারের নেগেটিভ দিকও আছে। পতিত সরকার এ তত্ত্বের নেগেটিভ দিকের আবিষ্কারক। সরকারের প্রতিটা বিভাগ, প্রতিটা পেশার কিছু চিহ্নিত দলবাজ লোক, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, কোনো নির্দিষ্ট জেলাবাসী, পুলিশ বিভাগসহ অগণিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, দপ্তর-পরিদপ্তরে কর্মরত অসংখ্য 'মানব-আপদ', গ্রাম-গঞ্জের সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ,

এই একটা ডকট্রিনের ওপর ভিত্তি করে এই পনেরো বছর চলেছে– ‘যত পারিস দেশ লুটেপুটে খা, শুধু আমার টিকিয়ে রাখার কাজে মত্ত হ, আমার নামে জয়-কীর্তন গা, বেগতিক দেখলে পালিয়ে যা– কোনো বাধা নেই, আজীবন তোদের বাঁচানোর চেষ্টা করে যাবো, তুইও টিকে থাক, আমাকেও টিকিয়ে রাখ।’ একই তত্ত্বের ভিত্তিতে বেনজির গং, ছাগলকাণ্ডের মতিউর রহমান গং, এমপি আনার গংয়ের মতো শত শত গং এদেশে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হয়ে বিশাল অবৈধ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে। পতিত সরকারের নিজের গোষ্ঠীর লোকজনও চৌদ্দপুরুষ চলার মতো কামিয়েছে। পতিত সরকারকেও এরা এতদিন টিকিয়ে রেখেছিল। ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’ উপহার দিয়েছিল কমপক্ষে পনেরো লক্ষ কোটি টাকা বিদেশী ঋণের বিনিময়ে। পতিত সরকার প্রধানের নিজের মুখে শুনেছি, তার পিয়নের চার’শ কোটি টাকার মালিক হবার গল্প।

প্রথমেই বিচার বিভাগকে পুনর্গঠন করতে হবে। বিচারক নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলপুষ্ট বিচার বিভাগের কর্মকর্তা, দলবাজ-দুর্নীতিবাজ আইনজীবী যেন বিচার বিভাগের বিচারক হিসেবে কোনোভাবে ঢুকতে না পারে। পেশাব দিয়ে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে পুত-পবিত্র করার চেষ্টা করাটা কাজের কাজ হয় না। এদেশের পতিত সরকার বিচার বিভাগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। বিচার বিভাগের প্রতিটা চেয়ার-টেবিল, ইট, পদ-পদবি অবৈধ টাকা অবাধে খাওয়ার জন্য বসে থাকতো। বর্তমান মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সরকারকে বিষয়গুলো দেখার অনুরোধ করছি। পুলিশ বিভাগের শুধু পুনর্গঠন নয়, খোল-নলচে বদলের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাহী বিভাগসহ সকল বিভাগ এই পনেরো বছর ধরে শুধুমাত্র দলীয় বিবেচনায় ও আনুগত্য দেখে সাজানো হয়েছে। এর মূলোৎপাটন করতে হবে। ‘আয়নাঘর’, খুন, ক্রসফায়ার, গুমের সাথে জড়িত ও হুকুমদাতাসহ প্রতিটা বিভাগের জড়িত কর্মকর্তাদের প্রথমেই আটক করতে হবে। অতপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৫ পট পরিবর্তনের পর খুন ও গুমের কোনো তালিকা তৈরি হয়নি। এবার কিন্তু খুন, গুম ও বিচার-বহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের তালিকা তৈরি করতেই হবে; ২০১৩ সালের গণহত্যার তালিকাও তৈরি করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে। জাতিসংঘের তদন্ত টিম আসবে শুনলাম। শুধু শেখ হাসিনা ওয়াজেদের বিচার করলে হবে না। তার কুলগোষ্ঠীসহ, বালবাচ্চা, সাঙ্গোপাঙ্গ ও অনুচর-সহচর মিলিয়ে বিশাল অপরাধবাহিনীর অপরাধের বিচার এদেশের বিশেষ আদালতে করতে হবে। বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অনুচরদের পাচারকৃত টাকাসহ ফেরত আনতে হবে।

পতিত সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই কয়েকটা কার্ড পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করে আসছে। সবই আমার নিজ চোখে দেখা। এখনও প্রত্যেক সংকটময় মূহুর্তে তারা এ কার্ডগুলো ব্যবহার করে। এবারও কয়েকটা কার্ড ব্যবহার করেও সফল হয়নি। তারা চতুর বানরের মতো নিজে দই খেয়ে ধাড়ি-ছাগলের মুখে হাত মুছে দেয়, যাতে যত দোষ ধাড়ি-ছাগলের ওপর বর্তায়। নিজেদের লোক দিয়ে গাড়ি পোড়াবে, বিল্ডিংয়ে আগুন দেবে, পূজার মূর্তি ভাঙবে, শহিদমিনার ভাঙবে, হিন্দুদের সম্পদ ও জমি দখল করে ভারতে তাড়াবে; দোষ চাপাবে বিরোধী পক্ষের ও জামাতিদের ঘাড়ে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সংখ্যালঘু নির্যাতন কার্ড। এতে তারা বারবার সফল হয়। সংখ্যালঘুরাও ট্রেইনিংপ্রাপ্ত। তারা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হতে জানে। তারা কখনোই এদেশের নাগরিক অধিকার দাবি করতে চায় না, যদিও আমরা তাদের নাগরিক অধিকার দিতে চাই। আরেকটা হচ্ছে পাইকারি হারে 'রাজাকার' বলার প্রচলন এবং কথায় কথায় পাকিস্তানে চলে যাবার নুসকা বাতলানো। সব গোলোযোগেই পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতার গন্ধ খোঁজা। এ গণআন্দোলনেও প্রথম দিকে আমেরিকাকে দোষারোপ করলেও ক্রমশ পাকিস্তানকে দোষারোপের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। শেষটা হলো 'জঙ্গি দমন' কার্ড। পতিত সরকারের লোকজন ছাড়া যেন সবাই জঙ্গি। কখনো কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে রিহার্সলের ছলে জঙ্গি নাটক মঞ্চস্থ করার কথাও শোনা গেছে। বিদেশীদের বুঝ দেওয়ার জন্য এ কার্ডটা বড়ই ধন্বন্তরি ওষুধ।

এবারের কাজ আগে অপরাধীদের ন্যায্য বিচার, তারপর নষ্ট-পচা ও বিষাক্ত সবকিছুকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া, আবার নতুন করে সুশিক্ষিত মানুষ, সমাজ ও দেশ গড়া। 'ওগো সাথী এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে, ধূ-ধূ মরুময় মাঠ, প্রখর সূর্য পেরিয়ে তারপর সবুজের ছায়া, বনাঞ্চল'।

(প্রকাশ: ২১ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা

সেই ছোটবেলা থেকে প্রবাদবাক্যটা শুনে আসছি, 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'– তা সে সিঁদেল চোর হোক বা জাহাজ চোর হোক। আবার 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে-কানে, চরিতে না-যেও বাবা ফলের বাগানে', কথাটাও শুনেছি। ছাগল কি ফলের চারা-গাছের কচি পাতা খাওয়া বন্ধ করে দেবে? কী করণীয়? আজীবন কি ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে যাবেন, নাকি ছাগলের স্বভাবকে পরিবর্তন করবেন? কোনোটাতেই কাজ হবে না; প্রয়োজনে বেড়া দিতে হবে। আইন তৈরি করতে হবে এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ করতে হবে। চোর ও ছাগল কি আইন তৈরি করে তাদের হাত ও মুখ বেঁধে রাখতে চাইবে? কখনও না, 'যার যে স্বভাব, যায় না সে ভাব'। কাকে দিয়ে বিধানটা পরিবর্তন করবেন? অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে একাজ করবে। বিধান পরিবর্তনের এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। আগে আইনশৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে ঢেলে সাজানো। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অতপর গণভোটের আয়োজন, সংবিধান পরিবর্তন, বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতা হস্তান্তর। আমার এ লেখা যথাসময়ের আগে হচ্ছে এই কারণে যে, বিষয়টা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা, মতামত রয়ে গেছে। তাদের লেখা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর পত্রিকায় প্রকাশিত পক্ষে-বিপক্ষের সব লেখা সংরক্ষিত করে কমিটির সামনে বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারে।

জানি বিধান পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত লেখা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমি দফাগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। বিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আবশ্যক। ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য লেখা ছিল– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। এগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে সাথে আরও দুটো মূলনীতিকে যোগ করা যায়– ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসতা এবং গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি ধর্ম না-বোধক শব্দ, উঠিয়ে দেওয়াই ভালো। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক, সব ধর্মই সমান। এরপর সরকার ও রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তনই মূল কাজ।

সরকার কাঠামোতে রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতাসীন সরকারি দল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সুযোগটাই রাজনৈতিক দল নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলই এদেশে সব অন্যায়ের সুতিকাগার। সব রাজনৈতিক দলকে বিধান পরিবর্তন করে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। ট্রায়াল এন্ড এরোর অনেক বছর ধরে করলাম, ওদিকে না যাওয়াই ভালো। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবে না জানি। প্রতিটা দলে ভালো স্বভাবের লোকের তুলনায়

খারাপ প্রকৃতির নেতা-কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক। মানুষের মন তো কোনো যন্ত্রের ইঞ্জিন নয় যে, ইচ্ছে করলেই বদল করে ফেলা যাবে। যে মানুষটা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য একবার হারিয়েছে, তা কোনোদিনই আর ফিরে পাবে না। বিষয়টা সাইকোলজিক্যাল। এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকবে বটে কিন্তু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যপদ নিতে হবে। যে কোনো কর্মী বা নেতার অন্যায় কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট দলকে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু নামমাত্র বহিষ্কার করা এবং মনে মনে আবার দলীয় কার্যক্রম ও যত অপকর্ম তাকে দিয়ে সমাধা করা বন্ধ করতে হবে। নইলে ওই দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার তো আমরা মনোযোগ দিয়ে বহু বছর ধরে দেখলাম। এটাও এনায়কতন্ত্রের নামান্তর। দেশের যত অপকর্মের হোতা, চোরাকারবারি, দুর্নীতিবাজ, টাকার বিনিময়ে সংসদের দলীয় সদস্যপদ কেনা, তার নির্বাচিত এলাকার মধ্যমণি হয়ে সব সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের ভাগবাঁটোয়ারা করা, এলাকার বিভিন্ন পক্ষ ও সমিতি, যেমন– দোকান মালিক সমিতি, ইটভাটা মালিক সমিতি, মুরগি খামার সমিতি, নেশা প্রতিরোধ সমিতি ইত্যাদি থেকে অবৈধ টাকা রোজগার করার ফাঁদ তারা তৈরি করেন। আমরা জানি, প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। কাজ পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য প্রতিটা বিভাগে কর্মকর্তা আছেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় অর্থের বণ্টন ও উন্নয়ন কাজে অর্থের লেনদেন এবং অর্থ ও অনুদান সংশ্লিষ্ট ভাগবাঁটোয়ারার কোনো বিষয় ও ক্ষমতা থেকে সংশ্লিষ্ট এমপিকে দূরে রাখার বিধান থাকবে। এতে সরকারি টাকায় নিজের দলের লোকজন প্রতিপালন ও নিজের পকেট ভারী করার চলমান বাস্তবতার অবসান হবে। ফলে এমপি হওয়াটা কোনো লাভজনক পেশা হবে না। অর্থসংকট অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাজনীতিতে আসবেন। দশ কোটি টাকা ব্যয়ে দলীয় নোমিনেশন কেনা, আরো বিশ কোটি খরচ করে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করা এবং পাশ করে হাজার কোটি টাকা কামানো ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত পদ্ধতি পরিহার করে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ পদ্ধতির ব্যবহার ও ভোটের মাধ্যমে যোগ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনেক সহজ। তাতে সমাজের কালা জাহাঙ্গীর, মুরগি মিলন গং যেমন এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, আবার এমপি আনার গংও এমপি হতে পারবে না। রাষ্ট্রপতিসহ প্রত্যেক এমপি, এলাকার নেতা-কর্মীকে কৃতকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট দল ও রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে ও দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এছাড়া ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য

রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী হচ্ছে কিনা রাষ্ট্র তা তদারকি করবে। রাষ্ট্রীয় প্রধান যদি একজন হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের অনুগত কাউকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ফেলবেন। তিনি জনগণের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ দেখার পরিবর্তে দলীয় কল্যাণ বেশি দেখবেন ও ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবেন। এটা পদের জন্য মর্যাদাহানিকরও বটে। যে কোনো সময় ক্ষমতাসীন দলের মনমতো না চলতে পারলেই পদচ্যুতি ঘটে। এর আগেও আমরা এদেশে এটা দেখেছি।

বিকল্পভাবে রাষ্ট্রীয় প্রধান একজন হবেন না, বরং একটা টিম এ দায়িত্ব পালন করবে। দলনিরপেক্ষ দেশবরেণ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে এ টিম গঠিত হবে। টিমের একজন প্রধান থাকবেন। এ টিমের নাম হবে ‘সুপ্রিম কাউন্সিল’। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ দেখভালের জন্য এ টিম কাজ করবে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা যায়: সরকারের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের আচর-আচরণ, রাজনৈতিক দলের জনসেবা ও দেশসেবার মানসিকতা ‘সুপ্রিম কাউন্সিল’ পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। সুপ্রিম কাউন্সিলেরও ক্ষমতার পরিধি, ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা সংবিধানে বর্ণিত থাকবে। কাউন্সিলরের সংখ্যা ১৫ থেকে ২১ জন হতে পারে। সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী হবেন ‘প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর’। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর হওয়ায় কাউন্সিলের মেয়াদ ৪ বছর বা ৬ বছর হবে।

সুপ্রিম কাউন্সিল গঠনের জন্য বিভিন্ন অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠনের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমপক্ষে দুই লাখ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে সুপ্রিম কাউন্সিল গঠিত হবে। বিধানে নির্বাচকমণ্ডলী ও কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যতার উল্লেখ থাকবে। তাদের সৎ ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। কাউন্সিলে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২/৩ ভাগ কাউন্সিলর এবং সাধারণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সম্মতির প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বিষয়গুলো বিধানে উল্লেখ থাকবে। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্বাচিত সরকার ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা বিধানে উল্লেখ থাকবে। সেনাবাহিনী, দুদক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কামিশনসহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা সুপ্রিম কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তা ক্ষমতাসীন রাজনীতির তোষামোদকারী হয়ে পদোন্নতি, অবৈধ আর্থিক সুবিধা, অতিরিক্ত

ক্ষমতা ও দুর্নীতি করে যারপরনাই লাভবান হচ্ছে। বিষয়টি সরকার ও সুপ্রিম কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণের সময় বিবেচনায় আনতে হবে। দেশে নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করবে। সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করবে। সুপ্রিম কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে নির্বাচনকালীন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সালিশ-দরবারসহ প্রতিটা বিষয়ে দলবাজি ও টাকার খেলা উম্মুক্তভাবে চলছে। স্থানীয় সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না। এদেশের কোনো নাগরিককে রাজনীতি করতে হলে সাধারণ সমাজে এসে রাজনীতি করতে হবে। নইলে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্যে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কাজকর্মের পরিবেশ যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম ও সেবা দানের পরিবর্তে রাজনৈতিক আনুগত্য ও দলবাজি মূখ্য হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আনুগত্যের মাধ্যমে পদ ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার উম্মুক্ত ব্যবসা চলছে। এখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত দেশের সুষ্ঠু পরিবেশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি আইন করে বন্ধ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের দেশ-সচেতন করে তুলতে হলে প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা অরাজনৈতিক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন থাকবে। তারা ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলবে। এছাড়া প্রতিটা ফ্যাকাল্টিতে ছাত্রছাত্রীদের কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার এ্যাকটিভিটির জন্য একাধিক ক্লাব বা ফোরাম থাকতে পারে। দলীয় লেজুড়বৃত্তি, রামদা-চাপাতির ট্রেইনিং, চাঁদা আদায় করে ধনী হওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান কাজ সময় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণা করা। কোনো রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রধানের মিটিংয়ে সামনের সারিতে সোফায় বসে গালে হাত দিয়ে নেতা-নেত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখের ভাষায় বোঝানো যে, 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়'; কোনো উপাচার্য বা শিক্ষাবিদের এটা মানায় না। এ ধরনের কাজ-কারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকরও বটে।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা-পরিবেশের উন্নয়ন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ ইত্যাদি করতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ব্যর্থ হয়েছে। অথচ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষা ছাড়া এদেশের উন্নতি ও বিশ্ব-দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কল্পনাই করা যায় না। অথচ এই জনবল দিয়েই তা সম্ভব। প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিক নির্দলীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। এজন্য আলাদাভাবে সাংবিধানিক আইন করে আলাদাভাবে একটা স্থায়ী 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' তৈরি করা, যার কার্যাবলি ও কর্মের আওতা সংবিধানেই লেখা থাকবে। অতি সংক্ষেপে বললে এর কাজ হবে: পুরো শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ, কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন। দেশের সামগ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা এর আওতাধীন হবে। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর কাজের বিস্তৃতি হবে। এ কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক গড়তে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাইসাপেক্ষে বিদ্যমান শিক্ষকদের মধ্য থেকে অযোগ্য শিক্ষকদের বেছে স্বেচ্ছা অবসরেও পাঠাতে পারবে। কারণ একজন অযোগ্য শিক্ষক মানে কমপক্ষে ত্রিশ বছর ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি। ভালো শিক্ষক আনার জন্য প্রয়োজনে আলাদা পে-স্কেল দেওয়ার সুপারিশও করা যাবে। কওমি মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানো জরুরি। এজন্য প্রথমেই এদেশের সংস্কৃতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মূল্যবোধ, সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে সদ্য প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি রিভিউ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, বেশ কিছু শ্রেণির টেক্সট, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় দশম শেণি পর্যন্ত 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা (জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা) চালুর কোনো বিকল্প নেই। বিধান পরিবর্তনের আরো অনেক কথা বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও গবেষক;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশপ্রেমী মানুষ নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারেন না

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বয়সে একেবারে অবুঝ ছিলাম না। যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে রিলিফ আসতো। ভাগে একবার এক-ব্যাটারির ছোট্ট একটা রেডিও পেয়েছিলাম। রেডিওটা ছিল আমার চলার সাথী। সংবাদসহ গানও শুনতাম। সবগুলোই জীবনের গান। ফেরদৌসী রহমানের একটা গান এরকম: 'ও প্রাণ সজনি কার আগে কব দুঃখের কথা, মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায় মোর আঙ্গিনা দিয়ে হাঁটা'। আসলেই কোনো নারী কি চায় তার স্বামী অন্য কোনো বাড়ির মহিলার ঘরে যাক? এটা সহ্য করাও কি সম্ভব? তেমনি কোনো দেশপ্রেমী নাগরিক কি চায়, তার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অন্য কোনো দেশের স্বার্থে ও খবরদারিতে চলুক? দেশের কর্তৃত্ব নিয়ে অন্য কোনো দেশ তাবেদারি করুক? কোনো দল অন্য দেশের চরণতলে দেশের সকল স্বার্থ বিলিয়ে দিক? দেশাত্ববোধসম্পন্ন কোনো মানুষ এটা মেনে নিতে পারে কি?

একই প্রশ্ন উঠেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা প্রায় মিছিলে যেতাম। আমার এক পরিচিতজন, মুরব্বি মানুষ, মুসলিমলীগের সাপোর্টার। উনি বলতেন, 'তোমাদের আন্দোলনে আমি বাধা দেবো না। তবে ভারত তার স্বার্থে তোমাদের ভাগ করে দিচ্ছে। তোমরা স্বাধীন হলে ভারত লাভবান হবে বেশি। ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জন করলে আজীবন ভারত তোমাদের চুষে খাবে, খবরদারি করবে, দেশ আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এদেশে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করবে। দেশটা ভারতের হাতে চলে যাবে। হিন্দুত্ববাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা। পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের শোষণ করছে মানি। এর থেকেও বেশি শোষণের ধাক্কায় পড়তে হবে। তোমরা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে ইতিহাসটা একটু পড়ে দেখো।' আমরা তার কথায় কোনোদিন কান দিতাম না। চিন্তাধারা ছিল, 'আগে স্বাধীনতা চাই'। এদেশের নিরানব্বই শতাংশ মানুষের সীমাহীন ত্যাগে এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলো।

আমাদের যারা মিছিলে নিয়ে যেত, স্বাধীনতার পর থেকেই তারা লুটপাট শুরু করে দিলো। আমরা হতবাক। স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতার ভুমিকা, চিন্তাধারা ও কর্ম যুদ্ধের আগে ও পরে ব্যাপক পরিবর্তন হলো। দেশ-ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হয়ে অসহায় অবস্থায় বলা শুরু করে দিলেন, 'আমি কাকে কী বলবো? ওরা সবাই তো আমার'। 'মানুষ পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি'। 'আমার কম্বলটা কই'? 'চাটার দল সব চেটেই শেষ করে ফেললো'। তার অসহায়ত্ব আমাকে কষ্ট

দিত। তিনি দেশের বাম আন্দোলন, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দমন করতে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদী মুজিববাহিনীর মাধ্যমে হাজার হাজার বিচার বহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন শুরু করলেন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি হলো। ঢাকার চার দেওয়ালের মধ্যে বসে তৈরিকৃত নীতিমালা গ্রামে-গঞ্জে ভিন্নভাবে প্রয়োগ শুরু হলো। গ্রাম-গঞ্জের জমি ও মাতব্বরি নিয়ে বিবাদ, শত্রুতা– শত শত নির্দোষ মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে নিখোঁজ হলো, অসংখ্য লাশ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। বড় নেতা বললেন, 'আমি লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দেবো'। ঝড় উঠলে শুধু পাকা আমই পড়ে না, অনেক কাঁচা আমও ঝরে পড়ে। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, নির্যাতন, অবর্ণনীয় অত্যাচার ও গুমের শিকার হওয়া কত মানুষের অসহায় মা-বাপ, ভাই-বোনের বুকফাটা কান্না ও আহাজারি আমি নিজে দেখেছি, আজও তা চোখে ভাসে। বিধাতা হয়তো তাদের আহাজারি ও অভিশাপ শুনেছিলেন। নতুন প্রজন্ম এ অবর্ণনীয় অবস্থা সম্পূর্ণ বেওয়াকিবহাল। শেখ হাসিনা ওয়াজেদের এই পনেরো বছরের দুঃশাসন, গায়েবি মামলা, বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ, গুম, আয়নাঘরের নির্যাতন, অসহায় মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ, প্রকাশ্য দুর্নীতি, লুটতরাজ পঁচাত্তরের আগের শাসনামলকেও ছাড়িয়ে গেছে; আমার মতো আধমরা লোকের বারবার অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনের অজান্তেই তুলনা চলে আসে।

কষ্ট লাগে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সব কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত আসে স্বাধীনতার 'অকৃত্রিম বন্ধু' ভারত থেকে। আশ্রিত রাষ্ট্র করার জন্যই তো তারা স্বাধীনতা অর্জনে সহযোগিতা করেছিল।

আজীবন গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রকে হত্যা করে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' তৈরি করলেন 'বাকশাল'। তিনি হয়ে গেলেন সমাজতন্ত্রী কমরেডদের দোসর; এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী একনায়কতন্ত্রের জনক। মিল, কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়ন্ত্রণহীন দলীয় লোকজনকে নিয়োগ দেওয়াতে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলোতে বেওয়ারিশ লুঠপাট শুরু হয়ে গেল। শত শত কোটি টাকা লোকসানের বোঝা জনসাধারণের মাথায় চাপলো। কর্পোরেশনগুলোর লোকসানের ঘানি জনসাধারণ এখনও অনেকটা টেনে চলেছে। স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতার রাজত্বে দেশ লুটপাট, নিজের জ্ঞাতিগোত্র, দলীয় লোকজন যে যেখানে ছিলেন, টাকা কামানোর মচ্ছবে যোগ দিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের রাজত্বকালে তার চেয়েও বেশি হতে নিজ চোখে দেখলাম। '৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে 'মহান নেতা' নিহত হয়ে নিজের এবং দলীয় অপকর্মের খেসারত নিজে

দিলেন। ঐ দিন আমার মা-কে কাঁদতে দেখেছিলাম। অধিকাংশ লোক মিষ্টি বিতরণ করে বিজয় উল্লাস করেছিল। আমি বরাবরই নীরব পর্যবেক্ষক। কোনো দলে আজও যোগ দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এ দেশ শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে যত রসাতলে যাবে, পার্শ্ববর্তী দেশের তত লাভ। নিজ স্বার্থ আদায় করা ও এদেশকে দমিয়ে রাখা তত সহজ হবে। এটা এদেশের দেশপ্রিয় মানুষকে বুঝতে হবে। দেশে দেশে পরাশক্তি তার অনুগত পুতুল বসিয়ে দেশ দখল করে, যেমন– আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বসিয়েছিল বাবরাক কারমালকে, পরে আমেরিকা ২০ বছর আরেক পুতুলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী সিকিম নামের একটা স্বাধীন রাজ্যে ভারত লেন্দুপ দর্জিকে দিয়ে পুতুল সরকার তৈরি করেছিল। পরে ভারত লেন্দুপ দর্জির মাধমে রাজ্যটিকে একীভূত করে নেয়। আমাদের দেশে 'লেন্দুপ দর্জি'র ভূমিকায় কোনো কোনো দল প্রকাশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা অজানা কারণে জেগে ঘুমাচ্ছি। তবে এ যুগে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সহজে কেউ দেশ দখল করে না। দেশ দখল করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে– লুটপাট ও স্বার্থ আদায় করে, নিজের গোপন বাহিনী দিয়ে সে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, গণতন্ত্রহীন লুটেরা আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার বসিয়ে, নিজের দেশের লোককে পুতুল সরকারের দেশে চাকরি ও ব্যবসা দিয়ে। ভারত তা দীর্ঘ বছর এদেশের জনসাধারণের মুখের দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থে ক্রমে ক্রমে সবকিছুই আদায় করে নিচ্ছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো দেশপ্রেমী ও মুক্তিকামী মানুষ এটা মেনে নিতে পারে কি-না? মানুষ হারায় বাংলাদেশে, খুঁজে পাওয়া যায় ভারতে। আমরা বর্ডার পার হতে গেলে কাপড়চোপড় পরীক্ষা করার নামে প্রায় বেআবরু করে ফেলে। অথচ ভূতে যখন চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়, ভূতের পাখায় বসিয়ে কখন বর্ডার পার করে ভূত ও ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। এতে এদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রত্যেক সচেতন মানুষের সংশয় জাগে। আমার খুব ইচ্ছে করে সুখরঞ্জন বালি, বিএনপি-র সালাহউদ্দিন সাহেব ও জনাব ফরহাদ মাজহারের সাথে নিরিবিলি বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করতে। অনেকেই তো চিরতরে গুম হয়ে গেছেন, নইলে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে পারলে ভালো হতো।

এখন বোঝা যাচ্ছে দেশের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ পতিত সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে গণতন্ত্র ডাকাতি, ব্যাংক লুটপাট, সর্বত্র দলীয় লোকের দুর্নীতির উৎসব, সরকারি কোষাগার লুট, অর্থ পাচার, দমন-পীড়ন, হত্যা-গুম, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চোরাকারবারিদের রাজনীতিতে দাপট, গণহত্যা, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের যে

যেখানে আছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ মেরে টাকার পাহাড় গড়া, গায়েবি মামলা, যথেচ্ছ নির্জলা মিথ্যাচার আদৌ ভালো চোখে দেখেনি। পত্রিকায় অনেকবার পড়েছি: নিজের মেয়েকে নিজে হত্যা করে প্রতিপক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে খুনের মামলা করতে। পতিত সরকারকেও সেরকম কাজ নিজ হাতে করতে দেখেছি, যেমন– গাড়ি পোড়ানো, পূজার ঘর পোড়ানো, শহিদমিনার ভাংচুর, বাংলাদেশের লোকজনকে 'জঙ্গি' নাটক করে বিশ্ববাসীর কাছে 'জঙ্গি' নামে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। কোনোটাই ঠিকমতো তদন্ত কোনোদিনই হয় না।

কোনো কিছুই একবারে বিস্ফোরিত হয় না। পেটে গ্যাস জমতে জমতে অতিরিক্ত জমে গেলে পেট বিস্ফোরিত হয়। এগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। সামান্য কোটা বাতিলের আন্দোলন পরিণত হলো সরকার পতনের আন্দোলনে; পতিত সরকারের কুপো কাত হয়ে গেলো, যা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বিরোধী দল শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ বছরে জমে থাকা ক্ষোভ একবারে বিস্ফোরিত হলো। পুতুল সরকারের প্রভুও কৌশলগত কারণে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। ভবিষ্যত রাষ্ট্র পরিচালকদেরও এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।

কোনো দেশকে শোষণ ও ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই সে-দশের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি ধ্বংস করতে হয়, জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন ও প্রতিহিংসার বীজ বুনে দিতে হয়। এদিক থেকে পতিত পুতুল সরকার প্রভুর সহায়তায় সার্থকতা দেখাতে পেরেছে।

আমেরিকা ও পশ্চিমা-বিশ্বকে বাংলাদেশে 'জঙ্গি' নাটকের জুজুর ভয় দেখিয়ে এদেশের ওপর ভারতের অবৈধ কর্তৃত্ব, গণতন্ত্র ধ্বংস ও পুতুল সরকারের যত অনৈতিক কাজের সম্মতি আদায় করতে পুতুল সরকারকে সাথে নিয়ে ভারত অক্লান্তভাবে দির্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশের ৯০ শতাংশ নির্জীব মুসলমান যাবে কোথায়! অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে মীর জাফর আলী খান ও লেন্দুপ দর্জি মার্কা লোকজন বিদেশী প্রভুর প্রকাশ্য দোসর। মানুষ তাদের ভোট দিতে চায় না বলে দিনের ভোট রাতে করে কিংবা ডামি নির্বাচন করেও গুরুর আশির্বাদে ক্ষমতায় টিকে থাকে। সমর্থন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুটকৌশল চালানোর জন্য প্রভু সদা পাশে দণ্ডায়মান। শেখ হাসিনা ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকা, দেশ লুটপাট করে খাওয়া ও প্রভুর পদতলে পুজার অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে (নিজ-দলীয় লোক বাদে) 'জঙ্গি' বলে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পায়, রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে। প্রভু ভারতও বয়াতির একই সুরে কোরাস ধরেছে।

ভারত ও বাংলাদেশ পাশাপাশি দুটো স্বাধীন দেশ। উইন উইন অবস্থা বজায় রেখে কি ভারত আমাদের সাথে চলতে পারতো না? আমরা কখনো ভারতকে আক্রমণ বা ক্ষতি করতে চাইনে। আমরা ইচ্ছে করলে চীনকে সাথে নিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টারকে সাহায্য করে ভারত বিভক্ত করার চেষ্টা করতে পারতাম। আমরা তো সে-কাজ করিনে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুয়ান্নটা অভিন্ন নদীর অবস্থা কী? দেশবাসী প্রতিবছর কখনো খরা, কখনো বন্যায় ভুগছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে তাদের দেশে বসবাসরত কয়েকজন লোককে উসকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেইনিং দিয়ে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এদেশকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়। এটা কি 'প্রতিবেশী বন্ধুর' কর্তব্য? 'বন্ধুর' হাজার 'গুণের' কথা বলবো কয়টা! সবাই জানে, ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েমের খায়েশ, প্রতিহিংসা ও একতরফা স্বার্থপর মানসিকতার জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের সাথেই তার সম্পর্ক ভালো নয়। যেহেতু তাদের পোষা গোলাম নিজ দোষে সে-দেশেই গিয়ে পালিয়েছে এবং সেখানে বসে এদেশকে আবারো অস্থির করে তুলতে চাইছে। দুদেশের সম্পর্ক এত সহজে ভালো হবে বলে মনে হয় না। ওদের কখনো মুখে মধু, মনে সবসময় বিষ। বিশ্বের কোনো পলাতক একনায়ক রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পায়নি। ভারতকে 'মুখে মধু পেটে বিষ' নিয়ে এগিয়ে না এসে, মন থেকে ভুল ও দোষগুলো শুধরে এদেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চাইলে এদেশের কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। তাদের মানসিকতার বদলের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনা ওয়াজেদসহ সকল অপরাধীকে আগে এদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। শেখ হাসিনার পুত্র জয়কে ভারতের মাধ্যমে এদেশের সরকারের উপর যে কোনো চাপ বন্ধ করতে হবে। যে কোনো অপপ্রচারও বন্ধ করতে হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এদেশে অত্যাচারিত হচ্ছে, এই ভূয়া অভিযোগের অজুহাত বন্ধ করতে হবে। হিন্দুধর্মের কেউ পতিত সরকারের সাথে মিলে কোনো অপরাধ করে থাকলে, তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে দিতে হবে। ভারত সরকার সে-দেশের মুসলমানদের ওপর যেভাবে অবিরাম নির্যাতন করে যাচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বলতে কেউ নেই। সবাই এদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রের কাছে সবার অধিকার সমান। ভারত সরকার নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখলেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে। বরং এদেশে বাস করা ভারতের বংশাবতংস-সেবাদাস কোনো দল হিন্দু সম্পদায়ের ওপর হামলা

করে, ঘর পুড়িয়ে দিয়ে দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। এগুলো করে তারা এদেশের মানুষের ললাটে 'জঙ্গিবাদের' কলঙ্ক লেপন করতে চায়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রছাত্রী আছে, যে কোনো সময় আমাদের কথা হচ্ছে। তাদের প্রতি নির্যাতন হচ্ছে কথাটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মনগড়া এবং সম্পূর্ণ ভূয়া। আল্লাহ মিথ্যাচার ও দুর্নীতিবাজ থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

(২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় অনেক কাটছাঁট করে তাদের সুবিধানুযায়ী পরিবর্তিত আকারে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে; মূল লেখাটি এখানে প্রকাশ করলাম। এদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মকে অতীতের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা করার জন্য এ লেখা; কারো প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত নয়।)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ; সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আগে নিজের মনুষ্যত্ববোধের পুনর্জাগরণ হতে হবে

গত ২৫ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া অতি প্রত্যাশিত ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। ভাষণে তিনি বিভিন্ন বিষয় পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধু নির্বাচনের রোডম্যাপ তিনি রাজনৈতিক বিষয় বলে এড়িয়ে গেছেন। এতে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল মনোকষ্টে ভুগতে পারে। দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রোডম্যাপ দেওয়ার সময় এখনো আসেনি বলে আমার বিশ্বাস। আমি খোলামেলা কথায় বিশ্বাসী। গত ২৮ আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত লেখাতেও আমি লিখেছি যে, 'আগে আইনশৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা; সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে ঢেলে সাজানো; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অতপর গণভোটের আয়োজন, সংবিধান পরিবর্তন, বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতা হস্তান্তর।' এটা আমার প্রত্যাশা। সংবিধান পরিবর্তনের ধাঁচ কেমন হতে পারে, অতি সংক্ষেপে তার একটা ধারণাও ওই লেখাতে দিয়েছিলাম। অতীতে ভালো-মন্দ নানা ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখেছি। শুধু একবারই দেখেছি এ ধরনের সরকারকে দু-বছর ক্ষমতায় থাকতে। কিন্তু কাজের কাজ করতে তেমন দেখিনি, একচোখা কাজ-কর্ম দেখেছি। প্রথম তিনবার মাত্র তিন মাস করে সময় দেওয়া হয়েছিল। তাই এবার আমরা 'রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরির খেলা' যেমন দেখতে চাই না, তেমনি 'পিলো পাচিং খেলা'ও দেখতে চাই না। আমরা রাষ্ট্রের নামমাত্র মেরামতও দেখতে চাই না। চাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেরামত বা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো বা ব্যাপক সংস্কার (মেজর অভারহোলিং), দেশ ধ্বংসকারীদের সুষ্ঠু বিচার। তাতে কোনো রাজনৈতিক দল টিকে থাক বা না থাক।

স্বাধীনতার তেপ্পানো বছর পেরিয়ে যেতে দেখছি; কী দেখছি? অন্যায়, দুর্নীতি, কোষাগার লুটপাট, ডাহা মিথ্যাচারিতা, নির্ভেজাল প্রতারণা, গুম-খুন, দেশ বিক্রির পায়তারা ইত্যাদিসহ শতেক অপকর্ম। আমরা কোনো স্বাধীন দেশের মানুষ, না পরগাছা? এসব ক্ষেত্রে কোনো দল এ পর্যন্ত শতকরা ২০ ভাগ, কেউ ৪০ ভাগ, কেউবা ১২০ ভাগ পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। এদেশের সব রাজনৈতিক দলই, কেউবা একাকী, কেউবা জোটবদ্ধভাবে দেশ পরিচালনা করেছে। আমরা সবারই কর্মকাণ্ড অতি মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছি। যে দেশে তেপ্পান্ন বছর রাজনীতিবিদরা দেশ চালালো, মাত্র কয়েকটা বছর অরাজনৈতিক টিম দেশ চালালে অসুবিধা কোথায়? এদেশ তো কেউ রাজনীতিবিদদের কাছে লিজ দেয়নি। রাজনীতির কোনো বাইবেলেও লেখা নেই, একমাত্র তারাই দেশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হবেন। দেশে সবারই সমান অধিকার। সাধারণ নাগরিকরাই রাজনীতিকদের দেশ

চালাতে দেয়। মানুষের জন্য সংবিধান, না সংবিধানের জন্য মানুষ? কোনো দল যখন মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে, যাকে-তাকে যখন-তখন বিনা সমনে উঠিয়ে নিয়ে গুম কিংবা হত্যা করে, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তখন আপনাদের আইনের ধারা কোথায় থাকে? বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র চালানোর কোনো আইন না থাকলে নতুন আইন তৈরি করে নেওয়া যাবে।

এবারের গণ-আন্দোলনকে অনেকেই বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করেছেন। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এটা এদেশের ছাত্র-জনতার বিপ্লব। অনেককে বিভিন্ন মিডিয়ায় এসে অতীতের রুশবিপ্লব, ফরাসিবিপ্লব, ইরানের বিপ্লবসহ বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি বর্ণনা করতে শুনছি। আমার খোলা কথা হলো, কোনো একটা বিপ্লবের সাথে অন্য বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ও মিল থাকার কথা নয়। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সময় ভিন্ন, ঘটনাও ভিন্ন। বাম-ঘরানার লোকজন তাদের মুখস্ত লেখাপড়া দিয়ে অতীতের বিপ্লবের সাথে ফর্মুলায় ফেলে সব বিপ্লবকে মেলাতে অভ্যস্ত। এদেশের এবারের ছাত্র-জনতার বিপ্লব ভিন্নধর্মী হতেই পারে। তবে এটা গণমানুষের বিপ্লব। আমি পিছনের দিকে তাকাতে চাইনে; তাকালে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাকাতে চাই।

আগস্টের ৫ তারিখে কি ঘটেছে, তারচেয়ে পতিত সরকার কি ঘটাতে চাচ্ছিল, সেটা একবার ভেবে দেখুন। গায়ের লোম শিউরে উঠবে। মানুষ কত নির্মম, লোভী, বেপরোয়া ও পাষণ্ড হলে রক্তের এমন হোলিখেলা খেলতে পারে ও আরো খেলার জন্য উন্মাদের মতো মানুষ হত্যার অনুমতি দিতে পারে। শুধু সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সুস্থ কর্মকর্তা (সবাই নয়) সেই ব্যাপক গণহত্যা থেকে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করলো। এজন্য আমি খোদাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেভাবেই পতিত সরকার বিগত ষোলো বছর ধরে পুলিশ, র‍্যাব, ছাত্রলীগ, ডিজিএফআইকে গড়ে তুলেছে। বিগত ষোলো বছরে যেসব ভাই, বোন ও মায়ের বুক খালি হয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে অবস্থাটা একবার দেখুন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করুন। পারলে ডিজিএফআই, র‍্যাব ও ডিবির তৈরি অন্ধকার যমপুরী ও 'আয়নাঘরগুলো' একবার নিজ চোখে দেখে আসুন। কতশত মানুষের কঙ্কাল নদীর ধারে, ধানক্ষেতে, বনবাদাড়ে পড়ে থেকে শেয়াল-কুকুরে খেয়েছে, বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় সরজমিন রিপোর্টে তা উঠে এসেছে। মাইক্রো বাসে সাদা পোষাকে কোনো জলজ্যান্ত তরুণকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেই তার কোনো হদিস আর নেই। কারো কিছু বলারও নেই। কত অসহায়, নির্দোষ মানুষের অস্ফুট কান্না ও অভিশাপের ধ্বনি সেখানকার বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে; কেউবা চিরতরে হারিয়ে

গেছে। আমরা যেহেতু মানুষের খাতায় নাম লিখিয়েছি, উপলব্ধি-শক্তি আছে, নিশ্চয়ই সে করুণ অবস্থা আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। এসব কি কখনো ভেবে দেখেছেন? কৃতকর্মের ভাগিদারকে কেউ হয়তো নিম্নস্তরের হিংস্র বন্যপ্রাণীর সাথে তুলনা করবেন। এগুলো কাদের হুকুমে হয়েছিল? দেশটা একটা বুনো সমাজে পরিণত হয়েছিল।

কেউ কেউ এদেরকে আবার এদেশে ফিরিয়ে আনতে চান, রাজনীতির অধিকার দিতে চান। আমি আপনাদের রুচির তারিফ করি। আপনার ভাই, সন্তান কিংবা বাপের এমন দশা হলে নিশ্চয়ই ব্যথাটা মন দিয়ে অনুভব করতেন। বাঙালি আবেগপ্রবণ, হুজুগে ও আত্মবিস্মৃত জাতি। এর ওপর রাজনৈতিক ও সামাজিক অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুমন্ত্রণা, বিরূপ পরিবেশ এদের আত্মোপলব্ধি ও মানবতাবোধকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। এদের পূর্বানুমান করা খুব কঠিন। আমি এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সেই স্বাধীনতার পর থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছি। অনেকের আচর-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, স্বার্থান্ধতা ও কর্ম দেখতে দেখতে মনে যারপরনাই ঘৃণা জন্মেছে। মনে হয় স্বাধীনতায় আমরা চেয়েছিলাম কী, আর পেলাম কী! ‘বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে’ অবস্থা। দেখে দেখে সহ্য করতে না পেরে অগত্যা কলম ধরেছি। এদেশে রাজনীতি করার জন্য নয়। কোনো উচ্ছিষ্টভোগী হবার জন্যও নয়। অভিজ্ঞতাকে শেয়ার করার জন্য। কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করার জন্য। আমি জানি আমার এ চাঁচাছোলা কথা অনেকের গা-জ্বালা করে, তারপরও লিখি। আমার বিশ্বাস, আমি কোনো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা লিখিনে।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আশা করি তিনি নিরাশ করবেন না। দেশে আইনশৃঙ্খলা আগে ফিরিয়ে আনতে হবে। পতিত দল বিভিন্নভাবে সরকারকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চেষ্টা করবে। ছাত্রছাত্রীদের ও সাধারণ মানুষের সেজন্য অতন্দ্র পাহারায় রাখতে হবে। রাঘব-বোয়াল ও চুনোপুটিসহ সব অন্যায়কারি, দুর্নীতিবাজ, খুন-গুমের সাথে জড়িত দুষ্কৃতিকারী, ঘুষখোর, ব্যাংক লুটেরা, টাকা পাচারকারী, গম ও টাকাখোরদের কোনোরকম রেহাই দেওয়া চলবে না। সময় লাগলেও একটা একটা করে বিচার করতেই হবে। এক্ষেত্রে নির্দয় হতে হবে। আইনের সহায়তা নিয়ে মশারির-ন্যায় জাল দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে সেঁচে ডাঙায় উঠিয়ে গ্রেফতার করে উচিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো-প্রকার আপস করা যাবে না। পতিত সরকার দীর্ঘ ষোল বছর ধরে বিচার

বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগসহ সব প্রতিষ্ঠান মনমতো করে দলীয় লোকবল ও চাটুকার দিয়ে সাজিয়েছিল। তারা এখন আপনার মনমতো কাজের পথে বড় বাধা। পরিবর্তনের জন্য সময় লাগবেই। কে কি বললো, সেদিকে লক্ষ করার এখন সময় নেই। পুলিশবাহিনীকে পুনর্গঠন করাই সমীচীন। বিচার বিভাগকেও তা-ই। এরপর যুগপৎভাবে প্রশাসন বিভাগ, অন্যান্য রাষ্ট্রীয়বিভাগ ও বিশেষ বাহিনী। সব অবৈধ সুবিধাভোগী-অন্যায়কারীকে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে। আমরা কোনো লোক-দেখানো বিচার দেখতে চাইনে। কোনো কোনো ভাগ্যবান পুত্র-কন্যা বিদেশে বসে এদেশ থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি ডলার ভাগ পেয়েছে, কেউবা এদেশে বসে দেশ লুটে বিদেশে পাচার করে এখন পালিয়েছে। সবাইকে আইনের আওতায় টাকাসহ এদেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করতে হবে। তাদের দেখাতে হবে 'কাঠ খেলে অঙ্গার টয়লেট হবেই'।

বর্তমান সরকারের নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা হাওয়ায় ভেসে কানে আসছে। আমি একজন নগণ্য মাস্টারসাহেব হিসেবে এ পথ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতে পারি। এতে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের সব ভালো কর্ম একদিন ধুলায় মিশে যাবে। এটা আমি চাইনে। দেশকে সেবা করতে চাইলে অন্য পরামর্শ আমার কাছে আছে; তবে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নয়। গত ২৮ তারিখের লেখায় আমি সংবিধান সংশোধনের জন্য মূল কিছু কথা প্রস্তাবনা আকারে লিখেছি। দূরদৃষ্টি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেই লিখেছি। এদেশের রাজনীতির অভিধান থেকে শিক্ষা ও জনসেবা কথাগুলো উঠে গেছে। সেজন্য এমনই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সেবাব্যবস্থা এবং এসবের বাস্তবায়ন নিয়েও অনেক সত্য কথন আমাদের আছে। আছে পরীক্ষিত নতুন নতুন মডেল। প্রয়োজনে সহযোগিতা করতেও আমাদের টিম 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' প্রস্তুত। সবকিছুই এ পত্রিকাতেই আমরা প্রকাশ করেছি। এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছে। সেজন্য পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

যেসব রাজনৈতিক দল তাড়াতাড়ি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে, তাদেরকে আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলি। বরং তাদের অন্তর্বর্তী সরকারকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করতে বলি। জনসেবা ও দেশসেবার মানসিকতা নিয়ে দলকে সাজাতে বলি। দলে অল্প কিছু ভালো লোক থাকলেই চলে না। দলের মধ্যে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাবাদী লোকজন আছে। এটা আমাদের মাঠ পর্যায়ে দেখা কথা। সত্য কথা হচ্ছে: পতিত সরকার সব অপকর্মের মূল হোতা, প্রশিক্ষক ও অগ্রদূত; সেই স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা দেখে

আসছি। অন্যান্য দলগুলো যত অপকর্মের ধরন ও টেকনিক তাদের কাছ থেকে শেখে ও তাদের অনুসরণ করে। পরবর্তীতে ক্ষমতায় এলেই আমার এ অলক্ষুণে কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে যাবে। তারা এ সময়টাতে দলের পুনর্গঠন ও শুদ্ধি অভিযান চালাতে পারে। এ বিপ্লবে তাদের অবদান আছে আমি জানি। ছাত্র-জনতা সামনে থেকেছে, তারাও সহযোগিতা করেছে, এটা অনস্বীকার্য। যত বড় নেতাই হোক, সততা, মানবিকতাবোধ ও দেশপ্রেম না থাকলে দেশের জন্য আবর্জনাস্বরূপ। ভবিষ্যতে কোনো 'কালাচাঁদ' 'লালচাঁদ' নাম নিয়ে জনসমক্ষে আসুক, এটা আমরা কেউ চাইনে।

গত কয়েকদিন আগে আমাদের ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী জনাব শেহবাজ শরিফের একটা বক্তব্য আমাকে মর্মাহত করেছে। অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, 'যিনি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (অর্থাৎ '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান), তিনি অবশেষে তার করুণ পরিণতি ভোগ করেছেন।' এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত প্রধান নেতাকে নিয়ে এ ধরনের বক্তব্য ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। পশ্চিম-পাকিস্তান শাসকদের এদেশের মানুষকে শোষণ, ভাষা ও শাসনক্ষমতা নিয়ে টালবাহানা, বঞ্চনা এবং গণহত্যাই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা, তা জনাব শেহবাজ শরিফকে বুঝতে হবে। মূলত 'মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়া চলে না', এটা তার উপলব্ধিতে আসতে হবে। তার ধারণা আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন থেকে স্বাধীনতা নিয়ে ভুল করেছি। আসলে তা নয়। জনাব শেহবাজ শরিফের তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক বাস্তব বিষয় জানার ও বোঝার এখনো অভাব আছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তার সদিচ্ছা, ন্যায়নিষ্ঠা, সাহস ও কর্ম এবং সকল বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাক এটা আমাদের একমাত্র কামনা।

(প্রকাশ: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল?

লিখতে চেয়েছিলাম শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। কিন্তু গতকাল সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কেউ একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থাকে সংবিধানে পুনঃস্থাপনের কথা উল্লেখ করায় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। আমারা জানি যে, কোনো বিষয় বা ঘটনাকে প্রকৃতির নিয়মেই পূর্বাবস্থায় পিছনে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। পেছনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পদ্ধতিকে আরো সমৃদ্ধ করে সময় ও ঘটনার গতির সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম। একেই বলে উদ্ভাবন। আমরা কেউই এর ব্যতিক্রম নই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন, মানি। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন, এ কথাও মানি। বরং এ পত্রিকাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে অনেকবার লিখেছি। সংবিধান সংশোধন বা পুনর্লিখনের এই প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক বিজ্ঞজন অনেক কথাই প্রতিনিয়ত বলছেন। আমি নিশ্চিত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে এদেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, রাজনৈতিক বা রাজনীতি-পোষ্য খাদকগোষ্ঠীর চরিত্র পুত-পবিত্র হয়ে যাবে, এ-কথা বিশ্বাস করা সত্যের অপলাপ। নির্বাচিত সরকার দেশ চালাবে সত্য। দেশটা ঠিকভাবে চলছে কি-না তার দেখাশোনা করবে কে? এটাই না আসল কাজ! শুধু নিরপেক্ষভাবে ভোটের ব্যবস্থা করাই দেশের উন্নয়নের ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে কোনোক্রমেই পারে না। শুধু ভোটের আয়োজনই একটা দেশের সবকিছু নয়, উন্নয়নের পূর্বশর্ত মাত্র।

প্রতিটা দলেই অল্প কিছু ভালো লোক এখনো আছেন, বাকিরা খাদকগোষ্ঠীভুক্ত। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? এই অল্পসংখ্যক ভালো লোকের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি না। কারণ আমরা জানি, তাদেরও বিশাল কর্মীবাহিনী ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকে নিয়ে চলতে হয়, তাদের চাপে হাত-পা-মুখ বাঁধা পড়ে থাকে; দল চালানো কঠিন হয়ে পড়ে, দলীয় কোন্দল দেখা দেয়। এদেশে চাটতে না দিলে 'চাটার দল'ও সরে পড়ে। আমি অপ্রিয় বাস্তব ও সত্য কথা বলছি।

আমাদের দরকার শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই নয়, মূল উদ্দেশ্যের দিকে তাকানো। নির্বাচিত সরকারের পাঁচ বছর সময়ে কোষাগারের প্রতিটা টাকা যেন দেশ ও জনগণের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, কোষাগারে যেন টাকাটা ঠিকমতো আসে, টাকা বানানোর জন্য কোনো মতলববাজ যেন রাজনীতিতে না ঢুকতে পারে, রাজনীতিতে টাকার খেলা বন্ধ হয়, প্রধানমন্ত্রীর পিয়নও যেন '৪০০ কোটি টাকার

মালিক' না হয়, আইন ও বিচার বিভাগকে অপরাধী যেন বুড়ো আঙুল দেখাতে না পারে, দলবাজ-সুবিধাবাদী লোক যেন অযথা গুরুর নাম-কীর্তন গেয়ে কাছে ভিড়তে না পারে, সুশিক্ষিত-নীতিবান লোক যেন রাজনীতিতে আসে, লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা যেন রাজনীতির বড় পদ দখল করতে না পারে, রাজনীতি যেন সত্যিকার অর্থে দেশ ও সমাজসেবার জন্য হয়, দেশ যেন অদৃশ্য বহিঃশক্তির হাতে জিম্মি না হয় ইত্যাদি। 'মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট' যেন না হয়। অভিযোগ আছে, যে পরিমাণ লক্ষ কোটি টাকা পতিত সরকারপ্রধান নিজে, নিজের আত্মীয়-স্বজন, দলীয় লোকজন মেরেকেটে-শুষে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ফাঁকা করে বিদেশে পাচার করে পালিয়েছে, এসব আমার-আপনার টাকা নয় কি?

আমরা সবসময় রাজনীতিকদের কুৎসাইবা রটাতে যাবো কেন? তারা তো আমাদের শত্রু নয়। তাদের রাষ্ট্রবিরুদ্ধ ও জনস্বার্থবিরুদ্ধ কর্মই না আমাদের তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। তবে বলতেই হয়, বিদ্যমান রাজনীতিকদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ভালো নয়। এসবের জন্য প্রয়োজন রাজনীতিতে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংপ্রভ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, যা আপনা-আপনি আসবে না। যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তাদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করবে। দুর্নীতিবাজ লোকজন রাজনীতি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবে। দেশ সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরে পাবে; ন্যায়তন্ত্রের ধারাবাহিকতা সমাজে ফিরে আসবে।

অনেক প্রাণের আত্মত্যাগে তেপ্পান্ন বছর ভোগার পর আবার 'তলাবিহীন ঝুড়ি' অবস্থায় সুযোগ একবার হাতে এসেছে, সুযোগটা যেন আমরা অবহেলা ও গভীরভাবে চিন্তা না করে হালকা চিন্তার প্রয়োগ দেখিয়ে নষ্ট না করি। ওল্ড মডেল বাদ দিয়ে আধুনিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে বেছে নিই। পরেরবার সুযোগ আসতে অনেকের জীবন শেষ; দেশও অন্যের সেবাদাসে পরিণত হওয়া অমূলক নয়। আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না, ভালোও বলতে চাই না, চাই সংবিধানে দেশ পরিচালনায় সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা; রাজনীতিতে জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধ পুরোপুরি নিশ্চিতকরণ। যার যার কাজের আওতা আইনে সুবিন্যাস্তভাবে লিখিত থাকবে। কাউকে অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা যাবে না।

যদিও এত ছোট্ট পরিসরে সংবিধান সংশোধনের বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই, তাই শুধু একটা বিষয়, অর্থাৎ কাঠামোগত পরিবর্তনের কিছু কথা লিখছি। গত ২৮ আগস্ট এই পত্রিকাতেই 'রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা' শিরোনামে এ বিষয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছিলাম। হয়তো সংশ্লিষ্টমহলের দৃষ্টিতে

পড়েনি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ পড়ে দেখতে পারেন। আরো কিছু পরিবর্তনের বিষয়ে গঠনমূলক পরামর্শও সেখানে আছে। তত্ত্বাবধায়ক-সরকার পরিচালিত অতীতের কয়েকটা নির্বাচনের পর বিজয়ী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড আমরা নিজ চোখে দেখেছি। বাস্তব সে অভিজ্ঞতা আমাদের রয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে ঘোরানো-প্যাঁচানো, মনমতো লোকটিকে সরকারপ্রধানের দায়িত্বে আনা যায় কি-না, সে কসরতও কম দেখিনি। অবশেষে বেশি প্যাঁচ খেয়ে মরা-গিরা পড়ে গেছে। এর মধ্যে নদীর পানিও অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। নতুনের সন্ধান সৃষ্টিধর্মী মানুষের চিরন্তন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক-ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের মাথায় আরো বিসারিত নতুন কিছু এসে গেছে।

অনেকেই বলে থাকেন যে, ভবিষ্যৎ নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় আসার জন্য বিজয়ী দল দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকবে, দেশের সেবা করবে। এসব বস্তা-পচা পুরোনো তত্ত্ব অনেক আগেই সুচতুর রাজনীতিকদের মাথা থেকে বিদায় নিয়েছে। লালন গেয়েছিলেন, 'শুনি ম'লে পাবে বেহেস্তখানা, আসলে তো মন মানে না, ও গো বাকির লোভে নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এ ভুবনে, সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্য জ্ঞানে...'। আমি চাই, টেবিলের ওপর ছাগলকে ওঠালেই কাঁঠাল পাতা খায়, কাঁঠাল গাছ কেটে ফেলার দরকার নেই, ছাগলকেও জবাই করার দরকার নেই, বরং টেবিলটাকে সরিয়ে ফেলুন; কাঁঠালের পাতা ছাগলের নাগালের বাইরে রাখুন।

আমরা এদেশের রাষ্ট্রপতি পদটাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছি। আবার তিনি সবসময় ক্ষমতাসীন দল থেকেই নির্বাচিত হন। ক্ষমতাসীন দলের আনুগত্য প্রকাশ করেন। মনে অনেক ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলতে ও করতে পারেন না। একজন ব্যক্তির অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। আমি তো এদেশের রাষ্ট্রপতিকে খুনির ফাঁসির দণ্ড ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধানের ইচ্ছানুযায়ী মওকুফ করে বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া এবং কাউকে শপথবাক্য পাঠ করানো ছাড়া অন্য কোনো কিছু করতে দেখিনে। আপনারা রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে রাষ্ট্রপ্রধান পদের পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের মতো 'সুপ্রিম কাউন্সিল' নামে একটা স্বকীয় বডিকে দলনিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দিয়ে দিন। কাউন্সিলরের সংখ্যা ১৫ থেকে ২১ জন হতে পারে। তারা 'ব্লাড হাউন্ড' না হয়ে 'ওয়াচ ডগ'-এর দায়িত্ব পালন করবেন। তারা রাষ্ট্রের স্বার্থ ও জনগণের জিম্মাদারী দায়িত্ব পালন করবেন।

আমাদের দেশের কেউ কেউ সরকারের গদিতে বসেই দেশের মালিক বনে যান, কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রের ও জনস্বার্থ দেখার কোনো মালিক নেই। এখানেই মূল সমস্যা।

সুপ্রিম কাউন্সিল বাসের স্টিয়ারিংয়ের কাজ করবে। বাস সোজা পথ ছেড়ে বিপথে গেলেই স্টিয়ারিং তাকে সোজা পথে আসতে বাধ্য করবে। এটাই 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর দায়িত্ব হবে। 'সুপ্রিম কাউন্সিল' রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান বডি। সুপ্রিম কাউন্সিল ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা তাদের কোনো সদস্যের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী বা দেশের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে কিনা, রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে তা তদারকি করবে। সংবিধানে তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির সীমানা নির্ধারিত থাকবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন কোনো রাজনৈতিক দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এ বিধান বাতিল করতে না পারে। সুপ্রিম কাউন্সিল ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত হবেন না। তাদের মনোনীত বা নির্বাচিত করার জন্য বিভিন্ন পেশাদার সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে দুই লাখ থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ সদস্যের আলাদা দলনিরপেক্ষ, সুশিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে। সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। মেয়াদ হবে ছয় বছর। সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটে বিজয়ী 'প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর' হবেন। কাউন্সিলরদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকবে। তারা নির্বাচনের ডামাডোল ও ঢাক পিটিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হবেন না। তারা হবেন দেশবরেণ্য এবং শ্রদ্ধেয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক প্রার্থীর 'কারিকুলাম ভিটা' প্রকাশ করবে এবং 'সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচন' পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত 'ন্যায়পাল'-এর বিধান না রেখে ন্যায়পালের কার্যাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকটা সুপ্রিম কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর একা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২/৩ কাউন্সিলরের সম্মতির প্রয়োজন হবে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সম্মতি নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কাউন্সিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে নির্বাচন চলাকালীন এক বা একাধিক অরাজনৈতিক যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দিতে পারবে।

সরকারি ও অন্য রাজনৈতিক দলের অসৎ কর্মকাণ্ড, দেশ ও ব্যাংক লুট, বেপরোয়া দুর্নীতি, নেতা-কর্মীদের অপকর্ম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিসর্জন, দেশ বিক্রির অপমানসিকতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল ক্ষমতা ও আইনের আওতার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে পারবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তাসহ সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো সুপ্রিম

কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। এছাড়া নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে থাকবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীও সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে থাকবে।

রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলি: আপনাদের দল যদি দেশ ও জনস্বার্থে কাজ করে, তবে সুপ্রিম কাউন্সিলের অস্তিত্বে আপনাদের কোনো ভয় থাকার কথা না। আপনারা তখন সুপ্রিম কাউন্সিলের একে অন্যের পারস্পরিক কাজ সম্পাদনে সহযোগিতায় আসবেন। আপনারা দেশসেবা ও সমাজসেবাই যদি করতে চান, ইস্পাতই যদি হয়ে থাকেন, আশি মন লোহার ভেতর দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে পার হয়ে যেতে বাধা কোথায়? আমাদের উদ্দেশ্য রাজনীতিতে সুশিক্ষিত লোকজন আসবেন, বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান এসে লাঠির জোরে বড় পদ দখল করবে না। যোগ্যতার বলে ব্যক্তি সরকারের যে কোনো সাংবিধানিক বড় পদে আসবেন; চাটুকারী যোগ্যতা ও দলবাজির মাধ্যমে নয়। জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল স্বাধীন ও গঠনমূলকভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না।

নির্বাচিত সরকার ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে আইন তৈরি করতে হবে। আমার মতে এদেশকে সমৃদ্ধ করতে, উন্নতির শিখরে পৌঁছতে, জনগণকে সুশিক্ষিত করতে ও শিক্ষার মান বাড়াতে রাজনীতি-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা, আইন-কানুনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা এবং দলমত নির্বিশেষে অন্যায়কে শক্তহাতে দমন করার কোনো বিকল্প নেই। অনেক বছর পর আজ একটা কথা না লিখে পারছি না যে, যে-কোনো মূল্যে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কোনো একক পক্ষের অদূরদর্শীতা, বিদেশী শক্তির প্রতি দেশবিরোধী আনুগত্য ও দাসত্ব এবং গদি রক্ষা করতে গিয়ে এ দেশ যেন কোনোদিন 'দ্বিতীয় ফিলিস্তিনে' পরিণত না হয়। এটাই আমার বড্ড ভয়। এদেশ কারো একার সম্পত্তি না, আমাদের সকলের। 'জন্মেছি এই নদীর চরে আমি এদেশের সন্তান, শ্যামলা মাটি-মায়ের বুকে সইপাতি পরান, আমি এদেশের সন্তান'।

(প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে!

অন্তবর্তীকালীন সরকারপ্রধান ১১ সেপ্টেম্বর '২৪ দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন। ভাষণ শোনার জন্য সন্ধ্যার পর থেকেই আগ্রহ নিয়ে বসেছিলাম। বিগত এক মাসে তার টিম যে যে কাজগুলো করেছে, তার বর্ণনা তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। ৬টি কমিশন গঠন করেছেন, ভালো লাগলো। এতদিনের পচা জঞ্জাল সহজেই সরানো যাবে, স্থিতিশীলতা আনা যাবে বলে মনে করি না। বর্তমান সরকারের হাতে আলাদিনের চেরাগ নেই যে, 'হও' বললেই সব হয়ে যাবে। এক দিকে মন দিতে যাবেন, অন্য দিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। অপশক্তি পিছে গোপনে ক্রিয়াশীল। কথায় আছে, 'মঘা এড়াবি কয় ঘা'! যারা পতিত সরকারের কাঁধে ভর করে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এতদিন দেশ লুটে খেয়েছে, তাদের কোনো ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ; দেশ থাকলো, কি বিক্রি হয়ে গেল, এ আত্মজিজ্ঞাসা, বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ববোধ নেই। তারা নিজ স্বার্থ ছাড়া কোনো কিছুই বুঝতে চাইবে না। এখানেই অসুবিধা। তারা তাদের দলবলকে বিভিন্ন অন্যায় দাবিদাওয়া নিয়ে কৌশলে লেলিয়ে দিচ্ছে। পেছন থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ছে। আমি অনেক বছর আগে গুলিস্তানে পকেটমারদের আস্তানায় গিয়ে অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তারা সবাই একটা না একটা কারণ দেখিয়ে নিজেদেরকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। পতিত সরকার দীর্ঘ ষোলোটা বছরে এসব 'চাটার দল' প্রতিটা সেক্টরে, সমাজজীবনের প্রতিটা পর্যায়ে, জীবনের মন্দাকিনী তীরে বসিয়ে রেখেছে এবং তারা এদেশের অর্থনীতির অপুষ্ট-মাংসহীন হাড় অনবরত চেটে চলেছে। বড় অংকের ঋণের টাকাও পেটে পুরেছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যত ভালো কথাই বলুক না কেন, তারা এগুলো শুনতে চাইবে না। 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। দেশ-বিধ্বংসী এই অপশক্তিকে যে কোনো মূল্যে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এটাই প্রথম কাজ। এর কোনো বিকল্প নেই। এখানে আপস করতে গেলেই সরকার পরিণামে ভুগবে, কালসাপকে বিশ্বাস করার মাসুল দিতে হবে। সরকারের ব্যর্থতায় মূলত মাসুল দিতে হবে ছাত্র-জনতাকে, যারা রক্ত ও জীবন দিয়ে সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। একটা বিষয় সরকারকে বুঝতে হবে যে, ময়লা-আবর্জনার দু-পিঠেই সমান গন্ধ। সরকারকে আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে, সভ্য ও সুশিক্ষিত লোককে সম্মান করলে, তিনি সম্মানের মর্যাদা বুঝবেন; বাঁদরকে লাই দিলেই মাথায় উঠে বসে থাকবে, তাকে বেশি সম্মান-মর্যাদা দেখানো চলবে না; খ্যাপা কুকুরকে মুগুর দিতেই হবে। নইলে

সুযোগ বুঝে সে বিষদাঁত বসিয়ে দেবে। সেজন্য সরকার সবার প্রতি নমনীয় না হয়ে অপরাধী, দুর্নীতিবাজ, দেশের রক্তচোষা, খুন-অপকর্মের পরীক্ষিত দোসরকে যথাযথভাবে চার্জ গঠন করে বিচারের আওতায় আনতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। যত দেরি হবে, তত ক্ষতির কারণ হবে।

তেপ্পান্ন বছর পর এদেশের এই অতি প্রতীক্ষিত ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে আমি 'বিপ্লব' শব্দের কোনো বাংলা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে চাইনে। বিপ্লবকে বিপ্লবের মতোই দেখতে, সেমতো কাজ করতে হবে। জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে শরীরের ক্যান্সার আক্রান্ত যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্রপচার করে বিচ্ছিন্ন করা সময়ের দাবি। এখানে কোনো উদারতা ও নমনীয়তা প্রশ্রয় দেওয়ার অবকাশ নেই। এদেশে রং বদল করা অপশক্তির অভাব নেই। সরকার সমাজের সবাইকেই যেভাবে মানুষ হিসেবে ভাবছেন, আমি সবাইকে মানুষ ভাবতে নারাজ, কারা মানুষ আর কারা মানুষ নামের কলঙ্ক, এতটা বছরের কর্মকাণ্ডে আমরা নিশ্চয়ই সবাইকে চিনে ফেলেছি। এখন ব্যবস্থা নেওয়ার পালা। আমি তো আপাতত নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্মকাণ্ডে নমনীয় ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি। সব অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না। তাদের বিচারের জন্য গ্রেফতার দেখানো ও শক্ত মামলা রুজুর ব্যবস্থার গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে। এতে বিপ্লবের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অনেককে বদলি করে অন্য কোথাও দেওয়া হচ্ছে, অনেককে স্বেচ্ছা-অবসরে পাঠানো হচ্ছে। তাদের কৃত-অপকর্ম ও দুর্নীতির বিচার গেল কোথায়? যে-সব সরকারি আমলা-কামলা, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন পদে থেকে দেশ লুটে খেয়েছে, তাদের স্বেচ্ছা-অবসরে পাঠালে তাদেরই লাভ, এতদিন যে কোটি কেটি টাকা অবৈধভাবে কামাই করেছে, এখন বসে বসে খাবে আর ষড়যন্ত্র করবে। তারা তো এটাই চায়। তাদের প্রাপ্য শাস্তি গেল কোথায়? এর নাম বিপ্লব নয়। আয়নাঘর ভেঙে দেওয়ার কথা শুনছি। আয়নাঘরের মালিক-কুশীলবদের হিসেব কোথায়? তাদের নামগুলো তালিকা আকারে এতদিনেও পত্রিকার পাতায় এলো না কেন? তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও গ্রেফতারের আওতায় কতজনকে আনা হয়েছে, পত্রিকার মাধ্যমে জানতে চাই।

'গোপালী পুলিশ', 'গোপালী পুলিশ' শব্দ সব জায়গা থেকেই কানে আসে। গোপালগঞ্জ এলাকার কোনো ব্যক্তি মেধা ও যোগ্যতার বলে কোনো পদে নিয়োগ পেলে কোনো অন্যায় তো আমি দেখিনে। যদি কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে, অন্য কোনো এলাকার যোগ্য কাউকে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে অন্যায়ভাবে নিয়োগ বা

পদায়ন করা হয়, তা নিশ্চয়ই অন্যায়। এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিনে। তবে ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীকে পক্ষপাতিত্ব করে পুলিশ বিভাগে চাকরি দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে বলে শুনি। জরুরি ভিত্তিতে এর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পূর্বেও বেশ কয়েকটা লেখাতেই পুলিশ বিভাগ ও র‍্যাবকে অতি তাড়াতাড়ি ঢেলে সাজানোর কথা আমি বলেছি। সময় নষ্ট না করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজটা করা জরুরি। বুঝতে হবে ‘সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। বরং ৬টা কমিশন গঠন করার আগেই কাজটা করার দরকার ছিল। দেশের স্থিতিশীলতা আনতে বা কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বারবার ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তাদেরকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বলুন। তাদেরকে ‘রিজার্ভ ফোর্স’ হিসেবে ব্যবহার করাই ভালো। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ তাদেরকেই করতে হবে। তাদের কেউ যথাসময়ে কাজে যোগ না দিলে বা আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হলে, তাকে বিদায় করে দেওয়াই ভালো। কাউকে তোষামোদ করে কাজ করাতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। বুঝতে হবে দীর্ঘদিন অপশাসন, দুর্নীতি ও বিকৃত মানসিকতার মহোৎসবের ফলে আমাদের সমাজ, সমাজের মানুষ ও মানবিক মূল্যবোধ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সব ক্ষেত্রে সময়োপযোগী কাজ করাটাই দরকার। এখন প্রয়োজন শক্ত হবার। সেজন্য বিষয়গুলোকে মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তাভাবনা করে দেখা প্রয়োজন। বিপ্লব আকারেই বিবেচনা করতে হবে। অনেক কিছুর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। অনর্থক দেরি, বা আগের কাজ পরে করার চেষ্টার ফলে অনেক কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

’৭৫-এর পট পরিবর্তনেরও অনেক যৌক্তিক কারণ ছিল, তা আমরা যতই স্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড বলে বিষয়টাকে গণ্য করি না কেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটা বড় ভুল ছিল, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার কথা ভেবে, বাকশালকে তাড়াতাড়ি আওয়ামি ছদ্মাবরণে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত করে দেওয়া। বাকশাল একটা প্রতিষ্ঠিত বিকৃত মতবাদ। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়ে অনেকবার সামরিক কূ করার চেষ্টা হয়েছিল, আবার তিনি জীবন দিয়ে তার ভুলের খেসারত দিয়ে গেছেন। একই ভুল সম্ভবত আমরা আবার করতে যাচ্ছি। আমরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতায় দেখলাম যে, আওয়ামি লীগের অর্ন্তর্নিহিত বাকশালী খসলত বদল হয়নি, বরং বহুগুণে বিকৃতরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমড়া গাছ থেকে সুমিষ্ট আম আশা করি কি করে? একজন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোহভাবে এই তেপ্পান্ন বছর ধরে তা দেখে চলেছি। বাকশালের শেকড় পার্শ্ববর্তী দেশের মাটিতে

পোতা। পার্শ্ববর্তী দেশ পতিত শেখ হাসিনাকে তাদের স্বার্থ দেখভালের জন্য এদেশে পাঠায়, তাদের কর্মকাণ্ডে জনসাধারণ খ্যেপে গেলে আবার ফেরৎ নেয়।

মনে পড়ে, আমি 'ট্রান্সপ্যারেন্সি ও গভর্নেন্স' বিষয়ে পিএইচডি করার সময় ছুটিতে দেশে এসেছি। আমার এক পুরোনো সহকর্মী একদিন দেখা করতে এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, আপনাদের এইসব টপিক বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে একটা গবেষণা করতে পারেন না'? আমি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললাম ,'আপনারা সমাজবিজ্ঞানের লোক, ইচ্ছে করলে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন, নিজেই গবেষণা করতে পারেন'। সেদিন থেকে বিষয়টা আমার কাছে বেশি গুরুত্ব পেল। আমি তাদের শ্রেণিচরিত্র উদ্ঘাটনে মনে মনে ব্রতী হলাম। আসলেই আমাদের সমাজে একটা কথা বেশ প্রচলিত, 'তোমার ঘাড় কেন কাত? আমরাই এক জাত'। কোনো স্বাধীন ব্যক্তির কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদানের মনোজাগতিক ইফেক্ট তো অবশ্যই আছে। নইলে একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো একজায়গায় জড়ো হয় কীভাবে? এছাড়া কতিপয় সুবিধাবাদী বাঙালি দেশাত্মবোধ, নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য সেখানে গিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে মিছিলের আগে স্থান করে নেয়, বড় বড় কথা বলে, পদ-পদবি সংগ্রহ করে, এটাও সত্য।

এরশাদ সরকার থানাগুলোকে উপজেলা করেছিলেন। উপজেলা করার জ্বালা আজও মেটেনি। থানা পর্যায়ে পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এখনও বিদ্যমান। লাভ কতটুকু হয়েছে, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অনেক ভালো বলতে পারবেন। তবে রাজনৈতিক যন্ত্রণা বেড়েছে, এটা সত্য। আমাদের পুরো দেশকেও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির বাসনায় ভেঙেচুরে ৫টি প্রদেশে ভাগ করার মনোভাব কারো কারো মনে বিদ্যমান। শেখ হাসিনা ওয়াজেদও বলেছিলেন, মেট্রোপলিটন ঢাকাকে ভেঙে ৪ বা ৮ টুকরো করতে পারলে তার কাছে ভালো হতো। টাকার অভাবে দু-টুকরো করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আমাদের দেশ এত বিশাল আকারের কোনো দেশ নয়। রাজনৈতিকভাবে যত টুকরো করবেন, রাজনৈতিক জটিলতা ও আঞ্চলিক বৈষম্য তত বাড়বে। অপরাজনীতির খেলা, মেরেকেটে খাওয়া, দলবাজি তত প্রকট হবে। স্ট্রাটেজিক দিক থেকে দেশের অখণ্ডতা তত দুর্বল হবে। আমাদের দেশ পরিচালকদের অনেক দূরদর্শী হতে হবে। 'নেই কাজ তো খই ভাজ' হলে চলবে না। দেশের উন্নতির এতই যদি অদম্য ইচ্ছা থাকে, এদেশের ৮টি বিভাগকে আয়-কেন্দ্র, ব্যয়-কেন্দ্র, বিনিয়োগ ও উন্নয়নকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা যায়। জেলা ছাড়া বিভাগকে তো আমরা বাস্তবে বড় করে দেখি না, উন্নয়নের জন্য গুরুত্বও পায় না।

সেখানে আমরা যোগ্য নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে উন্নতি করতে পারি। তবে রাজনৈতিক প্রশাসন আর বাড়ানো ঠিক হবে না। এদেশে রাজনৈতিক প্রশাসন পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই দুর্গন্ধকে কত তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দেওয়া যায়, সেটা দেখুন। কীভাবে সুস্থ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে জাতে ওঠানো যায় সেটা করুন। এতে দেশের মঙ্গল হবে। এ বিষয়ে গত ১০.০৯.'২৪ তারিখ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল?' শিরোনামে একটা বিকল্প নতুন কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা এই কলামেই পরামর্শ দিয়েছিলাম, ভেবে দেখুন। আমার মনে হয় এমন ব্যবস্থা কোনো না কোনো দেশে থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যথাযথ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হয় কি-না, রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায় কি-না, এটাই দেখার বিষয়। এখন অপরাজনীতি প্রতিপালন আর দরকার নেই, দরকার অপরাজনীতি দমন ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সার্থক প্রয়োগ, যা নিয়ে একটা কমিশন ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়ে গেছে। সর্বাগ্রে দরকার কতকগুলো সরকারি বিভাগকে ঢেলে সাজানো, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দুষ্কৃতিকারীদের শক্ত হাতে দমন এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা স্থায়ী সুনীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করার সফল প্রচেষ্টা। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা সুনিশ্চিত, তো জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত, অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করা সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ নিবন্ধ এ পত্রিকাতেই লিখেছি, বারান্তরে আরও লেখার ইচ্ছে আছে। ছোটবেলায় পড়া আমাদের সবারই মনে আছে, 'আমাদের দেশে হবে সে-ই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।

(প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়

তখন আমি ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় একসাথে দুটো সার্টিফিকেট হাতে পেলাম। একাডেমিক বিল্ডিং থেকে দেওয়া হলো এমকম সার্টিফিকেট; বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার থেকে দেওয়া হলো গ্যাস্ট্রিক-আলসার রোগীর সার্টিফিকেট। তখন অপারেশন ছাড়া ওষুধে আলসার ভালো হতো না। অসংখ্য হোমিও ও অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়েছি। ডাক্তার প্রমোশন পেয়ে লেকচারার থেকে প্রফেসর হয়ে গেছেন, আমার রোগের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একবার এক হোমিও ডাক্তারের কাছে নাম লেখালাম। চেম্বারের বাইরে অপেক্ষা করছি। দরজার উপর স্পষ্টাক্ষরে লেখা 'কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, দরকার রোগীর ধৈর্য এবং চিকিৎসকের প্রজ্ঞা'। আমি তা বিশ্বাস করলাম।

দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে আমাদের এ সোনার বাংলা ও এর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও খুনি সমাজে ভরে গেছে। সুষ্ঠু বিচার হয় না, তাই এ অবস্থা। যার কেউ নেই, যে কোনো রাজনীতির সাতে-পাঁচে নেই, টাকা-পয়সা নেই, তার জন্য বিচার। কখনো গায়েবি মামলা, পুলিশের তদন্ত বাণিজ্য। 'নরম কাঠে ছুতারের বল'। সমাজ ও মানুষকে রোগগ্রস্ত করছে এদেশের রাজনীতিকরা। ব্যতিক্রম বাদে তারা নিজেরাই মানসিক রোগী, দুর্নীতিবাজ ও খুনি। তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেনি। আমি নিশ্চিত জানি, এদেশের রাজনীতিকদের কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়। আমরা পরিমিত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে পারছি না। নিজেই রোগাক্রান্ত হলে দেশের রোগ ভালো করবেন কীভাবে? আইনের শাসনইবা প্রতিষ্ঠা করবেন কীভাবে? দীর্ঘ ষোলো বছর রোগের প্রকোপ এতই বেড়েছে যে, রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ ষোলোটা বছর জনগণের খাজাঞ্চি রাজনীতিকরা নিজে, তাদের 'বাল-বাচ্চুকা', আত্মীয়-স্বজন, দলীয় চাটার দল দিয়ে চাটতে চাটতে শুধু কঙ্কালসার হাড় অবশিষ্ট। দেশের খাজাঞ্চি শূন্য হলেও নেহি ছাড়েঙ্গা, শেষে ঋণ করে টাকা এনেও 'হাঁড়িচাটার দলের' হাঁড়ি চেটে খাওয়া শেষ।

এসব কথা আমি পতিত ভোটবিহীন, পরজীবী সেবাদাস সরকারের আমলেও লিখতে ছাড়িনি। আমার এ সত্য অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তারা কোনোদিন করতে পারেনি। আমার মতো ক্ষুদ্র এ মাস্টারের কলম কোনো অন্যায়কারী ও অপরাধীকে ক্ষমা করে না, তাই। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও শাসনভার

দিয়ে রাখা হয়েছিল প্রভুর গোপন কোনো বাহিনীর হাতে, এটা কে না জানে! লালন গেয়েছিলেন, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে...'। ঠিক তা-ই। বাংলাদেশিরা নির্বোধ ও হুজুগে জনগোষ্ঠী। যখন বোধ ফেরে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। এবারও দেউলিয়া হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছাত্র-জনতা জেগেছে, পিঠে দেওয়াল ঠেকার পর। আগে বোঝে না, কম পড়লে টের পায়।

সেবাদাস সরকারের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তারা সমাজের মানুষদের জনআপদে পরিণত করেছে এবং এদেশে শিক্ষার মানে ধস নামিয়েছে। কোনো জনগোষ্ঠীকে শোষণের প্রাথমিক প্রক্রিয়াই এটা। তাদের চেনার জন্য প্রথম মেয়াদের রাষ্ট্রপরিচালনাই যথেষ্ঠ ছিল। তাদের স্বভাবের অবনতি ছাড়া ভালো কোনো পরিবর্তন কেউ এ পর্যন্ত দেখেনি। তারা জনরায়ের তোয়াক্কা না করে তাদের একমাত্র প্রভুর প্রত্যক্ষ শক্তিতে নানাভাবে চক্রান্ত করে চর দখলের মতো ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। যত রকমের লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি-লুটপাট আছে; অত্যাচার-নির্মমতা, খুন-গুম, গণহত্যা, মিথ্যাচারিতা আছে; ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা আছে– কোনো কিছুই তারা বাদ রাখেনি। অন্য কোনো দেশের দাসখতের বকেয়া বিল, যেমন– আদানি কোম্পানির সাথে কর্তাভজন চুক্তির বিল, রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নেওয়া রাশিয়ার (বালিশকাণ্ডের) বিল, সুদসহ অন্য ঋণের কিস্তি, যত হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখেছে, এখন সব দায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে এসে চাপছে। অথচ কোষাগার শূন্য। দেশ বিক্রি আবার কাকে বলবো! চেটেপুটে বিদেশে পাচার শেষ। তাদের মিথ্যাচারিতা ও নির্লজ্জ তর্ক বাজারের মেয়েদেরকেও হার মানায়। আমার ধারণা, যেই-না চেয়ে-চিন্তে কোষাগারে কিছু টাকার সংস্থান হবে, আইনের শাসন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, অর্থনীতিতে আবার রক্ত সঞ্চালন বাড়বে, আবার তারা ফিরে আসার মওকা খুঁজবে। আমরা খুব আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের 'বাঘের পিছে ফেউ লেগেছে'। এদের সরাতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করে শেয়ালের কাছে স্থায়ীভাবে মুরগি পোষাণি দিয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত করে স্বাধীনতা রক্ষার সোল-এজেন্টের দায়িত্ব নিয়েছে। ডাহা অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পর্যবসিত করেছে।

হা হতোস্মি! বাংলাদেশিদের একটা স্বার্থপর-নির্বোধ ও মীর জাফরমার্কা অংশ তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। অথবা স্বার্থের কারণে বুঝেও না-বুঝ হয়। বাঙালাদেশিরা কোনোদিনই মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, মীর কাশেমের বংশধর ও সম্প্রসারণবাদী

নব্য বেনিয়াদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ও ভবিষ্যতেও পাবে বলে মনে হয় না। এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ও মুক্তি অতটা সহজ নয়। 'দিল্লি হনুজ দুরস্ত'। ভবিষ্যতেও এরা এদেশেই থাকবে এবং এদেশ শুষে খাবে বলে মনে হয়। যুগে যুগে এরা এদেশেই আছে। আমার একটাই প্রশ্ন, পতিত শোষক, সম্প্রসারণবাদের প্রত্যক্ষ দোসর ও ভ্রাতৃহননের দল দেশের বিরুদ্ধে আর কী কী করলে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এদেশে নিষিদ্ধ হতো? মৃত্যুর আগে আমি বিষয়গুলো জেনে মরতে চাই।

অতীতে একাধিকবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল ৩ মাসের জন্য। দুষ্কৃতিকারীরা এই ৩ মাস গর্তে লুকাত। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে মুখ বের করে দেখত, কবে নির্বাচন শেষ হয়। নির্বাচন শেষে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আবার মুখ দালালি করতো; নিজেদের রাজনীতির লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেত। কুটিল বুদ্ধির চর্চা করত। এবার অধিকাংশ অপরাধী ও খুনি পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়েছে। এবার অন্তর্বর্তী সরকার চিন্তা-ভাবনা ও কাজে শৈথিল্য ও উদারতা দেখালে একই অবস্থা আবার ফিরে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে তারা আবার বহাল তবিয়তে প্রতিষ্ঠিত হবে। যাদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে এ বিপ্লব, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা কবরে অথবা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অসহায়ের মতো অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মের দিকে তাকিয়ে আছে। একথা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি? দেশের পরিণতিইবা কী হবে? ছাত্র-জনতার এ বিপ্লবের সার্থকতা কোথায়?

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান মূলত একজন শিক্ষক মানুষ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার মনোভাব তার অন্তর জুড়ে বিরাজমান। শিক্ষক হিসাবে প্রতিহিংসামুক্ত মন ও উদারতা তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রপরিচালনা করতে তাকে শিক্ষকসুলভ মন-মানসিকতা থেকে আপাতত বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতির দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? বসন্তের প্রারম্ভ থেকেই শান্ত-স্নিগ্ধ সুনির্মল মৃদুমন্দ বাতাস, মনমুগ্ধকর পরিবেশ ও রোমান্টিক মন-মানসিকতা। বৈশাখ এলেই কালো-ঝড়ো মেঘ ও উদ্দাম-দুর্দমনীয়, উচ্ছৃঙ্খলতার দাপট পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে তছনছ করে ফেলে। আষাঢ়-শ্রাবণে অবিরাম ধারায় ঝরঝর বর্ষণ। প্রকৃতির কত রূপ! সব সময়ের জন্য সবকিছু প্রযোজ্য নয়। আল্লাহতাআলার প্রকৃতি ও গুণের দিকে তাকালেও আমরা একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। তিনি 'আর-রাহমান' (দয়াবান, অপার করুণাময়); সব সময় ও সবার জন্য নয়। তিনিই আবার 'আল-কাহহার' (কঠোর, মহাপ্রতাপশালী, দমনকারী)।

ভিন্নরূপে সৃষ্টিকর্তা। এসবই প্রকৃতিদর্শন ও জীবনদর্শনের অংশ। এদেশ এখন চায় আইনের সুষ্ঠু ও কঠোর প্রয়োগ। স্বজনপ্রীতি না করি। উদারতা দেখানোর উপযুক্ত সময় এখন নয়। পত্রিকা পড়লেই দেখি রাজনৈতিক খুন-খারাবি। এর কোনো বিচার হতে আমি দেখিনে। রাজনৈতিক বিবাদ বলে আমরা চালিয়ে দিই। এগুলো কি খুন নয়? খুন তো খুনই। বিচার মানেই কঠোর হাতে প্রতিটি খুনির প্রাপ্য শাস্তি।

আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ ও বিচার; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই বলেই না এদেশ মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর আবার বিপ্লবের দরকার হচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, সুষ্ঠু বিচার হলে এদেশের কমপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যুদণ্ড হবে। লাখ লাখ লোকের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হবে। দেশকে যদি সুষ্ঠু ধারায় ফিরিয়ে আনতে হয়, এসব সময়ের দাবি। খুনির অপরাধকে উদারতার দৃষ্টিতে দেখলেই, দেশে আইনের শাসন কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং' হতে বাধ্য। এদেশে আগে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। এ থেকে কোনোভাবেই পিছপা হওয়া যাবে না। বিলম্বও করা যাবে না। এদেশের বিচার মানে বছরের পর বছর বিচারালয়ের বারান্দায় ঘোরাফেরা করা। ঘুরতে ঘুরতেই জীবন পার করে দেওয়া। এজন্য জরুরিভিত্তিতে একাধিক বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতিসত্ত্বর রুই-কাতলা ও চুনোপুটিসহ সব খুনি ও অপরাধীকে আইন ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদলে হবে না। খুনি ও দুর্বৃত্তরা কিন্তু গর্তে মুখ লুকিয়ে, মাঝেমধ্যে মুখ উঁচিয়ে সাধারণ মানুষের অগোচরে পরিস্থিতি দেখছে। কখনো ফোনালাপ ফাঁসের নামে টেস্ট-ম্যাচ খেলছে। সব কিছুরই কারণ আছে। বাতাস ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। আমাদেরও ঠুঁটো জগন্নাথ কিংবা উদার-গণতন্ত্রমনা হলে চলবে না। আগে দুর্নীতিবাজ ও খুনিদের পাকড়াও, কঠোর হাতে অতিসত্ত্বর দমন ও বিচার। এরপর পরের কাজ পরে।

এদেশের সংস্কৃতি আমরা নিজ হাতে পরিবর্তন করে ফেলেছি। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি করেছি। সমাজকেও বিভক্ত করে ফেলেছি। আমার দল করলেই সে ভালো লোক; অন্যের দল করলেই নিশ্চয়ই খারাপ লোক; দল না করলেও সে খারাপ। আমি যত অন্যায় কাজ করি, আমার কাজকে ন্যায় বলে তোমার স্বীকৃতি দিতেই হবে, নইলে তুমি ভালো লোক নও। এটা এদেশের মানুষকে ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার মানদণ্ড। এ মানদণ্ডে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অন্তর্বর্তী সরকার মানুষ চেনার এ মানদণ্ড পরিবর্তন করবে বলে আশা করে বসে আছি। মানুষ ভালো, না

মন্দ বিচার্য হবে তার মনুষ্যত্বের গুণাবলি ও মানবিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে। কোন দল করে তা বিবেচনা করে নয়। আমাদের মধ্যে মানবতা বোধ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার এই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা মহামানব হওয়ার গুণগান গাই, নিজেকে ন্যায়বান দেশ পরিচালক বা জনপ্রতিনিধি বলে দাবি করি। আমাদের মধ্যে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ববোধ কোথায়? আমি মানুষ, না অন্য কোনো প্রাণিসদৃশ, সে আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? বিবেকের জাগরণ ও জাগ্রত বিবেক কোথায়? আমরা হাজার হাজার নিরীহ স্বজাতি ও শিশুর বুকে গুলি চালানোর অনুমতি দিতে একটুও চিন্তা ও দ্বিধাবোধ করি না, আমি আমাকে মানুষ বলে দাবি করি কী করে? একটু পরেই আবার জিভ ঘুরিয়ে মিথ্যা বলি। আমরা ইসলামপূর্ব মধ্যপ্রাচ্যকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ' বলে বইতে পড়েছি। আমরা সে যুগের বর্বরতাকেও নিজের অজান্তে ছাড়িয়ে গিয়েছি কিনা, কখনো আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখেছি কি? আমরা কিসের অহংকারে নিজেদের সভ্য মানুষ বলে দাবি করি? সভ্যতা কোথায়? আত্মবিশ্লেষণ কোথায়? অন্য কোনো প্রাণিকুলে জন্মালে প্রাণি হওয়া যায়, মানুষকুলে জন্মালেই কি মানুষ হওয়া যায়? একজনের মনুষ্যত্ব লোপ পেলে সে মানুষ হয় কী করে? আমরা অনেকেই হজ করি, বারবার নামাজে সেজদা দিয়ে কপালে ঘাঁটা পড়িয়ে জায়নামাজ ছিঁড়ে ফেলছি। অথচ নামাজে বারবার প্রতিজ্ঞা করছি 'আমাকে সহজ-সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর'। নামাজ পড়ে উঠেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছি, ঘুষ খাচ্ছি, দুর্নীতি করছি, মোনাফেকি করছি, অন্যের প্রতি অবিচার করছি। কেমন মুসলমান আমরা?

এদেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা কোনো কঠিন কাজই নয়। আগে নিজে ভালো হই। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি একটা টেকসই পরিকল্পনা, সময়মতো পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অনুসরণ করা। এ নিয়ে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আন্দোলনে জড়িত লোকগুলোর মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভালো মানুষ হওয়া। মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

(প্রকাশ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

গর্ভস্থ সন্তানের ওপর হলুদ খাওয়ার প্রভাব

একজন বয়াতির মুখে প্রথম এ ধুয়োজারিটা শুনেছিলাম, 'ও তুমি এ কথা পেলে কোথায়, হলুদ খেলেই রাঙা ছেলে হয়?' ডাক্তাররা ভালো জানেন সন্তানের রংয়ের ওপর হলুদ খাওয়ার কোনো প্রভাব আছে কিনা। আমি শিক্ষক মানুষ। আমার মুরদ সীমিত। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাব-চরিত্র, লেখাপড়ার ধরন ও পদ্ধতি, সাইকোলজি, ইতিহাস, অপরাজনীতি ও মানবিক চরিত্র হননের সামাজিক প্রভাব, বর্তমান সামাজিক পরিবেশ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ে আমার চর্চা ও পেশাদারিত্ব; এগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা, মুক্ত মতামত দেওয়া। মুক্ত বলছি এজন্য যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ট জীব। বিধাতা তাকে জ্ঞান-গরিমা, বিচার-বুদ্ধি ও পৃথক সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। স্বার্থের কারণে কোনো দল বা গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি কারও অধীনস্থ বা আজ্ঞাবাহী হলেও প্রকৃতিগতভাবে মানুষ স্বাধীন সত্তার অধিকারী। একমাত্র স্বার্থের বিষয় এলেই এদের আসল রূপ চেনা যায়। আমিও আমার বিচার-বুদ্ধি, উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনার নাটাই কোনো রাজনৈতিক দলের নিগড়ে না বেঁধে মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়তে চাই; এটা আমার প্রকৃতি।

হলুদের সাথে সন্তানের রংয়ের প্রভাব থাক বা না-থাক, আইন সংশোধন বা সংস্কার করলেই সব চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী-জোচ্চর সমাজে ভালোভাবে চলাফেরা করবে, সুচিন্তা মাথায় আনবে এবং চুরি-চামারি, ঘুষ বাণিজ্য, চাঁদা বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির মগডালে পৌঁছে যাবে, একথা কল্পনাতে ভাবতে পারি, বাস্তবে নয়; যদিও আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এদেশের রাজনীতিকরা দীর্ঘবছরের অপশাসনে ও স্বার্থোদ্ধারে মানুষ নামের সম্পদ একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। বিড়াল যদি বলে, 'মাছ-মাংস আর ভাল্লাগে না, আমি কাশীতে তীর্থস্নানে যাবো'– একথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? কর্মের প্রতি জীবের স্বভাবের একটা প্রভাব কি ভুলে যেতে হবে? স্বভাব নষ্ট করা অনেক সহজ, সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনা কি এতই সহজ? আবার আইন তৈরি করা সহজ, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অনেক কঠিন। কারণ সামাজিক অবক্ষয়, নীতি-নৈতিকতা, সুশিক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। আইন তৈরিতে এসব ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে।

এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ছে, আঠারো মাসের মধ্যে কয়েকটা বিভাগ সংস্কার করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে রাজনীতিকদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অন্তর্বর্তী

সরকারকে বিদায় নিতে হবে, এ সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে। আমার বিশ্বাস, রাজনীতিবিদদের তর সইছে না সরকারি দল বা বিরোধী দলে গিয়ে দেশ পরিচালনার জন্য। আমার মনে হয়, দোষ কারো নয়, দোষ আমাদের কপালের। কথায় আছে, 'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন'। আমার আরো সন্দেহ হয়, অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্পন্ন হয় কিনা! অত ধৈর্য আমাদের কোথায়? মূলত আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। অতীতে আমরা বারবার তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পূর্বানুমান করা কঠিন। তখন বলা হবে: পতিত সরকার এমন কী-ইবা ক্ষতি করেছে! উন্নয়নের নামে কোষাগার লুট, ব্যাংক লুট, টাকা পাচার, মিথ্যাচারিতা, খুন-গুম, নির্যাতন, গায়েবি মামলা, নির্বাহী-আইন-বিচার বিভাগ নিয়ে যথেচ্ছাচার, গণহত্যা; এ আর তেমন কী? একাকী তো করেনি, করেছে গোষ্ঠীসুদ্ধ। এছাড়া দেশের স্বার্থকে পাশ্ববর্তী দেশের চরণে বিসর্জন দেওয়া? তাদের হাতে ক্ষমতা ক্রমশ ছেড়ে দেওয়া? তাদের শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া? ইত্যাদি। পদে থাকতে গেলে প্রতিবেশীকে একটু-আধটু সুবিধা তো দিতেই হয়, আমরা না খুব উদার জাতি! বিপদে-আপদে তাদের আশ্রয়ে থাকতে পারি, এইবা কম কী! 'এই হোক মোর শেষ পরিচয়, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,' আমি তাদেরই লোক। রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে, অবাধে অর্থ কামাই করতে গেলে কতকিছুই-না করতে হয়, এ আর তেমন কি! আমি তো তোমাতে সঁপেছি প্রাণ, সেই প্রথম থেকে এই বর্তমান।

পতিত সরকার পালিয়ে যাবার পর তাদের কারো কারো বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখেছি ও পত্রিকায়ও পড়েছি। এত দিনে ভুলে গেছি, '৯৬ অথবা ২০০৬ সালে বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পরপরই সেই রাতে ব্যবসা-বাণিজ্য লুটপাট, বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ আমরা কম দেখিনি। বরং সেই তুলনায় এবার কম হয়েছে। আমাদের ভাবখানা এরকম যে, 'আমি যা করি তা তোমরা কোরো না, আমি যা হেদায়েত করি তা তোমরা করো'। এটা আমাদের জাতীয় ব্যাধি, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের বেলায় চুপটি আসি'। রাজনীতিকদের আরেকটা ব্যাধির কথা বলা প্রয়োজন, '৮১, '৯১, '৯৬, ২০০১, ২০০৯ সাল পর্যন্ত একটা ধারা আমরা লক্ষ করেছি, ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্র অভ্যন্তরীণ কোন্দল, এলাকার দখল-চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও অবৈধ হাজারো ব্যবসা-বাণিজ্য (যেমন–রাজধানীর শত শত টেম্পোস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার চাঁদা ওঠানো) নিয়ে নিজ দলের মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রক্তারক্তি শেষে শক্তিশালীর কাছে দুর্বল পক্ষ হার মানে; নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত আপসরফা হয়ে যায়। কে

কত অংশ পাবে, কোন কাজ কার দখলে থাকবে, অদৃশ্যপটে মিটমাট হয়ে যায়, ক্ষমতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, চাঁদা আদায় চলতে থাকে। এসব টাকা কয়েকভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পক্ষের পকেটে যায়। এমন অদৃশ্য আদায় ও ভাগাভাগি নিয়ে বোঝাবুঝি শুধু রাজধানী নয়– জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় এলাকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এবার রাজনৈতিক দল এখনোও ক্ষমতায় আসার আগেই পত্রিকার পাতায় বা কানে খবর আসছে যে, এলাকা দখল, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পট দখল ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইনি। আমরা খালি চোখে দেশের ঘটনার আংশিক দেখি; আন্ডারওয়ার্ল্ডের খবর ভিন্নরূপী। জানলে ও বুঝলে চোখ চড়কগাছে উঠে যায়। এটা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এদেশে রাজনীতি মানে তো দেশসেবা, সমাজসেবা আদৌ নয়; রাজনৈতিক ব্যবসা, লাঠিয়াল বাহিনীর ক্ষমতাধিষ্ঠিতকরণ, সরকারি ও বেসরকারি বাহিনীর রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান, ক্ষমতার দাপট, লুটতরাজ ইত্যাদি। শুধু ডিগ্রী অব পারফরম্যান্স কম বা বেশি অথবা অতিবেশি। প্রশ্ন জাগে, এ জাতি কি এ ব্যামো থেকে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না?

আমিই তো ত্রিশ বছর আগে আমার বাচ্চাটাকে এক হাত ধরে হাঁটা শেখাতাম, তাকে নিয়ন্ত্রণও করতাম; তারপর সে ক্রমশ হাঁটা শিখে ফেলেছিল। সেজন্যই কয়েকদিন আগের লেখায় নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে আগে সংস্কার করে ঢেলে সাজাতে বলেছিলাম। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ চেয়েছিলাম পাঁচ বছর। এর কারণও ছিল। এ সময়টা মূলত রাজনৈতিক দলের সংস্কার, নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা, দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও চর্চার জন্য। এর সাথে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুধু সিলেবাস পরিবর্তন, মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তনই নয়, পুরো শিক্ষাব্যবস্থারও ব্যাপক সংস্কার জরুরি। এ নিয়ে অনেক কথা আছে। নইলে 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল'।

আমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু পরিবর্তিত আইনের বাস্তবায়ন যথাযথ হয় না। দেশের রাজনীতিকদের সবাই খারাপ এ কথাও বলছি না। তবে ভালো-সুস্থ চিন্তা করার নেতা কম, যা আছে তা দিয়ে দেশ চলে না। সুস্থ পথে চলার কর্মী নেই বললেই চলে। নেতা এবং কর্মীরা বেঁধে-দেওয়া শৃঙ্খলার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত নয়। গুরু দাঁড়িয়ে পেশাব করলে শিষ্যরা আবার পাক দিয়ে নাচে। তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। গুরুরা জেগে ঘুমায়। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থাও আমার জানা আছে। সংস্কারের সাথে অবিরাম নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করা অপরিহার্য। কিন্তু রোগীরা ওষুধ খেতে চায় না,

ব্যবস্থাপত্রও ছিঁড়ে ফেলতে চায়; স্বাধীনভাবে চলতে চায়। রাজনীতিকরা দেশটা শুধু তাদের ভাবে। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দেশচালকদের চিন্তাভাবনা ও কর্ম যদি সমাজসেবা, দেশগড়া ও জনসেবার অনুকূলে না হয়, খায় খায় মনোভাবের হয়; আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে সময় লাগে না। এসব তো আমরা বাস্তবে বারবার দেখে চলেছি। আইন তো লেখা থাকে বইতে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের যোগসাজশে না মানলে করার কী আছে! এদেশের রাজনীতিতে মানুষের মতো মানুষের বড্ড সংকট।

তবে সংবিধান পরিবর্তন করে কিছু নতুন ব্যবস্থা ও আইন তৈরি করার গুরুত্ব আমি আগের লেখাতেও লিখেছি। আইন সংস্কারকরা সেদিকে নজর দিলে তো! নতুন ব্যবস্থায় অপরাজনীতি ও লুটপাট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ডের অবিরাম সুপারভিশন থাকবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই তা থাকবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। সরকার হবে দলীয়, রাষ্ট্র হবে নির্দলীয়। রাষ্ট্র পরিচালনা একজনকে দিয়ে না করিয়ে পরিচালনার জন্য একটা নির্দলীয় ‘সুপ্রিম কাউন্সিল’ থাকবে। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরিচালনার কিছু ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতে থাকবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কাউন্সিলের হাতে থাকবে। কাউন্সিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ মেজরিটির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। কাউন্সিল আরও কিছু নির্দলীয় সদস্যের সাহায্য নিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারে থেকে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করবেন। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী বেআইনী কিছু করলে সংশ্লিষ্ট দলকেই কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সরকারি দলের কর্মকাণ্ড ও অপকর্মও কাউন্সিল মনিটরিং করবে। এমপিদের নিজ এলাকার উন্নয়নে টাকা ভাগাভাগির কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। তারা যেন সরকারি ও সাধারণ মানুষের টাকা নিজের পকেটে না তুলতে পারে এবং একইভাবে কর্মীবাহিনী বা খাদকের দল পুষতে না পারে, সে বিধান রাখতে হবে। রাজনীতিতে টাকার খেলা বন্ধ হলেই সুশিক্ষিত ও সৎ চরিত্রের লোক ক্রমেই রাজনীতিতে আসবে। তখনই এদেশের মানুষ মুক্তি পাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৪ দল বাদে অন্য সব দল একজোট হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে দেশের অনেক মঙ্গল হতো। এ সময়ে একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া প্রত্যেক দল অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অভিযান আন্তরিকভাবে পরিচালনা করলে আমরা বুঝতাম যে, তারা দেশের মঙ্গল

চায়। অন্যথায় হলুদ যতই খাওয়া হোক, রাঙা ছেলের স্বপ্ন সুদূরপরাহত এবং সবকিছুকে 'কপালের দোষ' না দিয়ে আমি নিজেদের কর্মদোষ ও ভাবনাদোষকে দায়ী করতে চাই।

তেমনিভাবে বিএনপির আগের প্রচার অনুযায়ী, আগামী নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে অন্তত দুটো মেয়াদের জন্য আন্তঃভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শুধু দেশের স্বার্থে 'জাতীয় সরকার' গঠন করলে সত্যিকারভাবে দেশ গড়া সম্ভব। এতে এক দলের নেতা-কর্মীদের ভুল অন্য দল যেমন ধরিয়ে দিতে পারবে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকবে। আমি চাই প্রতিটি দলই যেন অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেয় এবং অতীতের ভুল আর না করে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আন্তঃবিরোধ ও বিভাজন ভিনদেশি সম্প্রসারণবাদী শক্তির হাতকে শক্তিশালী করা ছাড়া এতে দেশের কোনো লাভ নেই এবং পরাজিত-পতিত শক্তিকে যেনতেনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বর্তমান দলগুলোকে তাদের চূড়ান্ত স্বার্থোদ্ধারে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি নিশ্চিত হয়েই কথাগুলো বলছি। ভিনদেশি শক্তি অতীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনত, বর্তমানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ঠিক একই অভিযোগ আনছে। এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য ভাবনার অনেক কিছু রয়ে গেছে। আমরা যদি বাংলাদেশিদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সামষ্টিক উন্নতির কথা না বিবেচনা করে যার যার দলীয় স্বার্থের বিচারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই, তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবেই বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কাকেই ত্বরান্বিত করবে। তখন ষাটের দশকে দেখা রূপবান ছায়াছবির গানই আবার মনে পড়বে, 'শেষের দুঃখ কাঁদলে সারবে না শেষের দুঃখ, ও কাঁদলে সা-আরবে না'। যে জাতি তার অতীত ভুলে যায়, সে জাতি আসলেই নিঃস্ব।

(প্রকাশ: ৩ অক্টোবর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

নিবন্ধ-রোমন্থন সময়ের প্রয়োজনে করতে হয়

(প্রকাশিত শিরোনাম: সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া পরিত্রাণ নেই)

'নীল দর্পণ' নাটকে পড়েছিলাম 'কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে'। বাসি হয়ে ফললে লাভ তেমন কিছুই হয় না। পরে বোঝা যায় কাজটা করা উচিৎ ছিল। এতে অনুশোচনা জাগে। তাতে কী লাভ! সময়ের করণীয় সময়ে বোঝাটা জরুরি। এজন্য, বিশেষ করে দেশ-চালকদের দূরদর্শী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। লালন গেয়েছিলেন, 'অসময়ে কৃষি করে মিছামিছি খেটে মরে, গাছ যদিও হয় বীজের জোরে, ফল ধরে না, তাতে ফল...'। পত্রিকার পাতায় লিখতে গিয়ে কত বিষয়ে কত কথাই-না বিভিন্ন সময় লিখি, ক'জনইবা গুরুত্ব দেয়! তাই মাঝে-মধ্যে নিবন্ধ-রোমন্থন প্রয়োজন হয়। পতিত সরকারের সময় থেকেই এখনো অনেক কথা লিখে চলেছি। কথাগুলো ভেবে দেখার লোকজন কম। যাদের ভাবার জন্য লেখা হয়, বিষয়টা নিয়ে তারা ভাবেন না। বড়োজোর এক দল অন্য দলের দিকে প্রাবন্ধিককে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমালোচনায় নামে; কখনো নামের সাথে কটুক্তিসূচক ট্যাগ ঝুলিয়ে দেয়। যা হবার তা হতেই থাকে, যে যা করতে চায়, তা চলতেই থাকে। আমরাও নাছোড়বান্দা, আমাদের কথা আমরা বারবার বলতেই থাকি। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের মতো অনুকূল বা প্রতিকূল বাতাসে তো আমাদের মতো মাস্টার সাহেবদের জিভ কখনো ঘোরে-ফেরে না; এখানেই সমস্যা।

রাষ্ট্রপতি পদ, রাষ্ট্রের প্রধানের বড় সম্মানের পদ; সাথে দেশের মান-মর্যাদা জড়িত। উনি অতীতের-বলা কথার সঙ্গে বর্তমান-বলা কথার মিল রাখতে না পেরে বিপদে পড়ে গেছেন। এটা অনেকের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত তো বটেই। রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও কি শোভনীয়? ভাবতে খারাপ লাগে, আমারা দেশের 'মহান রাজনীতিকরা' সব সম্মানীত পদগুলোকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এত ঠুঁটো জগন্নাথ ও বালখিল্য বানিয়ে ফেলেছি কেন? আসলেই বিষয়টা চিন্তার উদ্রেক করে। আমরা ক্রমেই পদের মর্যাদাকে ছোট ও তুচ্ছ বানিয়ে ফেলছি। না-কি আমরা দেশীয় সব সরকারি ও রাজনৈতিক পদ অপাত্রে সমর্পণ করছি? মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বড়-কর্তা– কার কথার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি বলুন? কথার সাথে কাজের মিল পাওয়া দুষ্কর। দেশের প্রতিটি পর্যায়ে সাধারণ নেতা-গোতা ও সোস্যাল টাউটদের মধ্যে এ রোগের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। লিখে-রাখা কথাও উল্টিয়ে ফেলা হয়। দেশের মর্যাদার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়। একবার লিখেছিলাম, কে কোন দল করে তার ভিত্তিতে মানুষ ভালো-না-মন্দ বিচার নয়, যার মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ যত বেশি, সে তত ভালো মানুষ। মানুষ

ভালো-না-মন্দ বিচারের মাপকাঠিও আমাদের সমাজে পরিবর্তন করে ফেলেছি। সমাজকেও বিভক্ত করে ফেলেছি, সবই অধঃপতনের পথ।

দুর্নীতি দমনের কথা অনেকবার লিখেছি। অসুবিধা হচ্ছে, দুর্নীতি বলতে আমরা অনেক রকম দুর্নীতির মধ্যে মাত্র এক ধরনের দুর্নীতি অর্থাৎ 'আর্থিক দুর্নীতি'কে বুঝি। অথচ সব ধরনের দুর্নীতিতে দেশ সয়লাব, যা আমাদের ঘিরে ধরেছে। এসবের বেশি রকমফের তৈরিতে অধুনা পতিত সরকারের অবদানই বেশি। অন্যদের অবদানও নেহায়েত কম নয়। ভবিষ্যৎ আগন্তকদের জন্য এসব ট্রেনিং, পথ ও পদ্ধতি নিশ্চয়ই ধন্বন্তরি পাথেয় হিসেবে কাজে লাগবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে এ নিয়েই আমরা এদেশে আছি। 'ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল'। এতে ভুগছে একমাত্র দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষ। অন্তর্বর্তী সরকারের আগমনে টাকা পাচার, লুটপাট কমলেও ঘুষ-বাণিজ্যের রেট হয়তো বেড়ে থাকতে পারে। এ নিয়ে তারা কতটুকু উদ্বিগ্ন, জানা নেই। আরো কিছুদিন গেলে পরিষ্কার বোঝা যাবে। 'স্বভাব যায় ম'লে আর ইল্লত যায় ধুলে'। এ কথাও তো কতবার কত রকমের উদাহরণ দিয়ে, কখনো টিপ্পনি কেটেও বলেছি। অঙ্গচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কি পচন রোধ হয়? যদিও আমরা সে চেষ্টা করি। 'বাকির আশায় নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এ ভূবনে'– লালনের এ গান গেয়েও অনেকবার শুনিয়েছি। বুঝাতে চেয়েছি, এদেশের নব্বইভাগ মানুষ মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে সততা, ইমানি বৈশিষ্ট্য বিদায় নিয়ে তাদের অধিকাংশ ভোগবাদে নিমজ্জিত এবং ধর্মের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তিকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমান সাতপুরুষ বসে খাওয়ার স্বপ্নে অবৈধভাবে সম্পদ মজুদের নেশায় মত্ত। অনেক দেশের অমুসলমানরাও তা করে না।

জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষার ঘাটতি হয়ে গেলে এসব নেশা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা যায় না, যার জন্য আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষার প্রবর্তন এবং সরষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভূত আগে তাড়াতে হবে; এর অর্থ পরিচালকদের 'আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর...' নীতি বাস্তবায়ন কর, হতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য সমমনা একদল লোক কই? রাজনৈতিক দলগুলোও এ নিয়ে ভাবে না। এসব বস্তাপচা-সেকেলে কথা ভেবে উড়িয়ে দেয়। আসলে জনগোষ্ঠীর মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার আপদ-মস্তক পচে গেছে। জনসম্পদ জন-আপদে পরিণত হয়েছে। এসব নিয়ে কারো কোনো টুঁ শব্দও নেই। সেজন্যই গত লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম, 'এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে'। আমি নিশ্চিত, ডাক্তার দক্ষ হলে রোগের নিরাময় এখনো সম্ভব; জাতীয় এ 'ক্যান্সারের' চতুর্থ ধাপ এখনো বাকি। কিন্তু দক্ষ ডাক্তার

এদেশে কোথায়? সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক পজিটিভ পরিবর্তন এবং অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া দেশের এ নাভিশ্বাস দশা থেকে উত্তোরণের অন্য কোনো পথ এই ক্ষুদ্র মাস্টার সাহেব দেখে না। তাই তো বলছিলাম 'কাঙালের কথা বাসি হলেই ফলে'। আমি তো দেখি, ১৪ দল বাদে অন্তর্বর্তী সরকার ও বাকি দলগুলোর সম্মিলিত ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া এ অকূল-পাথার থেকে পরিত্রাণের পথ অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। দেশ ও জনসাধারণের মুক্তি মেলে এমন শুভবুদ্ধির উদয় কি রাজনৈতিক দলগুলোর সহজে হবে?

এ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযোগ ওঠা শুরু করেছে। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ-পরিদপ্তরের লোকজন ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছে না, অর্থাৎ ভাবছে, 'ক'দিন বাদেই তো এদের বিদায়; গোলেমালে কাটিয়ে দেবো এ ক'টা দিন'। বিভিন্ন কাজ দেখে আমার কাছে এমনটিই পরিস্ফুট হয়েছে। আরেকটা বিষয়, কয়েকজন উপদেষ্টার কর্মদক্ষতা। আমার পরামর্শ ছিল নিয়মিত একসাথে বসে অসুবিধাগুলো একে অন্যের সাথে খোলামেলা শেয়ার করা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা। মানুষ নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের দিয়ে দায়িত্বমতো কাজ করিয়ে নেওয়া অনেক কঠিন বিষয়; এখানে সবাই মাতব্বর। বিশেষ করে এদেশে, যেখানে কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধের ঘাটতি রয়েছে, নির্দিষ্ট রাজনীতিকদের লেজুড়বৃত্তি করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কর্তৃত্ববাদী প্রতিবেশী ও তাদের এদেশীয় দীক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ মদদ এবং বিভিন্ন বিভাগগুলো দুর্নীতিতে দীর্ঘদিন ধরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অন্তর্বর্তী সরকারকে ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এসব প্রতিকূল পরিবেশ শক্তহাতে মোকাবেলা করেই কাজ করে যেতে হবে। এজন্য শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী উপদেষ্টা আরো কয়েকজন নিয়োগ দিতে হবে। গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় হলো: যে কারণে সেই স্বাধীনতার পরপরই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে ২০২৪ সাল নাগাদ তার পূর্ণতা পেল, সেই ভিত্তিগুলো প্রয়োজনমতো সংস্কারের মাধ্যমে দুর্বল বা উচ্ছেদ করতে আমরা পারছি কি-না, তার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতে আবার এদেশে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে কি-না সে বিষয়টি। এ জটিল অবস্থাকে সামাল দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন বলে আমি আদৌ বিবেচনা করি না। এ মুহূর্তে এদেশের সামনে আর কোনো বিকল্প দেখিনে। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি, এটা এদেশের ছাত্র-জনতার বিপ্লব। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে দেড় যুগ আগে। এ সরকারের নাম 'বিপ্লবী সরকার' হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এতে দেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার অনেক সুবিধা আছে। আমার মতো

অখ্যাত মাস্টার সাহেবের লেখাগুলো এতদিন ধরে নীতিনির্ধারকরা গুরুত্ব দিলে এবং বর্তমানে কিছু উপদেশ নিলে নিশ্চিতভাবেই দেশ উপকৃত হতো।

সংবিধান পরিবর্তন নিয়েও অনেক কথা লিখেছি। বিচারপতি অপসারণে 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' পুনর্বহালের রায় আমাকে আশান্বিত করেছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত আমার প্রস্তাব ছিল: রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' নাম থেকে 'জুডিশিয়াল' শব্দটা মুছে দিতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজনৈতিকভাবে একজনকে মনোনীত না করে অরাজনৈতিক 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠন করে এর কাজের আওতাকে অনেক বাড়াতে হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে হবে সরকার প্রধান। উভয়ের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে ভারসাম্য থাকতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় কার্যত রাষ্ট্রের বলতে কেউ নেই, সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তি। বিচার বিভাগসহ সরকারের নির্বাহী, আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণের কাজও 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর হাতে দিতে হবে। সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধীদলের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণও এ কাউন্সিল করবে। সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে সরকারি ও বিরোধী দলের সকল অপকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। এতে সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সব অপকর্ম বন্ধ হবে। এক-ব্যক্তিভিত্তিক দলীয় ব্যক্তিকে সাক্ষিগোপাল হয়ে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বুঝতে হবে স্টিয়ারিং ছাড়া আমাদের রাজনীতির গাড়ি তেপ্পান্ন বছর ধরে চলছে। সেজন্য এত সমস্যা, দুর্নীতি, লুটপাট, গণহত্যা; বলতে গেলেই নির্যাতন, গুম। এভাবে কোনো দেশ চলতে পারে না, চলা উচিৎও নয়। আবার প্রেসক্রিপশনের দায়িত্ব রোগীকে দিলে সে রোগ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, বরং রোগী মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি। সেজন্য অনেক অপ্রিয় সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারকেই করতে হবে। এসব অনেক কটু কথা পতিত সরকারের সময় থেকেই লিখে আসছি। সুপ্রিম কাউন্সিল ১৫ থেকে ২১ সদস্যের অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর জন্য অরাজনৈতিক নির্বাচকমণ্ডলীও থাকবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে রাষ্ট্রের রক্ষক, সরকার হবে রাজনৈতিক। এ বিষয়ে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, না সুপ্রিম কাউন্সিল' (১০.৯.'২৪) এবং 'রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা' (২৮.৮.'২৪) শিরোনামে এ পত্রিকাতেই কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিখেছিলাম। এ পথে গেলে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনার আর দরকার হয় না; এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যায়। রাজনীতিতে অর্থের অবৈধ লেনদেন বন্ধ হয়, দেশব্যাপী শৃঙ্খলা ফেরে এবং সুশিক্ষিত ও সৎ মানুষ ক্রমেই রাজনীতিতে আসে।

প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের রাজনীতিকরা কি আসলেই অন্তর থেকে এসব চান? এত ক্ষুদ্র একটি দেশ, যথাযথ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কিইবা এমন কঠিন কাজ! অসুবিধা হলো রোগী ওষুধ খেতে চায় না। ওষুধ খেলে ধান্দাবাজি বন্ধ হয়ে যায়। কতদিন আর পথের দিকে অনিমিখ তাকিয়ে থাকা যায়! হয়তো অত্যুক্তি হবে, তিনশ' টাকার স্ট্যাম্পের ওপর নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, আমাদের পরামর্শমতো যদি আইন ও বিধি পরিবর্তন করা হয়, নীতিমালা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এদেশের মানুষ বাঞ্চিত সুশিক্ষার ও উন্নয়ন-পথের নিশ্চিত সন্ধান পাবে এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হবে। অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে শিক্ষিত-সৎ মানুষের চেয়ে লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান ও ঘুষখোরদের কদর বেশি, এটা বড্ড দুঃখের বিষয়। আরো সত্য বললে, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত টাকা ও স্বার্থের জোগান দিয়ে পরাধীনতার নিগড়ে এ দেশকে বাঁধার জন্য এদেশের অনেক মানুষ ও গোষ্ঠীকে কিনতে পাওয়া যায়। এসব থেকে নিস্তার পাওয়ার একটাই পথ, জোর করে হলেও দেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলবত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন, নীতি-নির্ধারণ, সমন্বয়সাধনের ও অন্য আরো অনেক কার্যাবলি সাধনের জন্য স্থায়ী 'শিক্ষা কমিশন' গঠন করা। এসবের মডেল ইতোমধ্যেই এ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

(প্রকাশ: ২৭ অক্টোবর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশ–সংস্কারের খোলাবাজারে বারোয়ারি বয়ান

(প্রকাশিত শিরোনাম: দেশ সংস্কারে যা করা যেতে পারে)

দেশ-সংস্কার মৌসুম চলছে। বিগত সরকার পতনের আগে ও পরে দেশ-সংস্কার নিয়ে অনেবারই এ কলামে লিখেছি। আগের লেখাগুলো পতিত সরকার গুরুত্ব দেয়নি। পরে তিন-চারটা লেখায় বেশ কিছু সংস্কার-ভাবনা দল-নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছি। একই কথা অবশ্য বারবার লিখতেও খারাপ লাগে। একটাই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট দেশের কীভাবে কল্যাণ করা যায়। বর্তমানে এদেশের আইন ও নিয়ম-নীতিতে সংস্কারের তোড়জোড় দেখে আরো কিছু কথা লেখার প্রয়াস অব্যহত রাখছি। এগুলোকে বারোয়ারি বয়ান বলা যায়। জানি না, এসব কথা হালে পানি পাবে কি না। একটা কথা আগে বলে রাখি: স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে দলগুলো সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারণা আগে থেকেই মনে জন্মেছিল; বিগত ১৬ বছরে রাজনীতিকদের সীমাহীন দুষ্কর্মে মনের গভীরে ঘৃণায় দগদগে ঘা সৃষ্টি হয়েছে, যা মলম মালিশে নিশ্চয়ই যাবে না; বেশি-মাত্রার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের কথা। কারণ সদ্য পতিত রাজনীতিকরা নিজেরা লুটেপুটে খেয়েছে, আবার সাধারণ জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে রেখে গেছে, যা এত সহজে মেরামতযোগ্য নয়। এতে নীতি-আদর্শহীন সামাজিক টাউটদের পোয়াবারো হয়েছে। এখনো সমাজের পরতে পরতে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেসব চোরচোট্টা ও বিবেকবোধরহিতরা ধর্মের কাহিনী শুনবে না, জীবনযাত্রাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, দেশকে আরো ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। তারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাংলাদেশিদের আবদ্ধ না করা পর্যন্ত পূর্ণ তৃপ্তি পাবে না, তাদের এ অপচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাদের 'পিরিতে মজেছে মন, কিবা মুচি, কিবা ডোম'।

সাধারণভাবে অতি বুদ্ধিমান প্রাণিকে দুভাবে ভাগ করা যায়– মানুষ এবং অমানুষ। মনুষ্যত্বের গুণাবলি যাদের মধ্যে বেশি তাদেরকে মানুষ বলা যায়। অমানুষ দেখতে মানুষের মতো হলেও তারা বর্বর দলভুক্ত। আভিধানিক অর্থে অমানুষ বলতে মনুষ্যত্ববর্জিত, পশুতুল্য মানুষ বোঝায়; আমার দৃষ্টিতে এদেরকে 'নরাধম' বলা যায়। এরা মানুষ নামের কলঙ্ক, স্বদেশবিরোধী, পরচ্ছন্দানুবর্তী। ভাবতে কষ্ট লাগে, ১৬ বছর যারা আধিপত্যবাদী প্রভুর সহায়তায় গুরু-চেলা মিলে বিরোধী দলগুলো নির্মূলের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ দমন-পীড়ন-নির্যাতন, গুম-হত্যা, ডাহা মিথ্যাচারিতা করলো, হাজার হাজার ছাত্র-জনতার বুকে নির্দ্বিধায় গুলি চালালো, সাধারণ মানুষের অর্থকড়ি, ব্যাংক-লুটপাট, বেপরোয়া আত্মসাৎ ও সর্বস্ব বিদেশে

পাচার করে দেশবাসীকে আকণ্ঠ ঋণের ভারে ডুবিয়ে কোষাগার চেটেপুটে বিদেশে পালালো, তাদের মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনা ও অপরাধবোধ কাজ করে না। অমানুষের কোন নিম্নপর্যায়ে পৌঁছলে তারা নিজেদেরকে এখনও মানুষ বলে দাবি করতে পারে, আজব কাণ্ড ও অমানুষ বটে! ঢাকার শাপলা-চত্বর ট্রাজেডি থেকেই আমি তাদের মনুষ্যত্ববর্জিত মানুষ নামের কলঙ্ক, ধাপ্পাবাজ ও পলিটিক্যাল টাউট বলে চিনে ফেলেছিলাম। এদের সংখ্যা এদেশে নেহায়েত কম নয়। এজন্যই দেশ মেরামত এত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

অনেকে দুর্নীতি-গণহত্যা করেছে, আবার অনেকে তাদের দেখে শিখেছে, সুযোগ পেলে বাস্তবে কাজে লাগাবে। তাই প্রথম প্রস্তাব হলো: রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক সংস্কার আগে না করলে অন্য আইন সংস্কারে তেমন ফলোদয় কিছু হবে না। ক্যান্সার চিকিৎসায় রোগী বাঁচাতে গেলে ডাক্তারকে কষ্টদায়ক ক্যামোথেরাপি প্রয়োগ করতেই হবে। ভূতে পাওয়া রোগী হলে তো কবিরাজকে গালাগালি করতেও ছাড়বে না। আইন থাকে বইয়ের পাতায় লেখা, তাকে বাস্তবায়ন না করলে আইন তো নিজে বাস্তবায়িত হয় না। জনসম্পদ পচে আপদে পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপ দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি; যদিও দেশ গড়ার প্রি-রিকুইজিট হলো জনগোষ্ঠীকে চাহিদামতো জনসম্পদে পরিণত করা। তাছাড়া সংস্কার কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য না করে এদেশের অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব, উন্নতি ও জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। এতে কোন দল কি ভাবলো, এটা দেখার সময় এখন নেই, সেজন্যই নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকারকে কোমরে জোর বেঁধে কাজে নামতে হবে। সবার স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করা কঠিন। যে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস শক্ত হাতে দমন করতে হবে। কাউকে বা কোনো মতলববাজ গোষ্ঠীকে কোনোরকম ছাড় দেবার অবকাশ নেই। জনগোষ্ঠী সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অবাধ গণতন্ত্র না দেওয়াই শ্রেয়।

আগের লেখায় রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনে আমার প্রস্তাব ছিল প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকারব্যবস্থা। দেশ চালাবে রাজনৈতিক দলীয় সরকার; রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেখভালের জন্য এবং রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন বিভাগে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৫ থেকে ২১ সদস্যের অরাজনৈতিক 'সুপ্রিম কাউন্সিল' থাকবে, যারা নির্ধারিত অরাজনৈতিক পেশাজীবী নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এতে বর্তমানে সমমনোভাবাপন্ন দলীয়ভাবে মনোনীত একজন রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা লোপ পাবে। বিস্তারিত জানার জন্য ২৮.০৮.'২৪ ও ১০.০৯.'২৪ তারিখে প্রকাশিত কলাম

পড়ুন। (যুগান্তরে প্রকাশিত আমার সব লেখা পেতে নীচে দেওয়া ওয়েব-পেজ দেখুন)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুধু একটা নির্বাচন করে দায়িত্ব হস্তান্তর করাই এ সরকারের জন্য যথেষ্ঠ নয়। কালবোশেখির প্রচণ্ড ঝড়ে লাইনচ্যুৎ হওয়া একটা ট্রেনকে লাইনে এনে গন্তব্যে পৌঁছানোর সামগ্রিক ব্যবস্থা ঠিকঠাক মতো করাই ছাত্র-জনতার বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল। আমরা যেন কোনোমতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে যায়। এখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই। আমার দৃষ্টিতে এ বিপ্লব এখনও শেষ হয়ে যায়নি, উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে মাত্র। ছাত্র-জনতাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে আমরা পারছি না। বিপ্লবের ভাষা কঠিন; এখানে উদারতার কোনো স্থান নেই। উপদেষ্টাদেরও সেই শক্ত মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে অথবা কেউ কেউ অপারগতা দেখালে পদ ছাড়তে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের এত অল্পে পরাভব মানা ঠিক হবে না। 'সংখ্যালঘু নির্যাতন কার্ড' নামে মতলববাজি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা শক্ত হাতে দমন করা এখনই দরকার। দীর্ঘ ১৬ বছর তাদের দাবিদাওয়া কোথায় ছিল? ভারতের মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠীর উপমহাদেশব্যাপী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েমের উদগ্র আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী মনোভাব, শোষণ, তাদের পালিত পা-চাটা সেবাদাস দিয়ে এদেশ শাসন এবং এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজ বিপন্নপ্রায়– সবকিছু কুটনৈতিক চ্যানেলে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে।

পরিবেশ এমন যে, দেশপ্রেমী সব রাজনৈতিক দলকে এখন ধৈর্য্য ধরতেই হবে। আমি বারবার লিখে চলেছি যে, ১৪ দল বাদে সব রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সংস্কারের জন্য ভালো পরামর্শ দেবে। যদিও দেশের অনেক মানুষের আত্মোপলব্ধি নেই বললেই চলে; এদেশে 'মুনা যায় উজান, তো ধুনা যায় ভাটি'। বুঝতে হবেঃ প্রতারণা, স্বার্থপরতা ও 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'-এর কারণে স্বাধীনতার কমপক্ষে চল্লিশ বছরের অনেক মূল্যবান সময়ই পার হয়ে গেছে; স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের কিছুই অর্জিত হয়নি। ইতিহাস বলে, শুধু মধ্য এশিয়ায়ই অনেক জাতির অস্তিত্ব কালের বিবর্তনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার বড্ড ভয়, গত সপ্তাহের লেখায় লিখেছিলাম, 'জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে দূর ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পোটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিদের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অন্য কোথাও অজানা গন্তব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?' এ চৈতন্যবোধ দেশপ্রেমী বাংলাদেশিদের যত তাড়াতাড়ি ফেরে ততই দেশের কল্যাণ। আগেও অনেকবার লিখেছি, বাংলাদেশিরা বড্ড আত্মবিস্মৃত ও স্বার্থপর জাতিতে পরিণত হয়েছে; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এমন ছিল না। দেশ ও মানুষ গড়তে দুটো বিষয়

অপরিহার্য জানতে হবে– দেশকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিতের ওপর দাঁড় করানো এবং জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করা। যাহোক আজ কয়েকটা প্রস্তাব রাখি।

সরকারের মেয়াদ চার বছর না করে পাঁচ বছর রাখাই সমীচীন হবে। ঘন ঘন নির্বাচনে খরচ বাড়ে। নির্বাচিত সরকার উন্নয়নের কিছু কাজ করতে না করতেই মেয়াদ শেষ হবে। বাংলাদেশিরা রাজনীতি-পাগল হয়ে গেছে। কারণ রাজনীতি এদেশে বিনাপুঁজির লাভজনক ব্যবসা। কোনো জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা নেই। এদের মধ্যে কীভাবে জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনা যায়, তা আগে ভাবা দরকার। সেজন্য সংস্কার। বর্তমানে রাজনীতিতে দেশশোষণ আছে– নেই সমাজসেবা ও জনসেবা; শুধুই মিথ্যাচার, ধাপ্পাবাজি, রাজনীতির ব্যবসা আর প্রতারণার কৌশল। মানুষকে রাজনীতিমুখীতা থেকে ফিরিয়ে কর্মমুখী ও সমাজসেবামুখী করতে হবে। এরও উপায় ও মডেল আছে। বিকৃতমনা মুখসর্বস্ব লাঠিয়ালবাহিনীর দখলিস্বত্বে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষের এদেশে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সংস্কারের কথা শুনছি। এর অনেক দূরদর্শী প্রভাব আছে। স্থানীয় সরকারে দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াতে সমাজে বিভক্তি, দলাদলি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। গ্রামে-গঞ্জে আইনের শাসন নেই বললেই চলে। মুখ ও দল বিবেচনায় শালিস-দরবার হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যান-মেম্বররা শালিসের নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে খাচ্ছে। বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই রক্ষা করে কেন্দ্রীয় নেতারা। সমাজে দলীয় স্বজনপ্রীতি বেড়ে গেছে। সামাজিক সুশিক্ষা নির্বাসনে। সরকার থেকে গম, টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি নামে যত আর্থিক সুবিধা যায়, নিজ-দলীয় লোকজনের মধ্যেই বন্টন হতে দেখা যায়, বিরোধী ও সাধারণ লোকজনের কপাল পোড়ে। রাজনীতির দাপটে কেউ কিছু বলেও না। সমাজকে সুস্থ বানাতে বা সমতার নীতি বহাল রাখতে স্থানীয় সরকারে অরাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বিকৃত রাজনীতির চর্চা সমাজে কমে যাবে। আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধু সবাইকে দলে অঙ্গিভূত করে রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে চাই। এতে সমাজে রাজনৈতিক টাউট শ্রেণি ও রাজনীতির ব্যবসার উদ্ভব হয়, হয়েছেও তাই। বিকৃত ও মতলববাজি রাজনীতির কারণে দেশ, সমাজ ও শিক্ষা যে ধ্বংস হয়ে গেল, এটা আমরা কেউ ভেবে দেখিনে। দেশে সব সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনীতি।

এদেশে দেশপ্রেমী দূরদর্শী রাজনীতিবিদের বড় অভাব। প্রায় সব দল দলবাজি করে টিকে থাকতে চায়। কোনো দলই ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে না, কে কোন

দল করে, এটাই তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। দেশকে অন্যায়, দুর্নীতি ও অরাজকতার দিকে ঠেলে দেওয়া যত সহজ, ভালো পথে ফিরিয়ে আনা তত সহজ নয়, এ ভাবনা তাদের মাথায় নেই; তাই বর্তমান এ দশার উৎপত্তি। দেশের পরিবেশ ক্রমেই অবনতির দিকে। শুধু গণতন্ত্র নয়; সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সমাজে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে, সামাজিক শিক্ষা ত্বরান্বিত করতে হবে। তা না হলে যত চেষ্টাই করা হোক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান বাড়বে না। গবেষণায় দেখা যায়, এ দুটো চলকের মধ্যে ধনাত্মক সহ-সম্বন্ধ রয়েছে।

পনেরো বছর ধরে যেসব সরকারি বিভাগগুলোকে মনমতো করে দলীয় নিজস্ব লোকবল দিয়ে সাজানো হয়েছে, এত অল্প দিনে নিখাদ কর্মঠ অফিসার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রায় সবাই দলবাজ, দুর্নীতিবাজ, বাকিরা চাকরিচ্যুৎ বা ওএসডি হয়ে বসে আছেন। সরকারি কর্মকর্তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তা। চলনে-বলনে ও কাজে এসব চিন্তাধারা ও আইনের প্রয়োগ উঠে গেছে, তারা এখন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা। সেজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণবিধি পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে হবে। এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে ভালো পথে নিয়ে আসা অনেক কষ্টকর বিষয়। এখান থেকে সহজে এ জাতি মুক্তি পাবে না। রাষ্ট্র পরিচালনা (সুপ্রিম কাউন্সিলের মাধ্যমে) সরকার পরিচালনা থেকে আলাদা করে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এনে বিভিন্ন বিভাগগুলো ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে 'অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে' কথাটা ভুললে চলবে না। এদেশে ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন বিষয়টি বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথও তখন থাকবে না। সেজন্য মনে হয় প্রবাদটা এভাবে এসেছে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'।

(প্রকাশ: ১১ নভেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সংবিধান সংশোধনের কিছু খোলামেলা প্রস্তাব

সংবিধান পরিবর্তন মৌসুম চলছে। বিস্তারিত লেখা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কয়েকটা দফা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

১. মূলনীতির পরিবর্তন: সংবিধানের মূলনীতিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিস্থাপিত করে সাথে দুটো মূলনীতিকে যোগ করা যায়– ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসতা এবং গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম না-বোধক শব্দ, পরিহার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক, সব ধর্মই সমান।

২. সরকার ও রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন: সরকার কাঠামোতে ক্ষমতাসীন সরকারি দল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সুযোগটাই রাজনৈতিক দল নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলই এদেশে সব অন্যায়ের সুতিকাগার। এরা সমাজ ও সমাজের মানুষকে মানব-আপদ করে তুলছে। এজন্য বিধান পরিবর্তন করে সব রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। প্রতিটা দলে ভালো স্বভাবের লোকের তুলনায় খারাপ প্রকৃতির নেতা-কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক। এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকবে বটে কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যপদ নিতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দলীয় নেতা-কর্মীদের তালিকা জমা দিতে হবে। যে কোনো কর্মী বা নেতার দুর্নীতি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট দলকে রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। আমরা এদেশের রাষ্ট্রপতি পদটাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছি। সেজন্য রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে।

৩. এমপিদের দায়িত্ব বণ্টণ ও কর্মপরিধি: বাস্তবতা বলে, দেশের যত অপকর্মের হোতা, চোরাকারবারি, দুর্নীতিবাজ, টাকার বিনিময়ে সংসদের দলীয় সদস্যপদ কেনা-বেচা, এমপি নির্বাচিত এলাকার মধ্যমণি হয়ে সব সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করা, উপায়-রোজগার করা, এলাকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করা, এলাকার বিভিন্ন পক্ষ ও সমিতি ইত্যাদি থেকে অবৈধ টাকা রোজগার করার ফাঁদ তারা তৈরি করেন। এমপি হয় টাকার জোরে এবং আরো টাকা তৈরি করার জন্য। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় অর্থের বণ্টন ও উন্নয়ন কাজে অর্থের লেনদেন এবং অর্থ ও অনুদান সংশ্লিষ্ট ভাগবাঁটোয়ারার কোনো বিষয় ও ক্ষমতা থেকে সংশ্লিষ্ট এমপিকে দূরে রাখার বিধান থাকবে। ফলে এমপি হওয়াটা কোনো লাভজনক পেশা

হবে না। তারা সংসদে আইন প্রণয়ন, দেশের উন্নয়ন ও সমাজসেবার বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। এতে টাকার অভাবে ও দুর্নীতি করেন-না বলে যারা এমপি হতে পারেন না অথচ সুশিক্ষিত, নীতিবান ও সমাজসেবা করতে ইচ্ছুক– তারা রাজনীতিতে আসবেন। বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যই অধিকাংশ নেতাকর্মী রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়। বর্তমান রাজনীতি হয়ে গেছে যত দুর্নীতিবাজ ও সোশ্যাল টাউটদের রাজনীতির নামে মিথ্যাচার ও লাঠি-পুঁজির ব্যবসা।

৪. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার: দেখলাম মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারও একনায়কতন্ত্রের নামান্তর। তাই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জনপ্রতিনিধি (এমপি) নির্বাচন করবে। এ পদ্ধতিতে সমাজের কালা জাহাঙ্গীর, মুরগি মিলন গং যেমন এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, আবার এমপি আনার গংও এমপি হতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী হচ্ছে কিনা রাষ্ট্র তা তদারকি করবে। রাষ্ট্রীয় প্রধান যদি একজন হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের অনুগত কাউকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ফেলেন। তিনি দলীয় কল্যাণ বেশি দেখেন ও ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হন। এটা পদের জন্য মর্যাদাহানিকরও বটে। এজন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অধিক উপযুক্ত।

৫. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা: এদেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এত ছোট একটা দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চলে না। আবার এদেশে প্রদেশ করার একটা ঝুঁকি আছে। এতে দেশ বিভাজনের এবং কোনো অঞ্চল বেহাত হবার সম্ভাবনা বেশি। প্রতিটা বিভাগকে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

৬. সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন: বিচারপতি অপসারণে 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' পুনর্বহালের রায় আমাকে আশান্বিত করেছে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' নাম থেকে 'জুডিশিয়াল' শব্দটা মুছে দিতে হবে। 'সুপ্রিম কাউন্সিল' বা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল' গঠন করে এর কাজের আওতাকে অনেক বাড়াতে হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে একটি অরাজনৈতিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধিত্বকারী তত্ত্বাবধান বডি এবং রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে হবে সরকার। সরকার হবে দলীয়, রাষ্ট্র হবে নির্দলীয়। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। বিভিন্ন অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠনের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ দুই লাখ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে ভারসাম্য আনতে হবে। কাউন্সিল 'ব্লাড হাউন্ড'

না হয়ে 'ওয়াচ ডগ'-এর দায়িত্ব পালন করবে। কাউন্সিলরের সংখ্যা ১৫ থেকে ২১ জন হতে পারে। সংবিধানে তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির সীমানা নির্ধারিত থাকবে। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর হওয়ায় কাউন্সিলের মেয়াদ ৬ বছর হবে।

বিচার বিভাগসহ সরকারের নির্বাহী, বিচার ও আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের অনেক কাজও ভারসাম্যপূর্ণভাবে 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর হাতে থাকবে। সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধীদলের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণও এ কাউন্সিল করবে। সরকারি ও অন্য রাজনৈতিক দলের অসৎ কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক-ব্যক্তিভিত্তিক দলীয় ব্যক্তিকে সাক্ষিগোপাল হয়ে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কাউন্সিলরদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকবে। তারা হবেন দেশবরেণ্য এবং শ্রদ্ধেয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচন কমিশন 'সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচন' পরিচালনা করবে।

প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর একা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২/৩ কাউন্সিলরের সম্মতির এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সম্মতি নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কাউন্সিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে নির্বাচন চলাকালীন এক বা একাধিক অরাজনৈতিক যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে তিন মাসের জন্য নিয়োগ দিতে পারবে। এ পদ্ধতিতে গেলে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব আর দরকার হয় না। এক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত 'ন্যায়পাল'-এর বিধান না রেখে ন্যায়পালের কার্যাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকটা সুপ্রিম কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রয়োজন রাজনীতিতে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংপ্রভ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। এ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তাদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করবে। দেশপ্রেমী-সুশিক্ষিত, সুনীতির ধারকগণ দেশসেবার জন্য রাজনীতিতে আসবেন। কোনো একক পক্ষের অদূরদর্শীতা, বিদেশী শক্তির প্রতি দেশবিরোধী আনুগত্য ও দাসত্ব এবং গদি রক্ষা করতে গিয়ে এ দেশ যেন কোনোদিন 'দ্বিতীয় ফিলিস্তিনে' পরিণত না হয়। এখানেই আমার বড্ড ভয়।

৭. রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন: দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না। এদেশের কোনো নাগরিককে রাজনীতি করতে হলে সাধারণ সমাজে এসে রাজনীতি করতে হবে। নইলে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্যে

প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে সুষ্ঠু কাজকর্মের পরিবেশ যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। রাজনৈতিক আনুগত্যের মাধ্যমে পদ ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার উম্মুক্ত ব্যবসা চলছে। এখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত দেশের সুষ্ঠু পরিবেশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি আইন করে বন্ধ করতে হবে। প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা অরাজনৈতিক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন থাকবে। তারা ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার, দেশের উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলবে। এছাড়া প্রতিটা ফ্যাকাল্টিতে ছাত্রছাত্রীদের কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার এ্যাকটিভিটির জন্য একাধিক ক্লাব বা ফোরাম থাকতে পারে। দলীয় লেজুড়বৃত্তি, রামদা-চাপাতির ট্রেইনিং, চাঁদা আদায় করে ধনী হওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান কাজ সময় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণা করা। উপাচার্য নিয়োগও দলীয় ভিত্তিতে হবে না। নির্দলীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, যিনি শিক্ষার মান ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিতে পারবেন, এমন ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে।

৮. স্থায়ী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা: শিক্ষার মানোন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ ইত্যাদি করতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এই জনবল দিয়েই তা সম্ভব। প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিক নির্দলীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। এজন্য সাংবিধানিক আইনে একটা স্থায়ী 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' তৈরি করা, যার কার্যাবলি ও কর্মের আওতা সংবিধানেই লেখা থাকবে। এ কমিশন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। অতি সংক্ষেপে বললে এর কাজ হবে: পুরো শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ, কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর কাজের বিস্তৃতি হবে। এ কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক গড়তে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাইসাপেক্ষে বিদ্যমান শিক্ষকদের মধ্য থেকে অযোগ্য শিক্ষকদের বেছে স্বেচ্ছা অবসরেও পাঠাতে পারবে। ভালো শিক্ষক আনার জন্য প্রয়োজনে আলাদা পে-স্কেল দেওয়ার সুপারিশও করবে। মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু করবে; শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সকল কর্তৃপক্ষের কাজ নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং সমন্বয়সাধন করবে। শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে শিক্ষার মান নীচে নেমে গেছে। সার্বিক বিবেচনায় দশম শেণি পর্যন্ত 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা (জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা) চালুর কোনো বিকল্প নেই। এসব বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৯. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সালিশ-দরবারসহ প্রতিটা বিষয়ে দলবাজি ও টাকার খেলা উম্মুক্তভাবে চলছে। স্থানীয় সরকারে দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াতে সমাজে বিভক্তি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। মুখ ও দল বিবেচনায় শালিস-দরবার হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যান-মেম্বররা শালিসের নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে খাচ্ছে। সমাজে দলীয় স্বজনপ্রীতি বেড়ে গেছে। সরকার থেকে গম, টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি নামে যত আর্থিক সুবিধা যায়, নিজ-দলীয় লোকজনের মধ্যেই বন্টন হতে দেখা যায়। সমাজে সমতার নীতি বহাল রাখতে স্থানীয় সরকারে অরাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে সব সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনীতি।

১০. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনঃ এদেশে এমন কোনো সরকারি অফিস আছে কিনা আমার জানা নেই, যেটা দুর্নীতির কাল-ব্যাধিমুক্ত। এজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বিধিমালা পরিবর্তন করা ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ দরকার। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা নন, বরং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ হুঁশবোধ তাদের মধ্যে আইনের মাধ্যমে আনতে হবে।

১১. ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টনঃ এদেশে ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন বিষয়টি বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। এজন্য আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের ব্যবস্থা না করাই ভালো। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পোটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিদের একটা বৃহদংশ অন্য কোথাও অজানা গন্তব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

১২. অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে সংবিধান সংশোধন করবে। সরকারের মেয়াদ চার বছর না করে পাঁচ বছর রাখাই সমীচীন হবে। ঘন ঘন নির্বাচনে খরচ বাড়ে। নির্বাচিত সরকার উন্নয়নের কিছু কাজ করতে না করতেই মেয়াদ শেষ হবে।

(২৪ নভেম্বর ২০২৪ মানবজমিন পত্রিকার জনতার চোখ কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএঃ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আওয়ামী লীগ নিজেই রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে

ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক বিপ্লব প্রথম দিকে কোটা-সংস্কার থাকলেও, এখন একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে; তাই সংস্কারের ট্রেনকে গন্তব্যে নেওয়াটাই যৌক্তিক হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারের কোনো মানে হয় না। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতি আশানুরূপ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বিপ্লবের পূর্ণতা এখনো বাকি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতার সাথে পদাসীন উপদেষ্টা পরিষদের মনকষাকষি ক্রমশ বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া বেশকিছু উপদেষ্টা ও তাদের কায়েমি আস্থাভাজনদের প্রচ্ছন্ন সম্পৃক্ততা বিপ্লবের অভিমুখীতাকে পথভ্রষ্ট করছে। এতে লাভবান হচ্ছে ভারতের চিহ্নিত গোলাম– পরাজিত পতিত অপশক্তি। আমরা বাস্তবতা দেখে নিরুৎসাহিত হচ্ছি। তবে হাল ছেড়ে দিচ্ছিনে। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটা সুনির্দিষ্ট গতিপথ গড়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা দুর্ভাগ্যজনক। একটা সত্য আমার চোখে ধরা পড়েছে যে, ছাত্র-জনতার এ বিপ্লব হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী এবং মুজিববাদী দেশবিরোধী অপশক্তিকে চিরবিদায় জানিয়ে দেশের জন্য স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত টেকসই দেশোপযোগী আদর্শকে বেছে নিতে চেয়েছে। বিএনপি ও জামায়ায়ে ইসলামী এ মনোভাব বুঝতে না পারলে, সেটা তাদের অপারগতা। অন্তর্বর্তী সরকারেরও কোনো কোনো উপদেষ্টা এখনোও এটা আঁচ করতে পারেননি। অন্তত তাদের কোনো কোনো ব্যক্তির কাজ-কারবারে তা প্রমাণ করে। আরেকটা বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের বেশি বোঝার প্রয়োজন ছিল, তা করতে তারা কেন বিলম্ব করছেন আমার বোধগম্য নয়, তা হচ্ছে: বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার আনার প্রয়োজন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। উভয়ের মধ্যে বাস্তব সম্পৃক্ততার বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে। বিষয়টার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে আমরা ঢিমে-তেতালা তালে এগোচ্ছি; এ কাজও পরিণামে ব্যর্থ হতে চলেছে। এর মধ্যে বিএনপির একটা ক্ষুদ্র অংশ যারা হিন্দুত্ববাদের জোয়াল টানতে আগ্রহী তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ বোঝার ঘাটতি রয়ে গেছে।

দেশকে এ পর্যায়ে আসতে বাধ্য করেছে পার্শ্ববর্তী দেশের সেবাদাস পতিত সরকার। গৌরচন্দ্রিকা দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলি। চোখ বুজলে মনে হয়, সেদিনের কথা। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা আমার মোটামুটি জানা। মানুষের মনোবল ছিল অটুট; প্রায় সব দল দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতো। তাই তারা একজোট হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। এটা ছিল সামষ্টিক প্রচেষ্টা। শেখ মুজিব ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শেখ মুজিব দেশে ফেরার পর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও

ত্যাগ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন; সেজন্য যে স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে জনসাধারণ স্বাধিকার অর্জনে প্রাণপণ যুদ্ধে নেমেছিল, জনগোষ্ঠী যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল ও জীবন দিয়েছিল, তিনি দিনে দিনে সব স্বপ্নাবিষ্ট আশা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধ এদেশের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে সাধারণ ভাবুক মানুষের মনে এ ধারণা পরিস্কার হয়েছিল যে, স্বাধীনতার নামে ভারত সরকার পাকিস্তানকে নিজস্বার্থে দুভাগ করে দিল। বাংলাদেশ পেল নামমাত্র স্বাধীনতা ও একটা নতুন পতাকা। একটা আশ্রিত রাজ্যের মতো আমরা সবকিছুতে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেলাম। এতে বাংলাদেশ শাসন ভারতের জন্য সহজ হয়ে গেল। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে'। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশকে পরিবর্তন, একদলীয় বাকশালী শাসন, রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর প্রকাশ্য অত্যাচারে বিচারবহির্ভুত গুম-হত্যা ও নির্যাতন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে সুখ-শান্তির আশা ধূলিসাৎ করে দিল। সে সত্য ইতিহাস লিখে বর্তমান প্রজন্মকে বাস্তবতা অবহিত করার সময় এখন এসেছে। অবশেষে দেশের অবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে কিছু মধ্যম-পর্যায়ের বিদ্রোহী সামরিক কর্মকর্তা, যারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাদের হাতে '৭৫-এ শেখ মুজিবের শাসনের অবশ্যম্ভাবী পতন হলো। কারণ সরকার ভারতের পরামর্শে প্যারামিলিটারি-রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীকে সুযোগ-সুবিধা বেশি দিতে থাকলো; তাতে সামরিক বাহিনী অবহেলার পাত্র হয়ে ক্রমশ ভেঙে যাবার আতঙ্কে ভুগছিল। অনেক সামরিক অফিসার ও সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের সকল বিষয়ে দেশ পরিচালনায় খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত, অরাজকতা ও ভারতের কাছে নতজানু নীতি মেনে নিতে পারছিলেন না। শেখ মুজিব ও তার বাম-ঘরানার দোসররা এদেশের একত্ববাদী মানুষকে ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির কাছে জিম্মি করে ফেলেছিলেন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিব দেশ পরিচালনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্বাক্ষর প্রতিটা পদে পদে রাখছিলেন।

৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের সময়ে বাম দল প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘাড়ে চেপে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে সামরিক আইন ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশকে ইসলামি ধারায় উন্নয়নের পথে পরিচালনা করেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, মুজিববাদী কুচক্রীমহল ও তাদের সম্প্রসারণবাদী প্রভুর যোগসাজশে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জীবন দিতে হয়। এর মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা থেকে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ও মুজিববাদ ব্যর্থ হয়ে কালের

অতলে তলিয়ে যায়। এদেশের বাম ঘরানার কমরেডদের মধ্যে অনেক বিভাজন ও দলভাগাভাগি হতে আমরা অনেকবার দেখেছি। মুজিববাদের উত্থান ও পতনও শেখ মুজিবের ঘাড়ে বাম কমরেডদের ভূত চেপে বসার কারণেই হয়েছিল। বর্তমানে এদেশ এবং বিশ্বব্যবস্থা থেকে এ মতবাদ বিলীনপ্রায়। এরও যথেষ্ট কারণ আছে; তবুও এদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে এদের একটা জোট এখনও প্রতিটা নীতিনির্ধারণী কাজে সক্রিয়। কিন্তু কমরেডরা হিউম্যান-সাইকোলজিতে দুর্বল হওয়ায় আজও তারা বিশ্ব-রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তাদের বিতাড়িত হবার কারণ, পৃথিবীতে মানুষসৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে অপারগ। তারা মানুষকে ভোগবাদী নিছক একটা বুদ্ধিমান প্রাণি হিসেবেই গণ্য করে। কালের স্রোত সদা সামনে প্রবহমান। প্রতিটা প্রাণি ও অস্তিত্ব সময়ের এ স্রোতে সন্তরণশীল।

’৯৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে অপরিপক্ব শেখ হাসিনা ওয়াজেদের দেশ-চালনা বুঝে উঠতেই সময় পার হয়ে যায়। তারপর অনেক কৌশলে ভারতের সহযোগিতায় দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে। আবার সেই ছদ্ম-একদলীয় শাসন ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু। দেশের পুরো অর্থনীতি ধ্বংস; নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগকে নিয়ে নিখাদ দলবাজি, গণহত্যা, ভারতীয় গোপন বাহিনী দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে দেশচালনা প্রভৃতি পুরোপুরি চলতে থাকে। দুর্নীতি, বিচারহীনতা, নির্যাতন, খুন-গুম, কোষাগার ও ব্যাংক লুটপাট, নিজের ছেলেমেয়ে-আত্মীয়স্বজনসহ দলীয় লোকজনকে অবাধে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থসম্পদ তৈরির সুবিধা করে দেওয়া ও বিদেশে পাচার করতে দেওয়া; প্রভূর দেশের হিন্দুত্ববাদী শাসনের আদলে প্রভূর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় এদেশেও অনুরূপ শাসন ও রামরাজত্ব কায়েম, তাদের গোপন বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপে বাংলাদেশি জনগণকে ভোটের অধিকারহীন শাসন দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর ক্রমবর্ধিষ্ণু গতিতে দুর্দণ্ড প্রতাপে চলতে থাকলো। এতে প্রভূও খুব খুশি। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত স্বপ্ন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের হাত দিয়েই প্রভূর মনবাঞ্ছা প্রায় পূরণ হবার উপক্রম হলো। শেখ হাসিনা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে প্রভূ তোষণে মরিয়া হয়ে উঠলেন। এদেশে গণতন্ত্র থাক বা না-থাক, শিক্ষার মান অধঃপাতে যাক বা অর্থনীতি ধ্বংস হোক, তাতে প্রভূর কোনো যায়-আসে না। বরং এসব চলক যত নীচে নামে গুরুর শাসন পাকাপোক্ত করা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বস্তুবাদী মনোভাবে পরিণতকরণ, সেবাদাসের মাধ্যমে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত প্রক্রিয়া তত সহজ হয়। সহ্যসীমার বাঁধ যখন ভেঙে পড়ল, প্রকৃতির প্রতিশোধ শুরু হয়ে গেল। ছাত্র-জনতার বিপ্লবে গণহত্যার রক্তে শেখ হাসিনার তক্ত কয়েকদিনের ব্যবধানে ভেসে চলে গেল। শেখ হাসিনা গং অবশেষে বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় দেশ

ছাড়তে বাধ্য হলো। এ বিপ্লবে সাথে থেকে সাহায্য করেছে দীর্ঘ বছর ধরে সংগ্রামে লিপ্ত ও অত্যাচারিত-নিষ্পেষিত বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীরা। শেখ হাসিনা প্রভূর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পিছনে ফেলে রেখে গেলেন কমপক্ষে ১৫০০ ছাত্র-জনতার লাশের পাহাড় ও হাজার হাজার ছাত্র-জনতার জীবন্মৃত আহাজারি।

আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী কর্ম ও চিন্তা-চেতনা দেখলে একে কোনো রাজনৈতিক দল বলা যায় না; লুটপাট-সন্ত্রাসী কার্যক্রম, প্রভূর কাছে দেশ লিজ দেওয়া ছাড়া এর মধ্যে রাজনৈতিক কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে বিশাল ঋণের টাকাসহ সর্বস্ব লুট করে ভিক্ষার ঝুলি এদেশের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়েছে। দায় এসে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ও সাধারণ মানুষের ওপর। যদি কেউ এদেশের মঙ্গল চায়, আওয়ামী লীগ নামে যে এদেশে কোনো দল ছিল, ভুলে যাওয়াই সমীচীন। বিএনপি-জামায়াত-অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবেই ভাবুক কালবোশেখি ঘন-কালো ঝড়ো মেঘের কাছে সুশীতল-সুনির্মল বাতাস আশা করা চিরকালই অবাস্তব। স্বাধীনতা রক্ষার বিজ্ঞাপনের ধুয়োজারি গেয়ে দেশ লুটপাট ও 'মতলববাজ বন্ধুর' রামরাজত্ব কায়েম আর কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

সম্ভবত '৯১ অথবা ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে যাবার পর ক্ষোভের সাথে শেখ হাসিনা প্রকাশ্য বলেছিলেন, 'এক দিনও সরকারকে শান্তিতে থাকতে দেবো না'। বর্তমান অবস্থাও তাই। এদেশের যত লক্ষ কোটি টাকা নিজে এবং নিজের লোক দিয়ে আত্মসাৎ করেছে, তার একটা অংশ অন্তর্বর্তী সরকার ও পরবর্তীতে কোনো রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপ দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন এবং বিদেশে সরকারের নামে অপপ্রচার চালানোর কাজে লবিস্টদের নিয়োগে নিশ্চিতভাবেই ব্যয় হবে; হিন্দুত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী ভারতও এদেশ জঙ্গিদের অভয়ারণ্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের স্বকল্পিত বুলি বিদেশে অপপ্রচার করতে কোনো ত্রুটি করবে না। এতে মুসলিমবিদ্ধেষী মুরব্বিদের সমর্থনও নিশ্চয়ই পাবে; কারণ এটা বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের একটা অংশ। তাছাড়াও ভারত মুসলমানদের বহিরাগত শত্রু বলে সেই আদিকাল থেকে গণ্য ও প্রকাশ করে আসছে। তাদের পরীক্ষিত দাস ছাড়া কাউকেই তারা বিশ্বাস করবে না। নামে মুসলমান, বামপন্থী ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তিও তাদের সেবাদাস। যে 'মুসলমান কোপাও' অভিযানে যোগ দিতে পারে না, সেই জঙ্গি। আমাদের মুসলমান হয়ে জন্ম নেওয়াটাই তাদের চোখে একটা অপরাধ। এসব কঠিন বাস্তবতা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও আসন্ন রাজনৈতিক সরকার কতটুকু সজাগ? এতকিছু করার পরও তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে বিএনপি-

জামায়াত ও অন্তর্বর্তী সরকার গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর। এটা দেশের জন্য আত্মঘাতি ছাড়া আর কিছু নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতি মানেই নৈরাজ্য-বিভীষিকা-লুটপাট, দেশবিক্রি-গণহত্যা ও মিথ্যাচার; সে অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পরই এদেশপ্রিয় মানুষের অনেক হয়েছে। আবার সাড়ে ১৫ বছর ধরেও প্রমাণিত হলো। সবাইকে মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগ নিজেই এদেশে রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে। এখন ১৪ দল বাদে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত অন্তর্বর্তী সরকারের সে চৈতন্যোদয় সময়মতো হলেই হয়। বার বার পরীক্ষিত আওয়ামী লীগের দেশ-ধ্বংসাত্মক ও লেন্দুপ দর্জিমার্কা কর্মকাণ্ড এদেশের প্রতিটা দেশপ্রেমী মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে শংকিত করে তোলে। তিন সন্তানের জননীর কুমারিত্ব পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর আর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

বুঝতে হবে হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির দোসর এবং এদেশের নাস্তিক্যবাদী শক্তি এদেশের নব্বই শতাংশ মুসলমানের অস্তিত্ব ধ্বংসকারী ফ্যাক্টরের প্রতিভূ। এ ভুত যদি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে চেপে বসে, এ জাতির উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। তাই ইসলাম-বিদ্বেষী বাম ভুতের কুমন্ত্রণায় মাইনাস-টু ফরমুলা বা নতুন দল গঠন প্রক্রিয়া এড়িয়ে সুস্থ বুদ্ধি করাই অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য শ্রেয়। অনেকবার লিখেছি, অন্তর্বর্তী সরকারের পর দেশে জাতীয় সরকার আসা প্রয়োজন। আমি এদেশে অবাধ গণতন্ত্রের আপাতত পক্ষে নই। সময়ই বলে দেবে কখন অবাধ গণতন্ত্রের চর্চা করার সময়। অন্তর্বর্তী সরকারকে অজনপ্রিয় করার পেছনেও নিজেদের মধ্যে ও নির্বাহী বিভাগে ছদ্মবেশী লোকজন আছে। বরং সরকারের শুধু দেশ-সংস্কারসহ সদ্যকৃত গণহত্যার বিচার করাই যথেষ্ঠ হবে না; আনসার বিদ্রোহের নামে সেনাকর্মকর্তা হত্যাযজ্ঞ, শাপলাচত্বরের হেফাজতে ইসলামের গণহত্যার বিচারও করতে হবে। সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অবশিষ্ট দলগুলোসহ দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়ে অন্তত সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

(প্রকাশ: ১৩ ডিসেম্বর '২৪ দৈনিক ইনকিলাব)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশ সংস্কারের পাদটীকা

সরকারি অনেক বিভাগের সংস্কার সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট তৈরি শেষ হতে চলেছে। আমরা অপেক্ষায় আছি। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কতটুকু ভালো হবে, সেখানেই সন্দেহ। 'সংস্কার' শব্দটা অনেকে যত সহজভাবে উচ্চারণ করেন, আমি কিন্তু অসুবিধায় পড়ে যায়। বানানটাও বিদঘুটে। বানানে 'ষ' হবে, না 'স' হবে– এ ঘোর আজও পর্যন্ত আমার গেল না। তবুও অনেক বছর পর এবার অনেক জায়গায় শব্দটি অনেকবার লিখেছি। সংবিধান সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার নিয়ে অনেক হেদায়েতি বয়ানও পত্রিকায় লিখে পেশ করেছি, সরাসরিও পাঠিয়েছি। আমার হেদায়েত-বার্তা সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিটির পছন্দ হবে, এখনো বোধগম্য নয়। শুনে একটা বিষয় ভালো লেগেছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'মার্কা' না থাকার প্রস্তাব। বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি। জানার বিষয় আছে, রাজনৈতিক দলের নামটা প্রার্থীর নামের সাথে থাকবে কি না? আমি লিখেছিলাম, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া প্রয়োজন। 'পরণেওয়ালা ভালো জানে, জুতাটা কোথায় বিঁধছে'। আমি গ্রাম-গঞ্জের মানুষ বিধায় বাস্তবতা বুঝেই বলেছিলাম– চাল-গম, সুযোগ-সুবিধা বণ্টন ও গ্রাম্য সালিসে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব দেখে। এতে সমাজ পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে সমাজ ভরে গেছে। জনসাধারণকে রাজনীতি-সচেতন করতে গিয়ে রাজনীতির বিকৃত রূপ বিয়ে বাড়িতে, বাসর ঘরে, ক্ষেতে-খামারে, এমনকি গরুর হাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজকাল তো রাজনৈতিক স্থানীয় সরকারের কর্মে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও টাকার গন্ধ শোঁকা পুরোদমে চলছে। কোথাও আটকে গেলে উপরমহলের দলীয় লোকজন রক্ষা করে। 'তুমভিও কাঁঠাল খাইয়া, হামভিও কাঁঠাল খাইয়া'। কর্মের মাঠে, অফিস-আদালতে দল পরিবর্তন হয়েছে, টেবিলের পেছনে মানুষ তো কেউ না কেউ আছে; সিস্টেমও রয়ে গেছে। নির্দলীয় নির্বাচন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ছাড়া এসব কায়েমি বন্দোবস্ত থেকে নিস্তার পাওয়া অনেক দুরূহ। শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়াও এক্ষেত্রে কল্পিত ধারণাই থেকে যাবে।

কোনো রাজনীতিকের মুখে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে' এবং 'নেতা-কর্মীদের মধ্যে সততা থাকতে হবে' –এমন কথা কি ঘুণাক্ষরেও শোনা যায়? আসলে 'নড়ে বড়োসড়ো, কিন্তু বোঁটা শক্ত বড়'। এদেশে খুব কম রাজনীতিক আছেন যাদের মধ্যে 'সততা' শব্দটা অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। ছোট-বড় অধিকাংশ নেতা-কর্মীর কেউই আদর্শের কারণে রাজনীতি করেন না; মুখে যা-ই বলুক, ধান্দা

ভিন্ন। মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতার ভাগিদার হওয়া ও আর্থিক সুবিধার মালিক হওয়া। বুঝি, দীর্ঘদিনে অভ্যস্ত দুর্নীতির এ মচ্ছব থেকে সহজে পরিত্রাণ পাবার নয়। কামার যা গড়ে, মনে মনে গড়ে; গড়ার পরে বোঝা যায়– কি হলো। এ নিয়ে বেশি কথা বললে কোনো কোনো পক্ষ হেই হেই করে তেড়ে আসতে পারে, তখন জীবন বাঁচানো দায়। আমরা কাজে দেখতে চাই। কাজেইবা কতটুকু দেখবো অনুমান করতে পারি। উঠন্তি মূলো তো পত্তনেই মোটামুটি চেনা যায়। আমাদের স্বভাব হলো, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের বেলায় চুপটি আসি'। সে জন্যই সংস্কারের ফল নিয়ে ধন্দের মধ্যে আছি। একমাত্র দলীয় জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতা চলতি এ অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারে। সে কাজ সংস্কারের মধ্যে কতটুকু হচ্ছে?

রাজনৈতিক সংস্কারে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার কথা অনেক পত্রিকায়ও লিখেছিলাম। আমার দৃষ্টিতে এটাই সংস্কারের একটা প্রধান দফা হওয়া উচিৎ। একটা বড় দলে জেলা-উপজেলা, গ্রামে-গঞ্জের নেতা-কর্মীদের নীতি-নৈতিকতা না থাকলে শুধু বড় নেতার মুখের হুমকীতে অকাজ-কুকাজ থেকে কাউকে নিবৃত করা যায় না। আমরা এ যুগে রাজনীতির মাঠে খেলতে সাথে নিই পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, সোস্যাল টাউটদের; আবার কাজ চাইবো সমাজসেবা ও ত্যাগের মহত্ত্ব– তা কি হয়? 'ছাগল ধরিয়া যদি বলো কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'; কোনো কাজ হবে কি? যেমন স্বভাব ও প্রশিক্ষণ, কাজও তেমন হবে। আমার এসব কথা তো আধুনিক (?) সমাজে বস্তাপচা উপদেশ। তাছাড়া রাজনীতির সেরা পদে পর পর দু'বার একই পদে কেউ থাকলেন, কী থাকলেন না, এতে কিছু আসে-যায় না; প্রভাব অতি সামান্য। পরবর্তী সময়ে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার ওজর-আপত্তির অভাব হবে না। প্রয়োজন ক্ষমতায় থাকাকালীন জবাবদিহিতা। কার কাছে? অরাজনৈতিক পেশাজীবী নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে, বা রাষ্ট্রপ্রধানদের একটা টিমের কাছে। আমি রাষ্ট্রপ্রধান একজনকে না নির্বাচিত করে একটা 'কমিটি'কে নির্বাচনের কথা আগ থেকেই বলে আসছি। অরাজনৈতিক কমিটি হলে ভালো হয়। কমিটির নাম দিয়েছিলাম 'সুপ্রিম কাউন্সিল; অন্য নামও হতে পারে। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে যে দল সরকার গঠন করবে, সে একই দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান দলনিরপেক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত টিমের জন্য অরাজনৈতিক পেশাজীবীদের মধ্য থেকে নির্বাচকমণ্ডলী

তৈরি করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান একজনের তুলনায় একটা কাউন্সিল হলেই দায়িত্ব সুনিশ্চিত করা সহজ। এ ছাড়া মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার থেকে বেরিয়ে আসাটাই সংগত।

যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য কিসিমের বড় রাষ্ট্র হলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চলতো, এত ছোট্ট দেশে এ ধরনের আইনসভা ও প্রদেশ-বিভক্তি যুতসই হবে না। আবার জগাখিচুড়ি শুরু হবে। অনন্তকাল 'ট্রায়াল এন্ড এরোর' চলতে থাকবে। এর তুলনায় 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর ধারণা অনেক উন্নত এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলবাজি, দেশবিক্রির অন্তরস্থিত খায়েস, দুর্নীতির মহোৎসব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এ কাউন্সিলের হাতে দেওয়া যেতে পারে। নইলে ১৫ বছর ধরেই তো দেখলাম, সব বিভাগে নিরঙ্কুশ রাজনীতি ঢুকিয়ে একাকার করে ফেলা হয়। এ পদ্ধতি অন্য কোথাও নেই, এই অজুহাত ধোপে টেকে না। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর ধারণাও তো অন্য কোথাও ছিল না; আমরা এখন তা প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি না! দল যত বড়ই হোক, জেলা-উপজেলা ও গ্রাম-গঞ্জের নেতা-কর্মীদের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নেতাদের দলীয়ভাবে বহন করতেই হবে। আবার দলীয়ভাবে অপকর্মের জবাবদিহিতা রাষ্ট্রের কাছে করতে হবে। মূলত অপরাজনীতি, 'চাটার দল' নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যত মজবুত হবে, দেশ তত ভালো চলবে, কারো ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই; বাস্তবতা তাই বলে। নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের নামে এমপিদের মাধ্যমে আর্থিক বিলি-বণ্টন, কর্মীদের নিয়ে ভাগাভাগি রহিত করতে হবে। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন দেশ গড়তে ব্যর্থ হবে; আগেও আমরা তা দেখেছি।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দেশ। নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার। মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা সংবিধান থেকে উঠিয়ে দেওয়াই যৌক্তিক। আমি বাংলা ভাষার ছাত্র নই বটে; তবে সব অভিধানই শব্দটিকে ধর্ম না-বোধক বোঝায়। এর পরিবর্তে 'ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসা' শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে। মূলনীতিতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটাকে 'গণতন্ত্র' শব্দটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়; সাথে স্বাধীনতার তিন মূলনীতি। এদেশে পদ ও প্রার্থীতা ব্যাপকভাবে কেনা-বেচা চলছে, এ থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কী? সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা সহজ, তবে এদেশের প্রথা অনুযায়ী মতামত কেনা-বেচা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যাবে। চোখ কানা হলে যেদিকে তাকাই, সে দিকেই অন্ধকার।

এদেশে রাজনীতির নাম দুরাচারবৃত্তি, প্রতিহিংসা, ক্ষমতার দাপট ও দুর্নীতি; নাকি এসবের অপর নাম রাজনীতি– সব একাকার হয়ে গেছে। সংস্কার করে এ জঞ্জাল মুক্ত করা এতটা সহজ কথা নয়, এ থেকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। সেজন্য রাজনীতিকদের বিকৃত মানসিকতাকে সুস্থ করতে হবে। দুধ ঘোলে রূপান্তর হয়ে গেলে ঘোল থেকে মাখন পাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব না হলে সুশিক্ষিত মানুষদের নতুনভাবে রাজনীতিতে আনার বিধান করতে হবে। সংস্কারে এসব বিধানের দিকে নজর দিতে হবে। নইলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অর্থবহ হবে না। শুধু তাই নয়, দেশের অবস্থা বেশি খারাপ পর্যায়ে গেলে অর্জিত স্বাধীনতার অমঙ্গলও হতে পারে। কারণ আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নতুন ভূখণ্ড ছিল না, ছিল অতীত ভূখণ্ডেরই নতুন নাম ও পতাকা এবং শোষণমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বুকভরা আশা। সে কাজের কতটুকু অর্জিত হলো, কাদের ও কি কারণে অর্জিত হলো না, এখন সেই জিজ্ঞাসা। 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে পেলাম কাছে'। এখন কোথায় যাব? একাজের অগ্রগতির জন্য কোনো বিড়ালের মুখ-ভেংচিতে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেলে হবে না। করণীয় করে যেতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পরাজয় আমরা দেখতে চাই না। যে যেভাবেই সমালোচনা করুক, আমরা চব্বিশের আগস্টের ছাত্র-জনতার সফল আন্দোলনকে বিপ্লবই বলবো। আমাদের কিছু ভুলের কারণে বিপ্লব আংশিক হয়ে গেছে, প্রয়োজন ছিল পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের। প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা ও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে এখনো একে পূর্ণ বিপ্লবে রূপ দেওয়া যায়। বিপ্লবী চেতনায় দেশপ্রেমী আরো কিছু লোককে যোগ করা যায়। এ অসম্পূর্ণ বিপ্লব ব্যর্থ হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এজন্য এদেশের রাজনীতিকদের পরিবর্তিত ও দেশ গড়ার অনুকূল চিন্তা-চেতনা সাধারণ মানুষ আশা করে। সে দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও ঐক্য বজায় রাখতেই হবে। যে কোনোভাবে না-সূচক মন্তব্য থেকে দূরে থাকতে হবে। এত বছরের পুরোনো অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না; তবু ছাড়তে হবে। কারণ অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে।

চেয়েছিলাম শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা একসঙ্গে জুড়ে দিতে; উভয়টারই মান বাড়াতে, মানব-আপদকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে। উভয় শিক্ষাব্যবস্থা অন্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা করে শিক্ষায় এ জাতি-গোষ্ঠীর স্বকীয় সত্তা বজায় রাখতে। এ নিয়ে ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে মডেলও গড়েছিলাম। এ জনমে বাস্তবে প্রয়োগ করে যেতে পারবো না বলে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি।

দেখলাম, সিলেবাস আংশিক পরিবর্তন হতে, টেক্সটও অনেকটা পরিবর্তন হতে, এসব ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তন হতে দেখলাম না। তাছাড়া সামাজিক শিক্ষার তো কোনো কাঠামোই এ পর্যন্ত হয়নি। দেশের উপযোগী কাঠামো গঠন ও সার্থক বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরিই হচ্ছে মূল কাজ। এ বিষয়ে এ পত্রিকার মাধ্যমেই অনেকবার অনেক কথাই বলেছি। একই কথা বার বার বলা বেমানান। এদেশে কোনো নতুন চিন্তা-চেতনা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বিষয়টা নিয়ে ভাবার লোকের বড্ড অভাব। সামাজিক শিক্ষার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে কী করে? এদেশের যত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক আপদ, সবই তো সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ধস ও শিক্ষাহীনতার কারণে। কথাটা তো আমরা বুঝতেই চাইনে, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে বসি। সংবিধানে স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেছিলাম। জানি-না করা হবে কিনা? পুরো শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষাব্যবস্থা কো-অর্ডিনেট করা, নীতি নির্ধারণ করা, নীতি বাস্তবায়ন করা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক নতুন নিয়োগ ও অযোগ্যদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো, শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেলের সুপারিশ করা ইত্যাদি অনেক কাজই স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে করার কথা। আমরা দেশের প্রতিটা মূল্যবান বিষয় নিয়ে বিতিকিচ্ছি অবস্থা তৈরি করি। অবশেষে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের কাঁধে এসে ভর করে। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

(প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সাম্প্রতিক বিপ্লবের প্রেক্ষিত ও আলোক-নির্দেশনা

সাম্প্রতিক বিপ্লব একটা আলোক-নির্দেশনা খুঁজে পেয়েছে; তাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, দেশকে সেদিকে চালিত করতে হবে। তাই সংস্কারের ট্রেনকে গন্তব্যে নেওয়াটাই যৌক্তিক হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারের কোনো মানে হয় না– সে সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারই করুক বা ভাবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারই করুক। তবে সংস্কারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতিপথ থাকতে হবে। আধাখেঁচড়া সংস্কারে দেশের বর্তমান অনুবিদ্ধ ও অন্তর্নিবিষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলোর তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। দেশ যেমন ছিল তেমনই থাকবে। শুধু মেগা-দুর্নীতি ও দেশবিক্রির ক্রমোন্নতি কমবে বলে আশা করা যায়। এতে রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অপকর্মের জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতা না থাকার সংস্কৃতি পূর্বের মতো বহাল থাকবে বলা যায়। সংস্কারকদের বিষয়টা নিয়ে ভাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছি। বিপ্লব শুধু ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে– একথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। বিপ্লব সীমাহীন দুর্নীতি-লুটপাট, গণতন্ত্রহীন নৈরাজ্য, ক্ষমতার অসহনীয় দাপট, অন্ধকার যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীন দেশকে অন্য দেশের শাসনের নিগড়ে বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি শতেক বহুমুখী কারণে সংঘটিত হয়েছিল। এতে ছাত্র-জনতাসহ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত, দমন-পীড়নে নিষ্পেষিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তবে বিপ্লব-পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতি আশানুরূপ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বিপ্লবের পূর্ণতা এখনো বাকি। তাই এ বিপ্লবকে কেউ কেউ গণঅভ্যুত্থান বলেই আপাতত তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনভিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে কারো কারো অপরিপক্ক বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের অপরিপূর্ণতা বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সেজন্যই বলতে হচ্ছে, বিপ্লব পূর্ণতা পায়নি। বিষয়টা দেশের স্বার্থে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদরা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে মানিয়ে নিতে পারতেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দেশের পুনর্বিন্যাস ও সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা সৃষ্টির সুযোগ এসেছিল, আমাদের অদূরদর্শীতার কারণে বা দলীয় স্বার্থবাদিতার কারণে বা প্রতিহিংসা চরিতার্থের কারণে আমরা তা কাজে লাগাতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তাই তেপ্পান্ন বছর দেশ উদ্দেশ্যহীনভাবে সংকীর্ণ গণ্ডিতে ঘুরপাক খেয়েছে। এবারও তেমনটি হলে সহজে আর এদেশ বাঞ্ছিত গতিপথে চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। এ আধা-বিপ্লবকে অন্যান্য পরিপক্ক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবে পরিণত করাই দেশের জন্য অনেক ভালো হতো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের রাজনৈতিক দল গড়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত

বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করেছে, অনেক রাজনৈতিক দলের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। একটা গানের কলি এরকম শুনেছিলাম, 'ভুল করে তুই বারে বারে করিস কেন ভুল, গলায় মালা পরলি যদি ছিঁড়িস কেন ফুল, ও তুই ছিঁড়িস কেন ফুল'। এছাড়াও কিছু উপদেষ্টা ও তাদের কায়েমি আস্থাভাজনদের প্রচ্ছন্ন সম্পৃক্ততা বিপ্লবের অভিমুখীতাকে পথভ্রষ্ট করছে। এতে লাভবান হচ্ছে ভারতের চিহ্নিত পোষা গোলাম– পতিত অপশক্তি। আমার দৃষ্টিতে আধাখেঁচড়া সংস্কার কেন্দ্রীয় দুরাচারবৃত্তি ও দুর্নীতি কিছুটা কমালেও দেশব্যাপী এলাকাভিত্তিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে।

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটা সুনির্দিষ্ট গতিপথ ও লক্ষ্য গড়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এটা সত্য, ছাত্র-জনতার এ বিপ্লব হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী এবং মুজিববাদী দেশবিনাশী অপশক্তিকে চিরবিদায় জানিয়ে দেশের জন্য স্বকীয় সত্তায় উদ্ভাসিত স্বাধীন দেশোপযোগী আদর্শকে বেছে নিতে চেয়েছে; যদিও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল চায়, অপশক্তি আবার ফিরে আসুক। আমার বক্তব্য পরিষ্কার– পাঁচ সন্তানের জননীর কুমারিত্ব পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর আর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

আরেকটা বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের বেশি বুঝতে হতো, হয়নি। ভাবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সরকারও বুঝতে চাইবে বলে মনে হয় না। এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও আলাদা অস্তিত্ব গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার আনার প্রয়োজন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমরা যেন মূলছিন্ন ও স্মৃতিভ্রষ্ট জাতি না হয়ে যায়। যে জাতি তার অতীতকে ভুলে যায়, সে জাতি নিঃস্ব। একমাত্র শিক্ষাই পারে উন্নত জাতিসত্তা গড়তে এবং দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে। এদেশে তা অবহেলিত। এজন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ততার বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে, সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (inclusive society) ও একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার (integrated education system) মডেল ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টার গুরুত্ব ও মডেল না বুঝলে এ কাজও অতীতের মতো পরিণামে ব্যর্থ হবে। যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তাতে সিলেবাসের এক-আধটু পরিবর্তন হলেও ভিত্তিস্তর, মান ও মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হবে না। শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের থেকে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে ছিলেন। তাই দেশে ফিরে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ত্যাগ বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন;

যেমনটি অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে এদেশের কিছু কিছু রাজনীতিক চব্বিশের জুলাই-আগস্টের পৈশাচিক বিভীষিকা এবং গণমানুষ ও ছাত্র-জনতার জীবন-ত্যাগ ও হাজার হাজার ছাত্র-জনতার জীবন্মৃত আহাজারি ভুলে যেতে বসেছে। যে স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা নিয়ে জনসাধারণ একাত্তরে স্বাধিকার অর্জনে প্রাণপণ যুদ্ধে নেমেছিল, জীবন দিয়েছিল, শেখ মুজিব তা ভুলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধ এ দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ পরে বুঝেছিল, স্বাধীনতার নামে ভারত সরকার পাকিস্তানকে নিজস্বার্থে দু-ভাগ করে হাতের মুঠোই নিল। ভারত এ দেশকে আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন, একদলীয় বাকশালী শাসন, রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর প্রকাশ্য অত্যাচার, বিচারবহির্ভূত গুম-হত্যা ও নির্যাতন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে সুখ-শান্তির আশা ধূলিসাৎ করে দিল। শেখ মুজিব ও তার বাম-ঘরানার দোসররা এদেশের একত্ববাদী জনতাকে ভারতের বহুত্ববাদী ও বর্ণবৈষম্যবাদী সংস্কৃতির কাছে জিম্মি করে ফেলেছিলেন।

৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের সময়ে বাম দল রাষ্টপতি জিয়ার ঘাড়ে চেপে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। রাষ্টপতি জিয়ার আদর্শের সৈনিকদের এটা ভুলে গেলে চলবে না, তিনি বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে সামরিক আইন ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশকে ইসলামি ধারায় উন্নয়নের পথে পরিচালনা করেন। এর মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা থেকে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ও মুজিববাদ ব্যর্থ হয়ে কালের অতলে তলিয়ে যায়। বাকশালের উত্থান ও পতনও শেখ মুজিবের ঘাড়ে বাম কমরেডদের ভূত চেপে বসার কারণেই হয়েছিল। বর্তমানেও এদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে এদের একটা জোট প্রতিটা নীতিনির্ধারণী কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে, যারা প্রতিটা পর্যায়ে ভারতপ্রীতির স্বাক্ষর মনের অন্তস্তলে জাগিয়ে রাখে এবং তাদের বিধিমতো এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিলীনপ্রায় বস্তুবাদী ও ধর্মহীন চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চায় এবং ইসলাম-ফোবিয়র কারণে ইসলামি একত্ববাদের নীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংস নীতির প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারে না। মানবজাতিকে নিছক একটা ভোগবাদী প্রাণি হিসেবে গণ্য করতে চায়। এদের একটা অংশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দিশারীদেরও প্রভাবিত করতে চায়। সম্প্রসারণবাদী বহিঃশক্তিকে কৌশলে সময় নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জায়গা করে দিতে চায়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে ধর্মহীন চেতনার মনজাগতিক দ্বন্দ্ব ও মতভিন্নতার অস্তিত্ব সামনে চলে আসতে পারে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতাসীন দলের

পরিচালকদের অতি সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে এবং ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে দলীয় নীতিমালা নির্ধারণ সুস্পষ্ট করতে হবে। এটা কোনো বিপ্লবের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। আমরা কেউ কেউ শুধু খুঁজে খুঁজে বাম-রাজনীতির বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যকে প্রচারের জন্য সামনে নিয়ে আসি। এছাড়াও বিশ্বে অসংখ্য বিপ্লব হয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা অনবহিত অথবা সে বিষয়ে পড়াশুনা কম। এ বিশ্বে শতেক রকমের মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। সময় অতিক্রমনে অধিকাংশ প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতবাদই বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিলীন হয়ে গেছে; আবার কোনো কোনো বস্তুবাদী মতবাদ বিলীন হওয়ার পথে। অথচ ইসলামবিদ্বেষী এ মতবাদধারীদের অধিকাংশের চৈতন্যোদয় হতে এখনোও বাকি।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আবার সেই ছদ্ম-একদলীয় শাসন ও ধর্মীয় বহুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু। সরকারি বিভাগগুলোতে নিখাদ দলবাজি, দুর্নীতি, বিচারহীনতা, খুন-গুম, কোষাগার ও ব্যাংক লুটপাট, নিজের ছেলেমেয়ে-আত্মীয়স্বজনসহ দলীয় লোকজনকে হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থসম্পদ তৈরির সুবিধা করে বিদেশে পাচার করতে দেওয়া, ভারতীয় গোপন বাহিনী দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে দেশচালনা, গণহত্যা প্রভৃতি পুরোপুরি চলতে থাকে। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত স্বপ্ন শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের হাত দিয়েই প্রভুর মনবাসনা প্রায় পূরণ হবার উপক্রম হলো। এরই ফলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে গণহত্যার রক্তে শেখ হাসিনার তক্ত কয়েকদিনের ব্যবধানে ভেসে চলে গেল। শেখ হাসিনা গং পালিয়ে গুরুর পদমূলে আশ্রয় নিল।

আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী কর্ম-চিন্তা দেখলে একে কোনো রাজনৈতিক দল বলা যায় না; এদের মধ্যে অন্য দেশের দালালী ও লুটপাট ছাড়া রাজনৈতিক কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের আওয়ামী লীগ নামে যে এদেশে কোনো দল ছিল, ভুলে যাওয়াই সমীচীন। তাই বলা যায়, হীন-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি কোনো দেশের এবং গণমানুষের মুক্তি কখনোই দিতে পারে না। কালক্রমে বিলীন হতে এবং মুখোশ উন্মোচিত হতে বাধ্য হয়। কেবল রসের ফোঁটা-চোষা চাটুকার-ভৃত্যরা তাদের বিলীয়মান নেতা-নেত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নিষ্ফল হা-হুতাশ ও কোলাহল করতে থাকে। লুটপাট ও দেশবিক্রির যে অপ্রকাশিত মূর্তিমন্ত নীলনকশা শেখ মুজিব এদেশের সাধারণ সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় মানুষের অলক্ষ্যে স্বীয় মনের কোণে তৈরি করেছিলেন, তার সুযোগ্য কন্যা অর্ধসমাপ্ত প্রতিমূর্তিতে রঙের শেষ প্রলেপ দিতে শতেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এটা স্বাধীনতা-পিয়াসী বাংলাদেশিদের প্রতি বিধাতার অশেষ কৃপা ও রহমত বলতে হবে।

এদেশে থেকে যত লক্ষ কোটি টাকা শেখ হাসিনা নিজে এবং নিজের লোক দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তার একটা অংশ অন্তর্বর্তী সরকার ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপ দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন এবং বিদেশে সরকারের নামে অপপ্রচার চালানোর কাজে লবিস্টদের নিয়োগে নিশ্চিতভাবেই ব্যয় হবে; হিন্দুত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী ভারতও এদেশ জঙ্গিদের অভয়ারণ্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের স্বকল্পিত বুলি বিদেশে অপপ্রচার করতে কোনো ত্রুটি করবে না। এতে মুসলিমবিদ্বেষী মুরব্বিদের সমর্থনও নিশ্চয়ই পাবে; কারণ এটা বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের একটা অংশ। তাছাড়াও ভারত মুসলমানদের বহিরাগত শত্রু বলে সেই আদিকাল থেকে গণ্য ও প্রকাশ করে আসছে। তাদের পরীক্ষিত দাস ছাড়া কাউকেই তারা বিশ্বাস করবে না। এখন বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সে চৈতন্যোদয় সময়মতো হলেই হয়। বারবার পরীক্ষিত আওয়ামী লীগের দেশ-ধ্বংসাত্মক ও লেন্দুপ দর্জিমার্কা কর্মকাণ্ড এদেশের প্রতিটা দেশপ্রেমী মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে শংকিত করে তোলে।

বুঝতে হবে হিন্দুত্ববাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির দোসর এবং ধর্মবিদ্বেষী শক্তি এদেশের নব্বই শতাংশ মুসলমানের অস্তিত্ব ধ্বংসকারী ফ্যাক্টরের প্রতিভূ। এ ভূত যদি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাঁধে চেপে বসে, এ জাতির উন্নতির সব পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। তাই ইসলাম-বিদ্বেষী ভূতের প্ররোচণায় নিজেদের প্রশ্রয়ে নতুন দল গঠন প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়াই অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য শ্রেয়। অন্তর্বর্তী সরকারকে অজনপ্রিয় করার পেছনেও নিজেদের মধ্যে ও নির্বাহী বিভাগে ছদ্মবেশী লোকজন সক্রিয়। সরকারের শুধু দেশ-সংস্কারসহ সদ্যকৃত গণহত্যার বিচার করাই যথেষ্ঠ হবে না; সব বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার, সব দুর্নীতিবাজের বিচারও করতে হবে। '৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের সাথে করা সকল চুক্তি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অবশিষ্ট দলগুলোকে আস্থায় এনে একজোট হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

(প্রকাশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে বহুত্ববাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে এ পত্রিকায় ও বিভিন্ন বইয়ে অনেক লেখালেখি করেছি; এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে গেলেই এদেশের বেশ কিছু আঁতেল পুরোনো অপ্রয়োজনীয় ইতিহাস টেনে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চান। সে ইতিহাসও আমাদের জানা। 'সেক্যিউলারিজম' শব্দের বাংলা এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ করা হয়েছিল। সেক্যিউলারিজম শব্দের অর্থ ও শব্দের উৎপত্তি দেখলে একে পার্থিববাদী, বস্তুবাদী অথবা দ্বীনপালনকারী নয় এমনকে বুঝি। বাংলায় 'ধর্ম' শব্দটা নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ ধর্মপালনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। নইলে সাংবিধানিক বৈপরীত্য চোখে পড়ে। যত আপত্তি 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে। নিরপেক্ষতার আভিধানিক অর্থ পক্ষপাতশূন্যতা, অপক্ষপাত, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। বাস্তব জীবনেও সে অর্থেই শব্দটা ব্যবহৃত হয়; যদিও খাতা-কলমে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে অহেতুক তর্ক করি। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মস্বাতন্ত্র্য, কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত নয় এমন। কোনো ধার্মীক লোক কি ধর্মস্বাতন্ত্র্য ও কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হতে পারে? নিজের ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না হলে তিনি সে ধর্ম পালন করবেন কেন? তাই তাকে ধর্মের প্রতি পক্ষপাতশূন্য না হয়ে 'ধর্ম-অহিংস', 'ধর্ম-বিদ্বেষহীন' হতে বলতে পারি। এতে যার যার ধর্ম সে সে পালন করলে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়– তা কেউ ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করুক, কিংবা না করুক। দীর্ঘদিন বিতর্কের পর এদেশের সংবিধান থেকে সে শব্দগুচ্ছটি সম্ভবত বাদ যেতে চলেছে। ফলে তর্কেরও অবসান হবে বলে বিশ্বাস। এতে সকল ধর্মের ধর্মভীরু লোকের স্বস্তি পাবার কথা।

এদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দকে 'বহুত্ববাদ' শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের নতুন প্রস্তুতি। অনেক ধর্মহীন ব্যক্তির এতে আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ তাদের তো ধর্মেই বিশ্বাস নেই। কেউ কেউ ধর্মবিদ্বেষী। অনেক প্রচীনকাল থেকেই পশ্চিমা সভ্যতাসহ ভারতীয় উপমহাদেশেও বহুত্ববাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পশ্চিমা দেশে শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত। ছোটবেলায় গ্রাম-গঞ্জের বাজারে ওষুধবিক্রেতা বা ক্যানভ্যাচারদের মুখে প্রথমেই বলতে শুনতাম, 'এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি'। আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করে তা আমরা অনেকেই জানি। সেখানকার কোনো শব্দের ব্যবহার ও সংস্কৃতি এবং ভারত উপমহাদেশের সংস্কৃতি কিন্তু এক নয়। সেমতে বহুত্ববাদ শব্দটি এ উপমহাদেশে

বিভিন্ন দর্শন ও তত্ত্ব আলোচনায় বিভিন্নরূপ ধারণ করে। এর কারণও আছে। হিন্দুত্ববাদী আস্তিক্য অথচ পূনর্জন্ম দর্শনের বাইরেও ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি ধারা রয়েছে, যেমন– বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি। এর অনেকগুলির মধ্যে ভারতীয় বস্তুবাদী চেতনার আত্মপ্রকাশ করেছে। হিন্দুত্ববাদ আস্তিক্য দর্শন হলেও সেমেটিক দর্শন যেমন– ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলামের মতো ধর্মের যেমন একটি করে ধর্মগ্রন্থ আছে– ওল্ড টেষ্টামেন্ট, নিউ টেষ্টামেন্ট ও কুরআন; সেভাবে হিন্দু ধর্মের কোনো একটি মূল ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাছাড়া পুরাকাল থেকেই হিন্দুত্ব দর্শন নানাত্বধর্মী, এর অনেকগুলো চিন্তা-চেতনা; বহুত্ববাদী দেব-দেবতার অস্তিত্ব ও উপাসনা এবং সেই পুরাকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ সাম্প্রদায়িক দুষ্টচক্রে আবর্তিত। হিন্দুধর্মে দ্বৈতবাদের অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয়। সেদিক বিবেচনায় হিন্দুধর্ম বৈচিত্রময়। তবে মূলত ভারতীয় সমাজের প্রাণ হচ্ছে বহুত্ববাদ, যদিও তারা আক্ষরিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে ব্যবহার করে আসছে। সে অর্থে বস্তুবাদ ও ভোগবাদও তো বহুত্ববাদের উদাহরণ। আমার প্রশ্ন, একত্ববাদী মুসলমানরা কি বহুত্ববাদের নীতিতে বস্তুবাদ ও ভোগবাদকে মেনে নেবেন, যেভাবে পশ্চিমা রাষ্ট্রচিন্তায় খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা বহুত্ববাদের ধারণাকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করেন এবং গ্রহণ করেন না?

বহুত্ববাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন– ক্ষমতার বহুত্ববাদ, অভিজাত বহুত্ববাদ, নব্য বহুত্ববাদ; এছাড়াও বহুত্ববাদ তত্ত্বের নানামুখী বিশ্লেষণ আছে– সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, দার্শনিক বহুত্ববাদ, ধর্মীয় বহুত্ববাদ, সমাজিক বহুত্ববাদ প্রভৃতি। 'সমাজতত্ত্বে বহুত্ববাদের অর্থ হলো বহুসংস্কৃতির উপস্থিতি, বহুত্ববাদ বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং একত্ববাদের বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বহু গোষ্ঠীবিশিষ্ট সমাজে বহুসংস্কৃতির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।' পশ্চিমা বিশ্বে সামাজিক বহুত্ববাদ স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগ দেয়। সেজন্য বহুত্ববাদের নামে এদেশে ফ্রি-সেক্স, অবাধ মেলামেশা, লিভ টুগেদার, ট্রান্সজেন্ডার, শয়তানের পূজাকে অনুমতি দেওয়া হবে কি না? আমার বিশ্বাস, ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজ এদেশে বহুত্ববাদের নামে অপসংস্কৃতির প্রসার ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব কমপক্ষে ৯৯.৫০ শতাংশ ধার্মীক লোক মেনে নেবে না। আমাদের সমাজ এখনও অতটা ভোগবাদমুখী হয়ে ওঠেনি।

এক্ষেত্রে ধর্মীয় বহুত্ববাদ বিষয় একটু আলোচনার দাবি রাখে। ধর্মীয় বহুত্ববাদ হলো সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র, যেখানে একটি সমাজের বা দেশের ধর্মীয়

বৈচিত্র ও ধর্মের স্বাধীনতাকে এবং সাম্প্রদায়িক সহনশীলতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই ধর্মীয় বহুত্ববাদ বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুসারীদের মধ্যে আন্তরিক সহাবস্থানের ঐক্যতান সৃষ্টি করে। সেদিক বিবেচনায় সাংবিধানের মূল নীতিমালা সংশোধনের জন্য 'বহুত্ববাদ' শব্দটি বলবত রাখতে গেলে একশব্দের পরিবর্তে 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ' শব্দযুগলের ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যথায় সব জটিলতা ও তত্ত্বকথাকে বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য সরল-সোজা কথা 'ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসা' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, 'সেওনা কাজেরো কীনা হলো হে'? প্রকাশিত অনেক নিবন্ধে এবং সংবিধান সংস্কার কমিটির কাছে লিখিতভাবে জমা দিয়ে বলেছিলাম, এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার উন্নতির জন্য স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করার ব্যবস্থা পরিবর্তিত সংবিধানে রাখা অতীব প্রয়োজন। এছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূল, উদ্দেশ্য ও কাঠামো পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধু সিলেবাসের কয়েকটা অধ্যায় ও টেক্সট পরিবর্তনই যথেষ্ঠ নয়। এদেশের শাশ্বত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সময়ের দাবি। জানি অন্তবর্তী সরকারের হাতে সময় খুব কম। কিন্তু যে সময় হাতে আছে, এর মধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা একসূত্রে গেঁথে inclusive society এবং integrated education system-এর রূপরেখা ও শিক্ষাকাঠামো অন্তত দাঁড় করানো সম্ভব, যার গুরুত্ব এদেশের উন্নতি ও অস্তিত্ব রক্ষায় অন্য যে কোনো সংস্কারের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বিষয়টা সংশ্লিষ্ট মহল গুরুত্ব দেবে বলে আশাবাদী; নইলে সেই পূর্বোল্লিখিত গল্পের মতো 'চাখাইতে চোখাইতে চরণো ধরিতে উঠে ঘাসো খেল হে' অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে।

(প্রকাশ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল’

শিরোনামে উল্লিখিত প্রবাদটি কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে রিক্সাযোগে যেতে এক প্রাচীরের গায়ে লেখা দেখলাম। রংটা চকচকে। বুঝলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ের লেখা। প্রবাদটি আমাদের সমাজে বহুল ব্যবহৃত। আমরা সময়ের প্রয়োজনে প্রবাদটি উল্লেখ করি, কাজের সময় ভুলে যায়। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ ও দেশ খুব জটিল ও অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। ভবিষ্যৎ পুরোটাই অনিশ্চিত কিংবা যাহা পূর্বং তাহাই পরং কিংবা আরো ভয়ংকর। পাশের দেশ তার চরণদাসের সুযোগ্য উত্তরাধিকার বিশুদ্ধ চরণদাসী, সহচর-সহচরীদের নিয়ে সেদেশে বসে অবিরাম খেলে চলেছে; দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার সকল চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এদেশে বসবাসরত, কেউবা পদাধিষ্ঠিত তাদের খেলোয়াড়রা খেলছে ক্ষমতা দিয়ে ও টাকা ছিটিয়ে কৌশলে। প্রতিপক্ষ সাধারণ দেশপ্রেমী মানুষ, ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক দল, সরকার যার যার অবস্থান থেকে আঘাত সহ্য করে যাচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে; প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা সীমিত। অগত্যা যত দোষ ও ব্যর্থতার দায় অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত ও ‘কর্তব্যপালন যথেষ্ঠ করেছি’ বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। কৌশলী বক্তব্য দিচ্ছি। মুখে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার কথা বললেও কাজে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত– কোনো দলের তাঁবেদারি নয়, দেশের কল্যাণ। ইতোমধ্যেই তেপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারেরই-বা কী এমন ঠেকা পড়ে গেছে যে, নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তারা অন্যের সমালোচনা শুনতে চাইবে। তারা তো রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে নিতে চায় না। দেশের প্রয়োজনে দায়িত্বে এসেছে। ইউনূস সরকারইবা ফ্যাসিস্ট হাসিনা-অনুসারীদের বাড়িঘর ভাঙচুরের দায় নিতে যাবে কেন! এসব অসমাপ্ত বিপ্লবেরই অংশ। তারা দেশকে যথাসম্ভব সংস্কার করে নির্বাচন দিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন; এটাই যথেষ্ট নয় কি? সরকারে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কায়েমি স্বার্থবাদী সদস্য তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না, তাতে তাদের কিইবা করার আছে? সচেতন মানুষ তা বোঝেন। এটাকে আমরা শিক্ষকতার ভাষায় ‘লিমিটিং ফ্যাক্টর’ বলি। দীর্ঘ বছর ধরে দলবাজি করে সুপরিকল্পিত উপায়ে সাজানো বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শৃঙ্খলা এত অল্প সময়ে ফিরিয়ে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। অধিকাংশ বিভাগই এক খুরে মাথা মোড়ানো। আবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা টিমে কেউ কেউ অযোগ্য থাকতেও পারেন, সবাইকে

একযোগে অদক্ষ বলাটা সমীচীন নয়। আরেকটা অতি মূল্যবান বিষয় অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না– পতিত লুটেরা সরকার এদেশের সামাজিক শিক্ষা ও সমাজের মূল্যবোধ দীর্ঘদিনে পুরোটাই নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এর প্রভাব ও মেরামত সুদূরপ্রসারী। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা রাষ্ট্র সংস্কারে হাত দিয়েছেন, সামাজিক এই অশুভ পরিবর্তনের বাস্তবতা তাদের ক'জন বিবেচনায় এনে বিভিন্ন বিষয় সংস্কার করতে চাচ্ছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ঠ চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

এ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসন কোনোদিনই কি তাদের দেশবিরোধী গর্হিত কৃতকর্মের দায় স্বীকার করতে চেয়েছে? কৃতকর্মের অনুশোচনা না থাকলে দায়ইবা স্বীকার করবে কেন? অনুশোচনা আসে আত্মোপলব্ধি থেকে, সে ক্ষমতা কি তাদের বিধাতা দিয়েছেন? অতীত বাদ দিয়েও এই ষোল বছরে তাদের প্রকাশ্য দুর্নীতি, লুটপাট, হত্যা-গুম, নির্বিচার অত্যাচার, ব্যাংক লুট, দেশবিক্রি, মিথ্যাচার, গণহত্যার আমলনামা সুস্থ কোনো মানুষ কি অস্বীকার করতে পারে? বাস্তবে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলো। এখন শেখ হাসিনা যেহেতু দেশ লুটপাট করে তার দলবলসহ প্রভুর কোলে ফিরে গেছেন, তারা এবার ক্ষান্ত দিলেই পারতেন। এদেশে রয়ে-যাওয়া তাদের চাটুকাররাও তা বুঝতে পারলে ভালো হতো। এদেশের প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশের লোলুপ দৃষ্টি সেই '৪৭ সাল থেকে আছে। ইতিহাস তা-ই বলে। তারাও এত সহজে নিবৃত্ত হওয়ার নয়। কয়লার ময়লা ধুলে যায় না। সুতরাং আওয়ামী লীগের যে কেউ এদেশে এসে আবার সবার জন্য দেশ গড়বে, এটা অচিন্তনীয়। তাছাড়া কোনো মাল 'মেইড ইন ইন্ডিয়া' হলে তাকে কোনোভাবেই আর 'মেইড ইন বাংলাদেশ' বানানো যাবে না। তারা প্রভুর দাসত্বকেই অগ্রাধিকার দেবে। এ নিয়ে আমাদের না ভাবাই উচিত। অতীতকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে ওই অধ্যায় চুকিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজ দেশের অস্তিত্ব ও কল্যাণ নিয়ে ভাবাই সময়ের দাবি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মূলত একটা বিপ্লবের নাম, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে যদিও তা অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে। দেশের যে দুঃসহ-দুরবস্থা হয়েছিল, গণবিপ্লব ছাড়া কোনো আন্দোলনে তা মেরামতযোগ্য ছিল না। এ বিপ্লবের বীজের অনেক বছর ধরে অঙ্কুরোদ্‌গম হচ্ছিল। বিরোধী দলগুলো অনেক অত্যাচার-অবিচার, নির্বিচার খুন-গুমকে হজম করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষতক যে ছাত্র-জনতা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বিপ্লবকে সফলতার দিকে নিয়ে গেছে তারাও কোনো না কোনো দলের সদস্য অথবা দলের প্রতি নীরব সমর্থক ছিল; সাথে যোগ দিয়েছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রী। একটা সমীকরণ হিসাবে মেলে না,

বিজয়ের পর নির্দিষ্ট দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই নিজ নিজ দলে ফিরে যাবে, ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় মন দেবে; তাহলে নতুন দল গঠনের এত অবশ্যম্ভাবিতা কেন? ব্রাকেটসর্বস্ব দল হতে চায়? এতে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দলের নিজেদের মধ্যে অবনিবনা-মারামারি বাড়বে ছাড়া কমার কোনো লক্ষ্মণ দেখি না। ছাত্রছাত্রীরা অপরিপক্ক অথচ মেধাসম্পন্ন, উচ্ছল-আবেগতাড়িত ও ন্যায়নিষ্ঠ। দূরদর্শীতা ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে। চলতি সমাজকে নিয়ে ভাবতে হবে। এদেশে রাজনীতির পরিবেশ জঘন্য, এটা একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিপ্লবে সহায়তাকারী একজন শিক্ষকের দাবি নিয়ে বলছি: কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য, ছাত্রদের নতুন দলগঠন অদূরভবিষ্যতে তাদের এ পবিত্র আত্মত্যাগ ও অর্জনকে ম্লান করে দেবে। তাদের যদি দেশ গড়ার উদ্দেশ্যই থাকে, তারা প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সুনির্দিষ্ট ব্যানারে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন করতে পারে। যে-সব সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে তারাও একই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী ব্যানারে দেশবাসীর মধ্যমণি হয়ে টিকে থাকতে পারে। এ অরাজনৈতিক সংগঠন হবে সুষ্ঠুভাবে দেশ-পরিচালনার 'প্রেসার গ্রুপ'। এরা হবে সব অন্যায়-বৈষম্যের ওয়াচডগ। আমার এ চিন্তাধারা 'আউট অব দ্য বক্স' হতে পারে, তবে যে-সব রাজনৈতিক দল তাদের সাথে বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের প্রত্যেককে সাথে নিয়ে এজজোট হয়ে দেশমাতৃকার কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে মিলেমিশে একটা জাতীয় সরকার গঠন করাই বর্তমান সর্বোত্তম পন্থা। নইলে আওয়ামী লীগ ও ভারতের বিষাক্ত ছোবলে বছরের পর বছর অস্থিতিশীল পরিবেশ নিয়ে সময় পার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটাই সর্বাঙ্গীণ কামনা।

(প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

জাতীয় ঐক্যই পারে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে

দেশে চোরাগোপ্তা হামলার নীলনকশা...' শিরোনামে গত ১২ ফেব্রুয়ারি সংবাদ প্রকাশ করেছে দৈনিক আমার দেশ। একই দিনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস তার কয়েকজন উপদেষ্টা, ভিকটিম ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে পতিত ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলের 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করে বিষয়টিকে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করে বক্তব্য দেন। আয়নাঘরে বছরের পর বছর ধরে আটকে রেখে নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যার ঘটনাগুলো দীর্ঘদিন পরে হলেও জনসম্মুখে আসছে। এই নরপিশাচদের দুঃশাসনের অবসান হলেও গত কয়েক মাসে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও তার এদেশীয় গোলামেরা মিলেমিশে এসব অপকর্ম করেছে এবং ভবিষ্যতেও যে তারা এদেশকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না, তা তাদের নীলনকশা থেকেই বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে, ভারত একেবারে উদার মনে '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি; তাদের মনে ছিল দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে-রাখা দুরভিসন্ধি। একটু একটু করে তা তাদের তাঁবেদারদের মাধ্যমে আদায় করে নিতে চায় এবং দিনে দিনে তা প্রকাশ পাচ্ছে। সামনে দিন আরো বাকি। এখনই আমাদের বোধোদয় হওয়ার উপযুক্ত সময়। আমরা যারা শুধু আগামী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছি, তাদের এটা বোঝা উচিত যে, বিষয়টা আসলে সে-রকম নয়, এত সহজ সরলও নয়। সে-আশা বালির বাঁধ হতে বেশি সময় লাগবে না।

জুলাই, চব্বিশের অর্ধ-সমাপ্ত বিপ্লব পার্শ্ববর্তী দেশের বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিয়েছে নিশ্চিত। '৭১ সালে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা; কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে দেখেছিল তাদের একটা অঙ্গরাজ্য হিসেবে। আর আওয়ামী লীগকে বেছে নিয়েছিল তাদের সেবাদাস হিসেবে। সে কারণেই আওয়ামী লীগ ভারতের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ করে দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে দীর্ঘবছর ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে এবং দেশ লুটপাট করে পালিয়ে দলবলসহ নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের পোষা গোলামরা সেদেশে বসে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার নীলনকশা তৈরি করে চলেছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর কার্যক্রম ও সংস্কারের দফাগুলোকে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। রোগের ভিত্তিতে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র হওয়া উচিত। ক্ষমতায় গিয়ে

রাজনৈতিক দলের দুর্নীতির মূল কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। এরপর সংস্কার কীভাবে করে এটা রোধ করা যাবে, রোগ নিরাময় করা যাবে, তার উপায় বের করতে হবে। আমরা বিষয়টাকে কতটুকু বিবেচনায় রাখছি, তা ভাবার বিষয়। আমাদের সামাজিক অবস্থা, বসবাসরত মানুষ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সংস্কার করা হচ্ছে না বলে আমার বিশ্বাস। সেজন্য অধিকাংশ সংস্কার উদ্যোগ কতটুকু কাজে আসবে, তা নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। নইলে অনেক সংস্কার অপ্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেশের দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক দল, সাংবিধানিক সংস্থা ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। সেইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং এর বাস্তবায়ন করার সুপারিশ এমন হওয়া উচিত, যা দেশকে নতুন বাংলাদেশ গড়তে সত্যিকারভাবে সহায়ক হবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কার কমিটির সুপারিশে নতুন কিছু নেই।

শেখ মুজিবের পতনের পর কাদের সিদ্দিকী ভারতে আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। কিন্তু তার সেই অপতৎপরতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এবারো ভারতে আশ্রয় নিয়ে দেশটির প্রশ্রয়ে যারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের সেই স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবে রূপ নেবে না। তাদেরও কাদের সিদ্দিকীর মতো নাকে খত দিয়ে একসময় শূন্য হাতে দেশে ফিরে আসতে হবে । আমরা ভারত দখল করতে চাই না, চাই সমমর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে। এজন্য ভারতকে আধিপত্যবাদী মানসিকতা পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মতো খোলা মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশর ক্ষতি করতে গেলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই আধিপত্যবাদী ও একচোখা-স্বার্থপর মনোভাবের কারণেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশের সাথে দিল্লির সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক নয়। যেসব দল ভারতের গোলামি করার বিনিময়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চিন্তা করে, কেবল সেসব দলের নেতাদের সঙ্গেই ভারতের ভালো সম্পর্ক থাকবে। সম্প্রসারণবাদী ও হিন্দুত্ববাদী চিন্তার ধারক-বাহক নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের বর্তমান নীতি থেকে বের হয়ে না এলে প্রতিবেশী কোনো দেশের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক ভালো থাকার সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে কংগ্রেসসহ ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও হুঁশ ফেরা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের 'চীন ঠেকাও' নীতির কারণে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত জোট গড়ে তুলেছে ওয়াশিংটন। এ কারণেই তারা ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখে

আসছে। আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ভারত-তোষণ নীতি অনুসরণ করে। ভারত এদেশকে 'জঙ্গিদের আস্তানা', 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' প্রভৃতি বিষয়ে সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কান অবিরাম ভারী করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার-প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রভাবের কারণে ভারত সুবিধা করতে পারছে না। এ বিষয়টি আমাদের দেশের ভারতপ্রেমী লোকজনের বুঝতে পারা উচিত। ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে এদেশের সব রাজনৈতিক দলেরও রুখে দাঁড়ানো উচিত, দেশপ্রেমের চিন্তা-চেতনা থেকে।

জাতীয়তাবাদী চিন্তা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও উন্নয়নের দফাভিত্তিক আত্মমর্যাদাশীল রাজনীতি শুরু হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে। সে অবস্থান থেকে দলটি সরে যেতে চাইলে দেশ ও দলের নিঃসন্দেহে ক্ষতি হবে। এ বোধোদয় দলটির হওয়া জরুরি। এজন্য দলটিকে তথাকথিত প্রগতিবাদের ধারণার লালন ও চর্চা থেকে ফিরে আসতে হবে। এ সংকটময় মুহূর্তে এ বড় দলটিই পারে সব ভেদাভেদ ভুলে অন্যান্য দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে জনগণের প্রত্যাশিত নতুন বাংলাদেশ গড়ার চেষ্টায় যুক্ত হতে।

আমরা জানি, এদেশের রাজনীতির উর্বর মাঠে হরিলুটের ব্যবসা; প্রতিটা পদে দুর্নীতি, সীমাহীন ঘুষ-চাঁদাবাজি, পারস্পরিক প্রতিহিংসা-দ্বন্দ্ব, মিথ্যাচার ইত্যাদির উন্মুক্ত চাষ হয়। দেশ বাঁচাতে গেলে দেশ সংস্কারকদের যেমন এ বিষয়টা বিবেচনায় রেখে বেশি প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনীয় ও ধন্বন্তরি সংস্কার করতে হবে, আবার প্রতিটা দলকেই ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের ধান্ধায় ব্যস্ত-থাকা নেতা-কর্মী থেকে দলকে মুক্ত রাখতে হবে। তাদের উজ্জীবিত করতে হবে দেশপ্রেমের চেতনায়। এজন্য প্রতিটা দলের সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। সেটা না করতে পারলে হাজারো ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না।

(প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দৈনিক আমার দেশ)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

এসব স্বাভাবিক রাজনীতি নয়

আমি যে এ দেশের নেহাত একজন শাশ্বত মাস্টারসাহেব, এ পরিচয় ইতোমধ্যেই আপনারা জেনে গেছেন। ক্লাসে বিভিন্ন বিষয় আমাকে পড়াতে হয়। এর মধ্যে বিজনেস এথিক্স, প্রফেশনাল এথিক্স, বিভিন্ন পেশার কোড অব কন্ডাক্ট ইত্যাদিও রয়েছে। প্রতিটা পেশার কোড অব কন্ডাক্ট (আচরণবিধি) বা কোড অব এথিক্স পড়াতে গেলেই সেই পেশার জন্য প্রযোজ্য কিছু আলাদা এথিক্স ছাড়াও এজমালি কয়েকটা এথিক্স সব পেশার জন্যই দেখতে পাই। বর্তমান এদেশের বিদ্যমান রাজনীতিকে আমি দেশসেবা, সমাজসেবা, জনসেবা বলতে দ্বিধান্বিত। এ কেন-র উত্তর সবার জানা। এদেশে বরং রাজনীতিকে একটা পেশা, ব্যবসা, মিথ্যার বেসাতি, লাঠিয়াল বাহিনীগিরি, লুটতরাজ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করতে আমরা প্রস্তুত। সব পেশার এথিক্সগুলোর মধ্যে কয়েকটা এথিক্স এজমালি, যেমন– ইন্টিগ্রিটি, পেশাগত যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ব, অবজেক্টিভিটি ইত্যাদি।

ইন্টিগ্রিটি শব্দটা ছোট হলেও এর অর্থ ব্যাপক, যেমন– সততা, নৈতিকতা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা, অখণ্ডতা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ইত্যাদি। এসবের ব্যাখ্যা করতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না। শুধু হাতের আঙুলে গুনে দেখতে পারি, সামাজিক মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ের যুগে ক'জন রাজনীতিকের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, বিশুদ্ধতা আছে। অবজেক্টিভিটি অর্থ নৈর্ব্যক্তিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা ইত্যাদি। এগুলো একজন রাজনীতিকের থাকার প্রযোজনীয়তা আছে কিনা একটু ভেবে দেখতে পারি। ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধই বা ক'জনের মধ্যে বিদ্যমান? এদেশে লাঠিবাজি, মাঠ-দখল ও ভাঁওতাবাজিকে রাজনীতির পেশাদারিত্ব বলে বিবেচিত হয়। আসলে পেশাগত যোগ্যতার মধ্যে সততা, জনকল্যাণকামিতা, সমাজসেবার মানসিকতাকে আমরা রাজনীতিকদের পেশাগত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করতে পারি। সে অর্থে বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতার অর্থও ব্যাপক। একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি-গোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করে, অন্যদের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যত্ন ও জিম্মাদারি করে। এদেশের 'মহান', 'অতি মহান' ও 'চির মহান' নেতা-কর্মীরা জিম্মাদারি কথাটা বুঝেও বুঝতে চায় না, জনগণের সম্পদকে নিজের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। তারাই আবার এমপি নির্বাচনে প্রতিযোগিতাও করে। এজন্যই এদের জন্য কোড অব এথিক্স আইন আকারে বলবত করার প্রস্তাব দিতে হয় এবং সংস্কারের এই ভরা মৌশুমে রাজনীতিকদের মধ্যে এসব গুণের সন্নিবেশের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরতে হয়। এসব এখনই ভেবে দেখার সময় এসেছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক

দল ছাড়াও বাজারে নতুন দল এসেছে। নতুন দলে পুরোনো দলের দলছাড়া-ডিগবাজি মারা, মুখসর্বস্ব, সুযোগসন্ধানীরা এখনও যোগ দেয়নি। এর কারণ রাজনীতি তো ওদের জন্য লাভজনক একটা ব্যবসা। সামাজিক এ অবক্ষয়কে বিবেচনায় আনার জন্য সংস্কারকদের বারবার লিখছি, কাজ হচ্ছে না। তারা কানে দিয়েছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো।

সেজন্য আবারও রাজনীতিতে কোড অব কন্ডাক্টের কথা বলি। এ পেশার নাম যেহেতু রাজনীতির পেশা, এখানে কোড অব কন্ডাক্টের মধ্যে 'দেশপ্রেম' এবং 'দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ' কোড দুটোও উল্লিখিত কন্ডাক্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। সংবিধানে সন্নিবেশিত করা ছাড়াও প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইনেও সংযুক্ত করা যায়। নির্বাচন কমিশনের আইনের মধ্যে যোগ করা আর না করা একই কথা। তারপর আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হয়। আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বা বহুকক্ষবিশিষ্ট করি বা না করি, এতে কাজের গুণগত মানের তেমন একটা যায়-আসে না; ফলোদয় নিয়ে প্রশ্ন আছে। মূল বিষয়টা হচ্ছে আইনপ্রণেতারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন কিনা। আইন প্রণয়ন ছাড়াও তারা নিজ এলাকায় গিয়ে সরকারি আর্থিক বণ্টন নিজ হাতে করবেন কিনা? এলাকার প্রতিটা বৈধ-অবৈধ সমিতি থেকে অবাধে চাঁদা তুলবেন কিনা। বাস্তবতা বলে, এখানেই যত বিপত্তি। আমরা সংস্কারকরা চলতি সমাজ বিশ্লেষণ করতে ভুলে যায়। অপারেশন প্রয়োজন হার্টের, অপারেশন করি পায়ের কনিষ্ঠ আঙুলের। তাই একাধিক ছিদ্রবিশিষ্ট আধাখেঁচড়া সংস্কারে ফলপ্রসূ কিছু না হলে আশাভঙ্গের কারণ হতে পারে। বিষয়টা তখন ঠাণ্ডা তেলে ফোড়ন দেওয়ার মতো 'তেলের নামে তেল গেল ফ্যাচ করলো না'-এ দশা হবে। আইনপ্রণেতারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে 'দামড়া গরুকে জলজ্যান্ত গাভি বানিয়ে ফেলবে', এটা জনসাধারণের যেমন কাম্য নয়, তেমনি সম্মানীত আইনপ্রণেতার জন্যও শোভনীয় নয়। এ বোধ এদেশের ক'জন আইনপ্রণেতার আছে?

এদেশের কোনো এক দলের প্রধান বলছেন, 'আমাদের রাষ্ট্র মেরামত করতে হবে'। অতি সঠিক কথা, রাষ্ট-পরিচালকদের এ বোধোদয় হলে দেশের জন্য উত্তম, শুনে ভালো লাগল। এই সঙ্গে রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মেরামতটাও করে ফেললে কেমন হয়? মেরামতটা দেশ-উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসূ ও ক্রিয়াসাধক হলেই জনগণ বাঁচে। রাজনীতি করবো অথচ রাষ্ট্রের কাছে কোনো জবাবদিহিতা থাকবে না, এটাইবা কেমন? রাষ্ট্র মেরামত করর সময় দলীয় নেতাকর্মীদের অসৎ কর্মকাণ্ড, দুর্বৃত্তায়ন থেকে দূরে রাখার জন্য একটা

বিধিবদ্ধ আচরণবিধি থাকলে এবং তা মানতে বাধ্য করলে কতই না ভালো হয়! এতে সুশিক্ষিত-সমাজসেবীরা ক্রমেই রাজনীতিতে আসবেন, জনসেবার দ্বার উন্মোচিত হবে।

দেশপ্রেমী, সুশিক্ষিত ও নীতিবান নেতাকর্মী ছাড়া আর কোনোভাবেই যে দেশ গড়া সম্ভব নয়, এটা কে না জানে! কোড অব কন্ডাক্ট প্রত্যেক নেতাকর্মীর মেনে চলা বাধ্যতামূলক করতে হবে। অনেকে বলেন, নির্বাচিতরা দুর্নীতি বা অপরাজনীতি করলে পরবর্তীকালে তাকে জনগণ আর ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে না। এ তত্ত্বের সঙ্গে অনেকেই একমত নন, তত্ত্বটি বাস্তবানুগও নয়। দুর্নীতিবাজ নেতাকর্মীও এ কথা ভালো করেই জানেন। এদেশের মানুষের বর্তমান প্রকৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সমাজের দৈন্যদশা নিয়ে যারা নিত্য ভাবেন, তাদের এতে বিশ্বাস থাকার কথা নয়। এদেশে কুখ্যাত সন্ত্রাসী কালা-জাহাঙ্গীর, মুরগি-মিলন গংও এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখে, আবার হয়ও। তাই রাজনীতির অধিকাংশ নেতাকর্মীর চলতি মনোভাব সবায় বোঝেন, 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক'। কোনো নেতা-কর্মীর বর্তমান অপকর্মের ভার ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে না দিয়ে নির্বাচিত সময়ের মধ্যেই বিচার হওয়া উচিত। আবার কোনো কোনো নেতাকর্মীর দায়বদ্ধতার ভার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলইবা কাঁধে নিতে চাইবে কেন? যার পাপের বোঝা তাকেই বহন করা উচিত। অর্থাৎ রাজনীতিকদের অপকর্মের দায়বদ্ধতা আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে। সেভাবেই আইন তৈরি করতে হবে; কোড অব কন্ডাক্ট তৈরি করতে হবে। আইন নেতাকর্মীদের কোড অব কন্ডাক্ট মানতে বাধ্য করবে। যে জেলের ছেলেকে কুমিরে খেয়েছে, তার ঢেঁকি দেখলেই ভয় পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমরা সে সুযোগ দেবো কেন?

(প্রকাশ: ১১ মার্চ ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘আবার সেই হাসনার বাপ!’

কোন নারী মনমতো রুচিশীল স্বামী না চায়! এদেশের অনেকের জানা কৌতুকটি আবার মনে করিয়ে দিই। মেয়েটার জন্ম নিঃস্ব গরীবের ঘরে। তিন বেলা ভাত জোটে না। চেহারা-গঠনশৈলী খারাপ না। বাপ-মা অকালেই মেয়ের অমতে বিয়ে দিয়েছে পান-সিগারেট-তামাকখোর জেট-ব্লাক মার্কা বিদঘুটে চেহারার দাঁত-বেরোনো এক বেটার সঙ্গে। দাঁত পরিস্কারের অভ্যাস কম, মুখে বিশ্রী দুর্গন্ধ। তার সাথে চলতে, মেলামেশা করতে মেয়েটার রুচিতে বাধে। তবুও জীবন তো বসে নেই; দম্পতির একটা মাত্র মেয়ে, নাম হাসনা। কষ্টের কয়েকটা বছরের দুনিয়াবি জীবন পাড়ি দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মহিলার রাত-দিনের আরাধনা: বেশি বেশি নামাজ-রোজা করে বেহেশত যাওয়া; সেখানে অনন্তকালের জন্য একটা ভালো স্বামী পাওয়া। বাড়ির পাশের আনাড়ি হুজুর প্রায়ই বেহেশতি পুরুষদের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া হুরের গল্প শোনান। এ গল্পে মেয়েটার মন ভরে না। তার মনের জিজ্ঞাসা, ‘আমি বেহেশতে গেলে কেমন সুন্দর স্বামী পাব’? উত্তরে হুজুর একদিন বললেন, যার যার স্বামী বহাল থাকবে। মেয়েটার সহজ-সরল মন ও সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ভাত মুখে ওঠে না, মনে নিত্য অশান্তি, মনঃকষ্ট, অপ্রকাশিত অনির্বাণ বেদনা নিরন্তর জ্বলছে। দুনিয়ার স্বল্পদিনের জীবন না হয় অতি কষ্টে পাড়ি দিলাম, কিন্তু সেই অনন্ত জীবনের জন্য ‘আবার সেই হাসনার বাপ!’ শয়নে-স্বপনে মনের গহীনে অসহনীয় অস্ফুট-মর্মপীড়া, একই প্রশ্ন, ‘আবার সেই হাসনার বাপ!’

’৭১-এর মুক্তিসেনারা লাখো প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামে একটা স্বাধীন দেশ অর্জন করেছিল; আর আধিপত্যবাদী ভারত কুটিলতার মাধ্যমে পেয়েছিল নব্য একটা উপনিবেশ। গতিপথ হারালো স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক সব আয়োজন ভারত তার সেবাদাসদের সঙ্গে নিয়ে কায়েম করেছিল। শেখ মুজিব আয়োজনের সবটুকু নিজ হাতে সফল করতে চেয়েছিলেন। বিধিবাম। এলো ’৭৫-এর যুগান্তকারী পট পরিবর্তন। মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙে। ফুলে-ফলে ভরা ভারতের ঔপনিবেশিক বাগান ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিছু বেপরোয়া মধ্যম-পর্যায়ের মুক্তিবাহিনী সেনা-সদস্য মুজিব ও ভারতের সব সুখের আয়োজন ধ্বংস করে দিলেন। সেনানিবাসে কোনো প্রতিবাদ নেই, সুনসান নীরবতা। সাধারণ মানুষ উল্লসিত হলো। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশের স্বার্থে বিনষ্ট-বিবর্ণ বাগান গোছাতে এগিয়ে এলেন। দেশে গণতন্ত্রের ‘রথের মেলা’ বসাতে গিয়ে সঙ্গে উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের পালিত, এদেশের জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত একটি ‘উড়ির

বীজ'ও (অকর্ষিত জমিতে উড়ে পড়া বীজে উৎপন্ন ধান্য, নীবার বা উড়িধান) বাংলাদেশের মাটিতে আবার বুনে দিলেন। এই বীজে বিলীনপ্রাপ্ত বাকশালের স্থানে জন্ম নিল নব্য আওয়ামী লীগ। ফলস্বরূপ করুণ পরিণতির একটা অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন দিয়ে ভোগ করে যেতে হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াকে। আধিপত্যবাদের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় 'উড়ির বীজের' শোষণ ও প্রভু তোষণের উদগ্র কর্মকাণ্ডে বাকি অংশ ৪৭ বছর ধরে ভোগাচ্ছে দেশের স্বাধীনতাকে এবং এদেশের সাধারণ মানুষকে। নিয়তির কী পরিহাস সবাই দেখছে। কথায় আছে, 'দিও না ভালুকের হাতে খন্তা'। মানুষ দেখছে আধিপত্যবাদী প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে সেবাদাসদের জুলুম, মুসলমানবিদ্বেষী অপকর্ম, কোষাগার লুটপাট, লুণ্ঠিত অর্থ বিদেশে পাচার, নির্বিচারে খুন-গুম, আয়নাঘর-অত্যাচার, নিরঙ্কুশ দলবাজি, গণহত্যা, প্রভু তুষ্টি, যা বর্গীদের অত্যাচার ও ধ্বংসলীলাকেও হার মানায়। পরিশেষে লুণ্ঠিত অর্থসম্পদ ও সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে প্রভুর পদতলে নিজেদের নিঃশর্ত সমর্পণ করেছে। শেখ মুজিব কর্তৃক অসমাপ্ত ঔপনিবেশিক আয়োজনের বাকি অংশ সুযোগ্য কন্যার হাতে অনেকটাই সমাপ্ত। সেজন্য উপনিবেশবাদী প্রভু '২৪ এর অর্ধসমাপ্ত বিপ্লব এবং দাসদাসীহারা স্বাধীন বাংলাদেশ কোনোমতেই মেনে নিতে পারছে না। তারা সেবাদাসদের সঙ্গে নিয়ে জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে ও হুমকি দিয়ে উপনিবেশ পুনর্দখল করার নীলনকশা তৈরি করে চলেছে।

আওয়ামী লীগ যে ভারতের হাতের তৈরি সেবাদাস ও গোলাম, এ কথা ও কাজে আর কোনো রাখঢাক, প্রমাণ ও তঞ্চকতা নেই। বাংলাদেশিদের বোধশক্তি জেগে ওঠা উচিত। শুধু আওয়ামী সুবিধাবাদী দোসর ও নব্য মীরজাফররা বাদে এদেশের সব মানুষ দেরিতে হলেও তা বুঝে ফেলেছে। সেই '৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনো মুজিববাদ, কখনো বাকশাল, আবার কখনোবা আওয়ামী লীগ নামে ভারতের সহযোগিতায় মূলত একই সুর 'ভারতীয় শোষণবাদ' এদেশে চালু রয়েছে। শেখ হাসিনা এদেশ থেকে পালানোর আগে প্রভুর কাছে সামরিক অভিযানের জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ঠিক একই অবস্থা খালেদ মোশাররফের বিফল বিদ্রোহের সময়ও হয়েছিল বলে কথিত আছে। আবার এ উপনিবেশ শাসনে রক্ষীবাহিনীকেও ভারত থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছিল বলে জানা যায়। আমাদের দেশে ভারতের যেসব গোলাম বিভিন্ন পদে বহাল আছেন, কিংবা যেসব রাজনৈতিক দলের নেতারা এখনো ভারতীয় শাসন এদেশে কায়েম চান, তাদের প্রতি আমার কৃপা হয়। তারা মডিফাইড (সংশোধিত) আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত করে শহীদ জিয়ার মতো আবারো ভুল করতে চান,

তাদের ঘাড়ে ভূত আসর করেছে। এ অপশক্তি আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ প্রচ্ছন্ন আয়োজন সেবাদাসদের অপসৃষ্টি। যার মাসুল এদেশের বর্তমান ও অনাগত ছাত্র-জনতাকে হাড়ে হাড়ে গুনতে হবে। বলুন তো, যে দেশে তারা হত্যা, গুম, লুটপাট, অত্যাচার চালিয়েছে, সেখানে তাদের আবার রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া বিশ্বের বিপ্লবের অভিধানে কোথাও কি আছে? এদেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী রঙ্গমঞ্চের ভিলেন-অস্তিত্বের যবনিকাপাত চায়; প্রতিহিংসাপরায়ণ হিন্দত্ববাদী আধিপত্যবাদ থেকে চির-পরিত্রাণ চায়। পল্লিকবি লিখেছিলেন, 'মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে, আমি তার বুক ভরি, রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি...'। এ সবই ভুল, মরীচিকাময়। প্রকৃতির নিয়মে তা বলে না।

সেই '৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটি এদেশের কোনো রাজনৈতিক দল নয়, হিন্দুত্ব-উপনিবেশবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির লেলিয়ে দেওয়া গোপন সেবাদাস, যার মুখোশ '২৪-এ এসে প্রকাশ্যে উন্মোচিত হয়ে গেছে। কোনো লুটেরা-গণহত্যাকারীগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার থাকতে পারে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বিপ্লবে পতিত বা পলাতক শক্তি রাজনৈতিক কোনো অধিকার ফিরে পায় বলে আমার জানা নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। তারা এদেশের সম্পদ লুট করে নিয়ে চিরতরে পালিয়েছে। এদেশে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই, যা তারা করেনি। দলের নামেই করেছে। তাদের ও তাদের দলের অপরাধের সুষ্ঠু বিচার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আওয়ামী কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার আমরা দেখতে চাই। এর আগে ভোটে প্রতিযোগিতা করার অধিকার 'ভূতের মুখে রামনাম' শোনাবে। অদূরদর্শী কোনো কাজ কোনো সরকারের জন্যই শোভনীয় হবে না। বরং বুমেরাং ও আত্মঘাতি হবে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এটাই কামনা। নইলে এতকিছুর পর একটাই হৃদয়বিদারক অনুশোচনা সাধারণ মানুষের মনের অন্তস্তলে রয়েই যাবে, 'আবার সেই হাসনার বাপ'!

(প্রকাশ: ১৬ এপ্রিল ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর,)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

গন্তব্যটা আগে খুঁজি ও বুঝি, তারপর সাধু সাজি

(প্রকাশিত শিরোনাম: গন্তব্যটা ঠিক করা যাচ্ছে না)

কয়েকদিন থেকেই লালনের এ গানটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে: 'জাত গেল জাত গেল বলে, একি আযব কারখানা! সত্য কাজে কেউ নাই রাজি, সবি দেখি তা-না-না-না; জাত গেল জাত গেল...'। রাজনীতির উদ্দেশ্য, রাজনীতিকদের কার্যাবলি ও দায়িত্ব, যা পৌরনীতি বইতে প্রথমেই শিখেছিলাম, তা এ কলিযুগে ভুলতে বসেছি। এসব পুস্তকী কথাবার্তা এদেশের রাজনীতিকরাও হয়তো ভুলে গেছেন। মনকে প্রবোধ দিতে পারি না বলেই লিখি। রাজনীতিকদের প্রধান কাজ হলো দেশের কল্যাণে কাজ করা, দেশের উন্নতি করা, জনগণের মঙ্গল নিয়ে ভাবা ও সেমতো সবকিছু করা। বাস্তবে বইতে লেখা কথার সঙ্গে কাজ ও ভাবনার কোনো মিলই নেই, ধান্ধা ভিন্ন। বর্তমানে রাজনীতিও একটা অতি লাভজনক ব্যবসার নাম; রাজনীতির নামে ব্যবসা। এদেশে চমৎকার মানিয়ে গেছে। এ কথা কে না জানে! বলতে গেলেই যত অসুবিধা।

অন্তবর্তী সরকার অনেক সংস্কারের চেষ্টা করছে; কিন্তু আমাদের এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিপরীত কর্ম নিয়ে ভাবছে না কেন? সংস্কারের সব দফাগুলো পড়েছি। আমরা রোগ নিরাময়ে রোগের কারণ নির্ণয় করছি কম; অনেক ক্ষেত্রে অযথা এন্টিবায়টিকের পরিবর্তে মলম মালিশ করছি বেশি। দেশের কর্মপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন তো হবেই, বিভিন্ন পদের পরিবর্তন হবে। তাতেই যতটা লাভ হয়। মূলত দেখা দরকার, অধুনা আবিস্কৃত রাজনৈতিক ব্যবসার ধন্বন্তরি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করছি কিনা? দেশের নিয়ম-কানুন ও মানুষকে সঠিক ও উপযুক্ত ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে পারছি কিনা। 'মহান রাজনীতিক'দের রাজনীতির ব্যবসা ও স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হবে কিনা? এখন দেশের টাকা ব্যক্তির পকেটে ঢুকে পাচার হয়ে যাচ্ছে না, তাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে '২৪-'২৫ সালে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হলো। এভাবে আমাদের ভাবার অভ্যাস নেই। তবে দেশের বিভিন্ন অফিসে অবৈধ টাকা লেনাদেনা একটুও কমেনি। সংস্কারের ফলে এটা কি কমবে? সমাজের মানুষের ও রাজনীতিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তো কোনো বদল হবে বলে মনে হচ্ছে না। কোনো ভালো-সুশিক্ষিত লোকও তো হাজামজার পরিবর্তে রাজনীতিতে নতুন এলো না। তাহলে দেশের কীভাবে উপকার সম্ভব? যত চোর-ডাকাত-ভাওতাবাজ সবাই কি তপস্বী-দরবেশ হয়ে যাবে? যত সংস্কারই করি দেশব্যাপী দুর্নীতির যে মচ্ছব অপেন-সিক্রেট রেওয়াজ আকারে শুরু হয়েছে, এর কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের জায়গা থেকে নট নড়ন-চড়ন। জানি, নেতিবাচক কথা বেশি

বলছি। লালন অন্য একটা গানে বলেছিলেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা, বেদে নাই যার রূপরেখা ওরে...'। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও অসুবিধা হচ্ছে। দুর্নীতির মতো মরণঘাতি ব্যাধি ইচ্ছে করলে আমরা সম্পূর্ণ না পারলেও অন্তত সত্তর ভাগ নিরাময় করতে পারি। কিন্তু সে সম্পর্কীত সিস্টেম সংস্কার কই? ইনিয়ে-বিনিয়ে যত কথাই বলি, এ রোগের উপশমটাই দেশের মূল লাভ।

তিক্ত কথাটা হলো, ব্যবসার রাজনীতিতে বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো সংস্কার 'মহান রাজনীতিকরা' করার ইচ্ছে করলে তো! এক্ষেত্রে তাদের কথিত দেশ-কল্যাণের কোনো প্রস্তাব বা রাজনীতিতে নীতি- নৈতিকতার উন্নতি হয় এমন সংস্কার নিজেরা একজোট হয়ে ধৈর্য ধরে করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তারা নির্বিকার। শেষে পকেটভারী-কর্মীপোষার পথ বন্ধ হয়ে যায়! তা কি মেনে নেওয়া যায়? এদেশের রাজনীতিতে, এমনকি সমাজেও সততা, নীতি-নৈতিকতা শব্দটা উচ্চারিত হতে কম শোনা যায়। আবার দেশের উন্নতি চাই। বিপরিতমুখী প্রত্যাশা নয় কি? সংস্কারে সংসদের আসনে অনেক পদ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। নোমিনেশন ফরম বিক্রির অপ্রকাশিত ব্যবসারও তো বিস্তার ঘটবে, আশা করা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' তথ্য প্রকাশ করেছিল, সংসদের অধিকাংশ এমপি দুর্নীতিবাজ। তবে উচ্চ-কক্ষে ও নিম্ন-কক্ষে পদের সংখ্যা বাড়লে দুর্নীতি বাড়বে, নাকি কমবে অনুমান করা যায়। এমপি মহোদয়দের দায়িত্ব কি শুধু আইন তৈরির মধ্যে ও সংসদের গণ্ডির মধ্যে রাখা যায় না? নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক সব কাজের তদারকী ও টাকার গন্ধ শোকা ছাড়াও এলাকায় যত সমিতি আছে, যেমন– মুরগির খামার সমিতি, ইটভাটা সমিতি, নেশা প্রতিরোধ সমিতি, গাঁজাখোর সমিতি ইত্যাদি শতেক জায়গা থেকে পকেট-ভারীর অভ্যাস কোনো-না-কোনো সংস্কারের মাধ্যমে নিরোধ করা যায় কিনা? এগুলোই মূলত সময়ের দাবি। সবাই মিলে-মিশে পাঁচ বছরের জন্য একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হতো।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমার একটা সোজাসাপটা সংস্কার প্রস্তাব আছে। অগনিত রাজনৈতিক দলের এই অভিনব দেশে সম্ভবত কেউ এ প্রস্তাব আমলে নেবে না। প্রতিটা রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের এলাকাভিত্তিক তালিকা তারা নিজে তৈরি করবে। প্রতিটা উপজেলায় তাদের নেতার হাতে একটা তালিকা থাকবে। কেন্দ্রের দলীয় অফিসেও সক্রিয় নেতা-কর্মীদের তালিকা থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের অফিসেও প্রতিটা দলের নেতা-কর্মীদের আলাদা তালিকা থাকবে। দেশের যে কোনো জায়গায় কোনো নেতা-কর্মী আইনবিরোধী, নীতিবিরোধী বা দেশবিরোধী

কিছু করলে তাকে লোক-দেখানো নামমাত্র দল থেকে বহিস্কার করলেই হবে না; চিরদিনের জন্য বহিস্কার করতে হবে। অপরাধীকে দলীয়ভাবে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব, যখন কেন্দ্রীয় নেতাদের রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। দেশের রাজনীতির চরিত্র নিয়ন্ত্রণ মানে সরকারি সব বিভাগ, উপ-বিভাগ, অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই অতি অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাওয়া। এত ছোট্ট একটা দেশ, অবৈধ কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। টেকনোলজির এই যুগে প্রতিটা ক্ষেত্রেই অসংখ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়। এমন কোনো কম্পিউটার যদি আবিষ্কার করা যেত, মানুষের বাইরের কথা ও মনের কথা একসাথে দেখা যেত! ইচ্ছে যদি থাকে, রাজনীতির ক্ষমতা খাটিয়ে ব্যবসা করে সম্পদের মালিক হব, এদেশে এর যথেষ্ট সুযোগ আছে; মহান কেন্দ্রীয় নেতারা তখন বুঝেও না বোঝার ভান করেন। নইলে যে রাজনীতি করতে দলে লোক পাওয়া যায় না। দুর্নীতির আরো নতুন নতুন পথ বিগত পতিত সরকার চর্চা করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছে। এখন শুধু আবার চর্চার অপেক্ষায়। সুযোগসন্ধানী লোকের এ সমাজে অভাব নেই; অজুহাত ও প্যাচের কথারও অভাব নেই। অভাব কর্মঠ-সৎ ও দায়িত্বশীল দেশ ও সমাজসেবকের। অভাব প্রতিনিধিত্বের জবাবদিহিতার। নির্বাচন হলেই দেশ উন্নতির শিখরে উঠে আহ্লাদে দোল খেতে থাকবে, তা নয়। এসব ভেবেই লালন গেয়েছিলেন, 'জানি ম'লে পাবে বেহেশতখানা, আসলে তো মন মানে না; বাকির আশায় নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এ ভুবনে! সহজ মানুষ...'। রাজনীতিকদের সদিচ্ছা থাকলে চব্বিশের এই আধা-সমাপ্ত বিপ্লবকে কাজে লাগিয়েও দেশের অনেক উন্নতি করা যেত, ভবিষ্যত উন্নতির পেক্ষাপট গড়তে পারতো। মূলত পরিণামে তা কিন্তু হবে না। 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। বিভিন্ন পক্ষকে দোষারোপ করে, পানি ঘোলা করে পরিবেশের জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলবে। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি। লাভবান হবে প্রতিপক্ষ, যারা এদেশের মঙ্গল চায় না। বিষয়টা অনেক ভেবে দেখেছি। কার্যত রাজনীতিকদের মানসিকতা বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়টা নিয়ে সংস্কার কমিটির ভাবতে হবে।

(প্রকাশ: ২৪ এপ্রিল ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

পিছু হটার আর জায়গা নেই: অপয়া আমি বলবো কাকে!

(প্রকাশিত শিরোনাম: দেওয়ালে পিঠ, সামনে এগোনোর সময় এখন)

দূরপাল্লার বাসের পেছনে কাগজে লিখে কে সেঁটে রেখেছিল জানিনে; তবে বয়ানটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল: 'বাস লাইনে কাজ করে শান্তি নাইরে বাজান'! আমি তাদের বিরামহীন কষ্টের কাজগুলো নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি, আসলেই এ পেশায় জীবনে শান্তি বলতে কিছুই নেই। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন পুরোদমে শুরু হলো, আমি তখন হাই-স্কুলের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। ভবিষ্যৎ স্বপ্নভরা বুকে মিছিলে যেতাম। অনেক বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। কত গর্ব ছিল বুকে! এখন আমি জীবনের প্রান্তসীমায়, এক পা কবরে। বেলাশেষে জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশ নিয়ে পেছনে ফিরে তাকাতেই হতাশার রঙিন চাদরে চোখের দৃষ্টি ঢেকে যায়। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেছে। দেখি, পিছু হটার আর জায়গা নেই। জীবনের সেই প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে চলে-ফিরে, বাস্তবতা দেখে, করে-কম্মে, কোনো কিছুতেই কি একদণ্ড শান্তি পেয়েছি? হতাশায় কখনো ভাবি, নিশ্চয়ই আমি অপয়া। আমার জীবনের অতি মূল্যবান সময়গুলো এভাবেই দিনে দিনে পার হয়ে গেল, দেশের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। সেই '৭২ সাল থেকেই দেশটা লাঠিয়াল বাহিনী ও আধিপত্যবাদীদের দখলে। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া কে-বা শোনে! শিক্ষক মানুষ, শিক্ষামানেরও বিতিকিচ্ছি অবস্থা। এ নিয়ে কারো কি কোনো চিন্তা আছে?

আমাদের রাজনীতিকরা মানুষের মানসিকতার নেতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন। যারা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ– তাদের শুধু ভোগান্তি। দেশ-চালকরা ব্যক্তিস্বার্থ ও দাসত্ব করার কারণে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারতেন, যা সমাজ-উন্নয়নে তথা দেশের উন্নতির জন্য অবশ্যম্ভাবী, যা রাজনীতিকদের সদিচ্ছায় একমাত্র সুশিক্ষা, মানবতা-সঞ্চারক শিক্ষার মাধ্যমে করা সম্ভব। মাঝখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া তার আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে দুর্নীতি অনেকটা কমিয়ে মাত্র কয়েক বছর আন্তরিকভাবে দেশের উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন। সেজন্য তাকে জীবন দিয়ে সে চেষ্টার মাসুল দিতে হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতার প্রথম থেকেই দেশটা অপয়ার শ্যেনদৃষ্টিতে পড়েছে। এত সুন্দর একটা দেশকে অপয়া বলাটা বিবেকবর্জিত। আমরা অপয়া হয়েছি মূলত আমাদের কর্ম, দেশের অবস্থান, নিজেদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত-আত্মঘাতি অবনিবনা, মানসিক বিকৃতি, 'রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা' করার প্রবল বাসনার কারণে।

অবস্থানগত দিক থেকে অপয়া বলছি এ কারণে, দেশের অবস্থানটা হয়েছে বর্ণবৈষম্যবাদী, আধিপত্যবাদী, নিকৃষ্ট-প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলিমবিদ্বেষী ভারতের পাশে। বর্ণবৈষম্যবাদী সমাজ হওয়ায় প্রতিহিংসা তাদের মজ্জাগত; আর্য নামে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ উপমহাদেশে আসার সেই প্রথম থেকে। এর পাশে বসবাস করে কোনো রাষ্ট্রই শান্তিতে নেই। আমাদের জন্য এর সঙ্গে যোগ হয়েছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান' নামের গন্ধ, যাদেরকে ভূ-ভারত থেকে বিতাড়িত করা হিন্দুত্ব-আধিপত্যবাদী শাসনের বজ্রমুষ্ঠি প্রতিজ্ঞা; তাও আজ থেকে নয়, সেই ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে। ভারত সরকার ভারত থেকে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করতে চায়; এদেশকে তাদের তাবেদার ও সেবাদাস দিয়ে লুটপাট, শাসন করতে চায়, করদ রাজ্য গড়তে চায়, বাণিজ্যিক পশ্চাৎভূমি বানাতে চায়। যারা তাদের আনুগত্য, দাসত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করে চলবে, তাদেরই ক্ষমতায় বসাতে চাই। কোনো স্বাধীন মানুষ কি দাস হতে চায়?

বিশ্বের প্রতিটা দেশেই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী মিলে একসাথে সাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। আমরাও সেটা চাই। ভারত থেকে 'মুসলমান খেদাও, সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ কর' অভিযান চলছে; পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর প্রতিও অলিখিত অত্যাচার-নিগ্রহ চলছে। বাঁদর দইটা খেয়ে দই-মাখা হাত পাশে দাঁড়ানো ছাগলের মুখে মুছে দিচ্ছে; বিশ্বময় রটিয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, ওরা জঙ্গিবাদী। পুরো বিশ্বটা সর্বৈব মিথ্যা ও ক্ষমতার দাপটে চলছে। থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের বদৌলতে তথাকথিত সভ্যতার বর্তমান পশ্চিমা ধারকরা সে-কথা আমলে নিয়ে আমাদের শাসাচ্ছে। কপালকে তো অপয়া বলবোই। শ্রুতিকটু নিরেট সত্য এই– যতদিন এই প্রতিহিংসাপরায়ণ, পরখেকো, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে না যাবে, তারা তাদের এ শোষণ, হিংসুটে স্বভাব, নিজস্ব সেবাদাস-প্রতিপালন প্রতিজ্ঞা বদলাবে না, এ উপমহাদেশেও শান্তি ফিরবে না।

আমরা অপয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার কয়েকবার সুযোগ পেয়েছি: '৭১ সালে স্বাধীন হয়ে সুযোগটা প্রভুর পদমূলে উৎসর্গ করে দিয়েছি। '৭৫ সালের পরিবর্তন নিজেদের ভুলে জীবন দিয়ে ভুলের খেসারত দিয়েছি। '৯১ সালে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে দেশ গড়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছে। '২৪ সালে সুযোগ হয়েছিল বর্গিমার্কা-জরাজীর্ণ অপশাসন, সীমাহীন দুর্নীতি, অপহরণ-হত্যা-গুম, গণহত্যার একনদী জমাটবাঁধা রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব সংঘটিত করা এবং সম্পূর্ণ নতুন মন-মানসিকতা নিয়ে দলবদ্ধভাবে নতুন

বাংলাদেশ গড়ার। অনেকটাই ভুলতে বসেছি। ‘ব্যবসায়ী স্বার্থান্ধ রাজনীতির’ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কিংবা দলকানা গোষ্ঠীর অতি আনুগত্যের কারণে কিংবা অনভিজ্ঞতার কারণে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব না করতে পেরে আধা-খেঁচড়া বিপ্লব করে, অনেক রাজনৈতিক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে কোমর-ভাঙা চতুষ্পদের মতো হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে আমরা সামনের দিকে চলছি। এখনও বিনা বাধায় ক্ষমতায় যাবার লোভ-লালসা, জিদ ও পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা বাস করছি। দেশের অশুভ নিয়ম-কানুন, রাজনৈতিক ব্যবসায়ী, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ, ইত্যাদি থেকে ভবিষ্যতে দেশ কতটা অপয়ামুক্ত হবে সে বিষয় নিয়ে কোনো দলবাজদের মাথাব্যথা নেই। এ সবই কোনো কোনো ব্যক্তির কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর দুরারোগ্য ব্যামো।

আমি কোনো গওস-কুতুব-আউলিয়া নই, সাধারণ একজন মাস্টারসাহেব। তিনটি কাজের সুচিন্তিত বয়ান আমি করতে পারি, যা দক্ষতা, যোগ্যতা ও সততার সঙ্গে মাত্র সাত বছর ধরে করতে থাকলে এদেশ নিশ্চিত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। জীবনের এই বেলাশেষে গ্যারান্টি দিয়ে করেও দেখাতে পারি। যোগ্য অন্য কেউও করতে পারেন। ১. নৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে খুব শক্ত শাসনের মধ্যে রাখতে হবে; দুর্জন ও অশিক্ষিতের জন্য উদার গণতন্ত্র প্রয়োগ করা যাবে না। যে কোনো দলের নেতা ও পোষ্যপুত্রদের প্রতিটা অন্যায় কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে। সেমতো নির্বাচনের আগেই বিধি-বিধান সংস্কার করতে হবে। এতে দেশে দুর্নীতি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যাবে। ২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার খোল-নলচে পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হবে। চুয়ান্ন বছর ধরে শুধু উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বিগত আট মাসেও তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। শিক্ষার ভিত্তিমূল নির্ধারণ, কাঠামো পরিবর্তন, টেক্সট পরিবর্তন, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ বজায় রেখে করতে হবে এবং একটা সময়োপযোগী শক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এটাই বড় সমস্যা। সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করতে হবে। এরও ব্যাপক পদ্ধতি ও ব্যবস্থা আছে। সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একত্রে গেঁথে ফেলতে হবে। সেখানেও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কঠিন নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে হবে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জুড়ে দিতে হবে ‘সোস্যাল এন্টারপ্রিনিউর’ ব্যবস্থা। প্রতিটা অঞ্চলে ‘সোস্যাল এন্টারপ্রিনিউর’ জন্ম নেবে। তাতে বেকার সমস্যা কমপক্ষে ৬০ শতাংশ কমে যাবে। এক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে হবে। সব কিছুরই

পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অতি অল্প সময়ে তৈরি করা ও বাস্তবায়ন সম্ভব। ৩. চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া যথাসম্ভব চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে শুধু রাজনীতিকদের মতামতের ওপর নির্ভর করা যাবে না। রাজনীতি করে-না এমন অসংখ্য দূরদর্শী-চিন্তাশীল ব্যক্তি এদেশে রয়ে গেছেন। তাদের সুচিন্তিত মতামতও গ্রহণ করতে হবে। দেশটা শুধু রাজনীতিবিদদের নয়, সাধারণ মানুষসহ সুশিক্ষিত সব মানুষের। পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ দেশময় ভরপুর। রাজনীতিবিদরা অধিকাংশ সময় দলীয় স্বার্থের বাইরে যেতে চায় না, দলের লাভ দেখতে গিয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। রোগী অনেক সময়ই তেতো ওষুধ খেতে চাইনা, যদিও এর মধ্যে তার রোগমুক্তি ও পরিবারের কল্যাণ নিহিত আছে।

(প্রকাশ: ২৮ এপ্রিল ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশ আগে, না রাজনৈতিক দল?

শিষ্য তার পেটের ব্যথা নিরাময়ের জন্য গুরুর স্মরণাপন্ন হয়েছে। গুরু পরামর্শ দিলেন, তোমাকে এক হাজার একটা পরিবার থেকে চাল সংগ্রহ করে এক বছর ভাত রান্না করে খেতে হবে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য। পেটের ব্যামো তো আগে নিরাময় হোক! কাঁধে ঝোলা নিয়ে শিষ্যের চাল সংগ্রহ ও ভাত রান্না করে খাওয়া শুরু হয়ে গেল। তিন বছরেও রোগ ভালো হলো না। শিষ্য ইতোমধ্যেই ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামের সবাই ভিক্ষুক নাম দিয়েছে। আমাদের গ্রামের আবুবক্কা ভাইয়ের ধুয়োজারি গান ছোটবেলায় প্রায়ই শুনতে যেতাম। তিনি গাইতেন, 'গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা-আ-আ, ওরে এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা, আহা-আ-আ-আ'। আওয়ামী লীগ যে ভারতের গোলাম ও সেবাদাস ছিল, ক্ষমতায় বসার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাজ উদ্দিন সাহেবের সাত দফা চুক্তি ও শেখ মুজিবের ২৫ বছরের গোলামি চুক্তির আগে কেউ বুঝতেই পারেনি। গোলামি ও সেবাদাসীর কর্ম কাকে বলে গুরুকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিবের শাসন ও শেখ হাসিনার শাসন বাস্তবে তা দেখিয়ে দিয়েছে। এদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ও উন্নতির কাঁধে গুরু-শিষ্য ভিক্ষার ঝোলা তুলে দিয়েছেন। অধীন দাস ও করদ রাজ্যের মর্যাদা গুরু দিয়েছেন। আমাদের দেশে একদল গোলাম আছে, 'দাদাবাবুদের' পদলেহনে মহাতৃপ্তি পায়; 'ঠাকুর বংশে দেহ-দানে সর্গসুখ' অনুভব করে। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনার তুলনায় শত-গুণ বিভীষিকাময়। এতদিনে ভাবুক বাংলাদেশিরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এদেশে ভারতের দখলদারিত্ব কায়েম হোক, এদেশের সাধারণ সচেতন মানুষ আর চায় না।

চব্বিশের অর্ধ-সমাপ্ত বিপ্লব ছিল শেখ হাসিনার নির্ভেজাল গোলামি, দেশ লুটপাট ও করদ-রাজ্যের মর্যাদা অবসানের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগ। কিন্তু এ অর্ধসমাপ্ত বিপ্লব তো সমাপ্ত হলো না, এর কী হবে? তাহলে হিন্দুত্ববাদী মুসলিমবিদ্বেষী আধিপত্যবাদ থেকে কি এদেশ কখনো মুক্তি পাবে না? অন্য দলের কথা বাদ দিলাম, মুসলিমবিদ্বেষী বিজেপি সরকার ভারত এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের বহিরাগত বলে পরিণামে ভূ-ভারত ছাড়তে বাধ্য করবে। এটা আমাদের শুধু স্বাধীনতা নয়, অস্তিত্বের সংকট। নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল ক্ষমতার মসনদে বসবে, তারাও যদি জাতীয় অস্তিত্বের তুলনায় ক্ষমতাকে বড় করে দেখে, অতি প্রগতিশীল হয়ে ভারতীয় সুবিধার কাছে তারা যদি বিক্রি হয়ে

যায়, তখন এদেশের স্বাধীন সত্তার কী হবে! এই বোধ নব্বই শতাংশ মুসলমানের মধ্যে কি আছে? 'জঙ্গিবাদী ও পাকিস্তানের পক্ষের শক্তি বনাম তথাকথিত প্রগতিশীল আদর্শ' বিভাজনের ধুয়া তুলে ভারত কি ভবিষ্যতে আবারো এদেশ শাসন ও খবরদারি করতে পারবে? আমাদের একটু দূরদর্শী হওয়া দরকার। স্বাধীন দেশের এ জনগোষ্ঠী নিজেদের ভুলে কৌটিল্য-চাণক্য বুদ্ধির কাছে পরাভূত হয়ে যদি হিংসাপরায়ণ ও শোষক ভারতকে আবার প্রশ্রয় দেয়, তখন পরিণামে কি একদিন এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী উদ্বাস্ত হয়ে রোহিঙ্গাদের মতো পোটলা-কাঁথা-বালিশ মাথায় বেঁধে নিয়ে জমির আইল বেয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়? এদেশের সবারই জানা উচিৎ, ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে এদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে যে ভুল করেছে, বিজেপি সরকার হলে কখনোই তা করতো না, ভবিষ্যতে কোনো সুযোগ এলে তারা এমন ভুল আর করবে না। শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ওপর যে নিশ্চিত আস্থা ভারত সরকার রেখেছিল, এদেশে এমন কোনো নির্ভেজাল গোলাম আর নেই। এছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি মজ্জাগত মুসলিমবিদ্বেষ থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করতে পারে।

ভারতীয় আগ্রাসন ও হিন্দুত্ব-উপনিবেশবাদী শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার পরই দায়িত্ব চলে আসে এ জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত উন্নতি ও সমৃদ্ধি– স্বকীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে অস্তিত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি। এখানেও এদেশের রাজনৈতিক দলের গঠনমূলক অবদান অনস্বীকার্য। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীলতায় আপোষহীন কোনো দলের নাম বিনা-দ্বিধায় ও নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করা কঠিন, যারা বাংলাদেশী সব জাতিগোষ্ঠীকে একই সূতার ডোরে বেঁধে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুচোখওয়ালা দলের সংখ্যা কম। কারো ডান চোখ কানা, কারোবা বাম চোখ। কেউ মুসলিমবিদ্বেষী; কেউবা অতিশয় রক্ষণশীল, কারোবা জনসমর্থন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নেই। এরা নির্দিষ্ট কয়েকটা ইস্যুতেও এক হতে জানে না; দেশের মঙ্গলের তুলনায় দল ও দলবাজি এদের কাছে বড়।

রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান অবস্থা ভাবতে গেলে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বিগত ১৫ বছর ভারতকে সঙ্গে নিয়ে নির্ভেজাল আওয়ামীকরণের ফলে সরকারের প্রতিটা বিভাগের প্রতিটা পর্যায়ের দুর্নীতিবাজ আওয়ামী–ভারতীয় এজেন্ট পদাধিষ্ঠিত হয়েছে। এরা অন্তর্বর্তী সরকারকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে, প্রতিটা কাজে বাধা সৃষ্টি করছে, মনমতো কাজ করতে দিচ্ছে না, পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে

তুলতে শতেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তিত এহেন অবস্থায় সব রাজনৈতিক দল দেশরক্ষায় ও সম্মিলিত উন্নয়নে এগিয়ে আসুক এটা সাধারণ মানুষ আশা করে।

বিএনপির সংগঠন দেশব্যাপী বিস্তৃত ও মজবুত। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সদ্য গজানো অভিযোগগুলো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী অনেককেই কষ্টে ফেলেছে: নেতা-কর্মীরা ক্ষমতায় বসার আগেই বিভিন্ন এলাকায় দুর্নীতি-চাঁদাবাজি, ক্ষমতার দাপট প্রতিষ্ঠা করে চলেছে, ক্ষমতায় গেলে কী না-জানি হয়! অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে পথে-বসা, ভগ্নদশা এ দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গিন অবস্থার দিকে না তাকিয়ে দেশ সংস্কার ও তাড়াহুড়া নির্বাচনের অস্বাভাবিক তাগিদ, ভারতের সুরে কথা বলা ও নির্বাচন নিয়ে অসম্মানজনক-বিরূপ মন্তব্য, দলকানা নয় এমন লক্ষ-জোড়া সাধারণ মানুষের চোখ এড়াইনি। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ এবং মূল্যবোধ থেকে ক্রমশ সরে আসার অভিযোগও বাজারে চাউর হয়েছে। অনেক ছোট দলের নেতারা আছেন– দেশমাতৃকার স্বার্থে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর; তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠন নেই। নতুন দল– দেশপ্রেম, ত্যাগ ও উচ্ছ্বলতায় পরিপূর্ণ; পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতার অভাব। জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিতে একটা শক্তি। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল, জনসম্পৃক্ততা কম। অন্যান্য ইসলামি দলকে সঙ্গে নিয়ে তা বৃহৎ-শক্তি হতে পারে, সম্ভাবনা কম; 'এক ঘরমে দো-পিরের অবস্থান' অনেকটাই অবাস্তব। ইসলামি দলগুলো শতধাবিভক্ত। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাদে অন্যান্য ইসলামি দলগুলো শিক্ষা-দীক্ষা, আধুনিক টেকনোলজিসমৃদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতায় কমজোরি, সহজ-সরল। বড়জোর ঢাল-তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে জোরসে শ্লোগান হাঁকতে পারদর্শী। এ অবস্থায় দেশের কী হবে!

সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান সঠিক পথটি বেছে নেওয়া অনেক কঠিন। একটু ভুলেই ছাত্র-জনতার অর্ধসমাপ্ত অমূল্য বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে; আবার দেশ নতুনভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের যাতাকলে পড়তে পারে, দেশে রাজনীতির নামে ব্যবসা-লুটতরাজ অব্যাহত থাকতে পারে। তবে ১৫ বছরের আয়নাঘর-নির্যাতন, গুম-হত্যা, কোষাগার-ব্যাংক লুটপাট, সীমাহীন দুর্নীতি, গণহত্যার বিচার সুষ্ঠুভাবে হতেই হবে। এটা সত্য, দশের স্বার্থে কিছু দলের ছাড় দেওয়ার বিষয়টিও জড়িত। সেজন্য যথাযথ সংস্কার ও সংবিধান পরিবর্তনে; পরিবর্তিত বাংলাদেশে রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা ও কোড অব কন্ডাক্ট নির্ধারণে

গণভোটের সাহায্য নেওয়াটাই নিষ্কণ্টক। অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেন: যদি আমরা অন্তর থেকেই দেশের উন্নতি চাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের অবসান ঘটিয়ে কমপক্ষে তিন টার্ম এদেশে প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাটাই উত্তম। রাষ্ট্রপতি ১৪ দলীয় জোট বাদে সব রাজনৈতিক দলকে গুরুত্বানুযায়ী সঙ্গে নিয়ে 'জাতীয় সরকার' আদলের পার্লামেন্ট গঠন করে দেশ পরিচালনার পরিকল্পনা করলে দেশের ভবিষ্যত মঙ্গল হতো বলে এদেশের অনেক দেশপ্রেমী-সুধীজনের বিশ্বাস।

(প্রকাশ: ৮ মে ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংস্কার করুন

অনেক দিন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন কলামে এদেশের সংস্কার নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথাই লিখেছি। অনেকে লেখাগুলো পড়ে অনেক ভালো ভালো মন্তব্য করেছেন। এ ধরণের পাঠকের সংখ্যাও শত শত। আমি তাদের প্রতি সম্মান রেখে একটা কথাই বলেছি, এদেশে যারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশ-গঠনোপযোগী কলাম পড়েন– তাদের হাতে সময় আছে, মন আছে, পড়ার মতো ধৈর্য আছে। কিন্তু তাদের হাতে কাজটা বাস্তবায়ন করার কোনো ক্ষমতাই নেই। এদেশে যারা আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-নীতি তৈরি করতে সক্ষম, মানুষকে মানাতে সক্ষম, ক্ষমতাধর, তারা প্রকাশিত গঠনমূলক লেখা পড়েন না, হয়তো লেখা পড়ার অত সময় তাদের হাতে নেই কিংবা ইচ্ছে করে ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য লেখাগুলো পড়েও তুচ্ছ গণ্য করেন। নিজে বড় বুঝি– এ মনোভাব নিয়ে বড় চেয়ার দখল করে আছেন। জানিনা, আমার পাঠকসমাজ আমার এ উত্তরে সন্তুষ্ট কিনা।

দাদির কবর ছেড়ে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কান্নাকাটি করা আমাদের দেশীয় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অপারেশন দরকার হৃদপিণ্ডে, অপারেশন করি পায়ের কণিষ্ঠ আঙুলে। এ স্বভাব আমাদের আছে। কত রকমের উদাহরণ দিয়ে, কখনো রসিকতা করে, কখনোবা কবিতা-গান লিখে অনেক সত্য-বাস্তবধর্মী, প্রয়োজনীয় কথা বলি। কারো স্বার্থবিরোধী হলে, আঘাত লাগলে তারা এড়িয়ে যেতে পারেন, গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। মানুষের স্বভাব কি বদল হয়! মরণের আগ পর্যন্ত অতি কটু-সত্য কথা সময় পেলেই লিখে যাব। এটা আমার খারাপ স্বভাবের একটি। এদেশে সংস্কারের জোয়ার চলছে। অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব যে এর মধ্যে নেই, তাও নয়। কিন্তু বাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছানো অনেকটাই সম্ভব হবে না বলে মনে মনে জানি। আবার একটা গান শোনাই। ছোটবেলায় রামপ্রসাদি শুনতে যেতাম। মক্কা-কাশী, গয়া যাওয়া অপরাধ নয়, মন সুন্দর না হলে যাওয়া অনর্থক সময়ক্ষেপণ, টাকা-পয়সা নষ্ট। গায়ক গাইতেন, ‘মক্কা-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন, অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর গুরুর চরণ ধর, মক্কা-কাশি...’। আসলে রাজনীতিকদের মন-মানসিকতা দুর্নীতিমুক্ত ও দেশ-গড়ার উপযোগী না হয়ে ‘মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট’ হলে এদেশ কখনোই ভালো হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান যে ক’দিন ভালো কাজ করবেন, দেশ ভালো থাকবে। এর পরের কথা, আবার সেই ‘মহান রাজনীতিকদের কৃতকর্মের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। এদেশের সামাজিক মূল্যবোধ তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। রাজনীতিকরা সুশিক্ষিত নতুন লোকজন দলে আনছেন না। সংস্কার

এড়িয়ে যাবার শতেক পথ সুবিধাভোগীরা অতি অল্প দিনে বের করে ফেলবে। প্রশাসনের অবস্থাও তো আগের মতো রয়ে গেছে। তাহলে খাতাপত্রে শুধু সংস্কার করে বাস্তবায়ন করতে না পারলে সে সংস্কারের মূল্য কোথায়? আমি যে একটা কথা প্রায়ই বলি, সমাজ দুর্নীতিতে সয়লাব হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষের মন-মানসিকতায় ব্যাপক পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, অধিকাংশ লোকের কথার সাথে কাজের একবিন্দুও মিল নেই, যে কোনো সময় জিভ ঘুরিয়ে উল্টো কথা জনসমক্ষে বলে দিতে পারে, কোনো আত্মজিজ্ঞাসা নেই, এসব তো সমাজেরই অধঃপতন, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়– একথা কেউ কানে তোলে না, বিবেচনাও করে না, করার কথাও না। সমাজ পরিবর্তনশীল, এর একটা গতি আছে, এদেশে এর নেগেটিভ পরিবর্তন হয়ে এত নীচে নেমে গেছে যে, মূল্যবোধের ব্যাপক অধঃপতন হয়েছে। আমরা ডাস্টবিনের ময়লাকে বজায় রেখে আতর ছিটিয়ে সুগন্ধে ভরে দিতে চাই– প্রকৃতির নিয়মে কী বলে? আগে ময়লাটাকে ঝেটিয়ে, ধুয়ে-মুছে বিদায় কর, তারপর যত পারো আতর ছিটাও। আমরা বুঝি, কিন্তু কাজটা সেমতো করিনে। একমাত্র এদেশের ‘অতিমহান রাজনীতিকরা’ই দীর্ঘ ৫৪টা বছর তাদের বিকৃত চিন্তাধারা, মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডা, দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ, বিবেকের অপমান করে ভালো সাজার ধুয়া তুলে এ অবস্থা তৈরি করেছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কীইবা করার আছে। সাধারণ মানুষ কেউ কেউ সমাজ থেকে জিভ উল্টানো, কথা ঘোরানো, মিথ্যাবাদিতা শিখছে, কেউবা শততার প্রিজারভেটিভ মেখে অতি কষ্টে পেঁচার মতো খোঁড়লে বসে দিনাতিপাত করছে। কেউ মরে বাঁচছে। দুর্নীতিবাজ, রাজনৈতিক টাউট বলতে আমি কিন্তু খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাই না। এরা অন্যদের অপকর্মের বলি। বলতে চাই, সমাজে রাজনৈতিক টাউট-বাটপার, চাঁদাবাজ, মিথ্যাবাদী-প্রতারকে ভরে গেছে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ না করলে, রাজনীতি থেকে এদের বিতাড়িত না করলে, ভালো সুশিক্ষিত লোকজন জনসেবায় এগিয়ে না এলে, এদেশ আপনা-আপনি ভালো হয়ে যাবে, আমি আদৌ বিশ্বাস করিনে। এই অধম মাস্টারসাহেবের মতো এদেশের আরো হাজার হাজার সমাজ-সচেতন, সমাজ-পর্যবেক্ষক তা বিশ্বাস করতে পারেন না। সংস্কারে সামাজিক এসব বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় আনতে হবে। আমি সমাজের অন্যায়-অত্যাচার, ঘুষবাণিজ্য, চাটুকারিতার ঘোর বিরোধী। কিন্তু মুখের কথায় কী লাভ বলুন। মানুষের কাছে দিনে দিনে খারাপ হয়ে যেতে হয়। হলুদ জামা পরে আধুনিক প্রগতিশীল সেজে সব খারাপের মধ্যেও অনুবিক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে ভালো কিছু খুঁজে বের করে বাহবা নিতে পারিনে। চোখে যা দেখি, কাঠকে কাঠ বলি, লোহাকে লোহা।

কয়েকদিন আগেও জাতীয় দৈনিকে ফলাও করে কলাম লিখলাম, দেশের সংস্কার করতে হলে রাজনীতিবিদদের জন্য প্রফেশনাল এথিক্স, কোড অব কন্ডাক্ট আইন আকারে তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক দল ও তার নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়া বা প্রসিডিউর থাকবে। রাষ্ট্র সে আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ কঠোরভাবে করবে। শত্রুর ক্ষেত্রেও যা, আপন বাপের ক্ষেত্রেও তা। অন্য একটা পত্রিকায় রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে লিখেছি। এখনো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো ফল আসেনি। ভবিষ্যৎ দেশ কীভাবে ভালো চলা সম্ভব, মাথায় ঢোকে না। এ নিয়ে রাজনৈতিক দল-সংস্কার আন্দোলন করা দরকার। এজন্যই বারবার বলি বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কোনো রাজনৈতিক দলের মুখের কথার ওপর নির্ভর করে দেশ চলতে পারে না। নইলে রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে যে লুটপাট, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার শুরু হয়ে গেছে, এটা কখনোই দূর হবে না। সংশ্লিষ্ট কমিশনের এত মিটিং চলছে, এসব কথা কেউ বলছেন না। সব অফিস-আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির ক্ষেত্রেও কঠোর আইন তৈরি করতে হবে ও তার নিরপেক্ষ প্রয়োগ করতে হবে। নইলে দেশের সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দেয়, আর অবৈধ সম্পদ গড়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। 'কুতে মরে হাঁস আর ডিম খায় দারোগা বাবু।' প্রয়োজনীয় ও ধন্বন্তরী সংস্কার হোক। 'অতি মহান' রাজনীতিকরা অনুমোদন না দিলে অনুমোদন নিতে হবে গণভোটের মাধ্যমে। রোগীর হাতে প্রেসক্রিপশনের ভার ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাহলে রোগী বেছে বেছে মিষ্টি ওষুধগুলোর ব্যবস্থাপত্র নিজ হাতে লিখবে। দেশের রোগগুলো আগে শনাক্ত হোক, তারপর রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হোক। 'ডান্সিং এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ক' করে পরিশ্রম বেশি, লাভ কম। এসব সাদামাটা কথায় গুরুত্ব দিলে লাভের সম্ভাবনা বেশি। ব্যালান্স অব পাওয়ার নিশ্চিত করার জন্য এ মুহূর্তে দাবি প্রেসিডেন্ট শাসিত শাসন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন জটিলতায় না গিয়ে প্রেসিডেন্টের অধীনে 'জাতীয় সরকার', যার অঙ্গিকার আন্দোলনের সময় বিএনপি আগেই করেছিল।

(প্রকাশ: ৮ মে ২০২৫, দৈনিক শিক্ষাবার্তা.কম)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অন্তহীন নিরাশায় নিমজ্জিত মানবজাতি

আমরা মানব সভ্যতার গর্বিত দোলনায় চড়ে দোল খাচ্ছি। তাহলে এখন সর্বত্র আসল মানুষের সন্ধান করতে হচ্ছে কেন? কারণ বিশ্ব আজ বড্ড দুর্বিসহ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। মানুষকে নিয়েই এ বিশ্ব, মানুষই চরাচর। এই মানুষই সুর-অসুর। অসুরের পদভারে আজ বিশ্ব মথিত, ভয়ে প্রকম্পিত, কুটিল কৌশলে নিষ্পেষিত। এ বিশ্বে মানুষের অস্তিত্বই যদি না থাকে, বিশ্বটা তখন বিবর্ণ-বিমথিত বা সুবর্ণ শস্য-শ্যামলা-দৃষ্টিনন্দিত হলো কিনা, তাতে মানুষের কী এসে যায়! মানুষ বাঁচে বড়জোর একশ বছর। সময়টা সুন্দর, সুখ-শান্তির সঙ্গে বাসযোগ্য হতে হলে এ বিশ্বে আসল মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে, যারা সুস্থ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী; বিশেষ করে যাদের মুখের কথায়, চিন্তা-চেতনায়, সব কর্মে সাধারণ মানুষ, সব দেশ ও সমাজ নিরাপদ। পক্ষান্তরে রাক্ষস-দানব ও দানবীয় চিন্তা-চেতনা কমাতে হবে। বাস্তবে কি তা হচ্ছে? আসল মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা কি তারা আজন্ম পাচ্ছে?

মানুষ কে? মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই কি মানুষ হওয়া যায়? দেখতে মানুষরূপ ধারণ করলেই কি তাকে মানুষ বলা যায়? এখানেই আমরা বড় ভুলটা করে বসি। এ বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখানেই সমস্যা; এ ধরনের শতেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। উত্তরের জন্য কার কাছে যাব! যার মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা নেই, বা আত্মজিজ্ঞাসার ধার একেবারেই ভোতা হয়ে গেছে, বিবেকবোধ নিষ্ক্রিয়, পশুত্ব জেগে উঠেছে, তাকে মানুষ না বলে পশু বলাই তো শ্রেয়। পশু পোশাকে সজ্জিত হয় না। পোশাক পরলেই তো মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

আসল মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্ব আগে থাকা দরকার। মানুষরূপে জন্মেছি বলেই মনুষ্যত্ব থাকবে, তা নয়। মনুষ্যত্ব বা মানবতাবোধ আছে বলেই আমাদের মানুষ বলা হয়। বিবেক সবসময় জাগ্রত থাকতে হবে। আত্মজিজ্ঞাসাও মানুষ হওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। আসল মানুষ হতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি এবং প্রতিটা সৃষ্ট জীবের প্রতি অবিমিশ্র মমত্ববোধ একটা আবশ্যকীয় উপাদান। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষ ও জীবের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করে, এ গুণ থাকাও অপরিহার্য। ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। এ দুটো গুণও আসল মানুষের মধ্যে থাকতে হয়। এসব গুণ ছোটবেলা থেকে শিক্ষার মাধ্যমে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হয়। তথাকথিত মানুষের মধ্যে এসব গুণের অভাব আছে বলেই পৃথিবীতে তারা বসেও রকেট ছুঁড়ে বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়ছে; প্রকৃতিকে কলুষিত করছে, মানবসভ্যতাকে নিত্য-নতুনভাবে

অবিরাম আরও বিপর্যস্ত-নাস্তানাবুদ করে চলেছে। সেক্যিউলারিজম মতবাদের ধুয়ো তুলে ধর্ম-কর্মের মূল– মানবতার জাগরণ, মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানবজাতির কল্যাণ ও ন্যায়নিষ্ঠাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কী না করছি! সূর্যের আলো তো সবার জন্য উন্মুক্ত। কোনো শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা খাটিয়ে সূর্যের আলো পেতে আমাদের যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কেমন হবে? প্রকৃতি প্রদত্ত ধারায় বিভিন্ন দেশের ওপর দিয়ে অবিরাম বয়ে যাওয়া নদীর পানি-প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্ত করে অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অভিন্ন চুয়ান্নটা নদীর পানির এ অবস্থা কেন? এক দেশ অন্যদেশের প্রতি প্রতিহিংসায় মেতে সেদেশকে নিজ স্বার্থে গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর হচ্ছে, কোনো প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে বোমা মেরে বসতবাটি থেকে সমূলে উচ্ছেদ করে বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে আফগানিস্তান দখল ও অধীন করে সেখানকার খনিজ সম্পদ লুট করার চেষ্টা, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ, পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারে নিজ ভূমি থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন, ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় উচ্ছেদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও নিগ্রহ-অত্যাচার, সিরিয়ার ভ্রাতৃঘাতি প্রতিপক্ষ দমন, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনি নিধনযজ্ঞ– এ হলো হাতেগোনা কয়েকটা উদাহরণ। পরিতাপের বিষয়, ফিলিস্তিনি নিধনযজ্ঞে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমগোষ্ঠী জ্ঞাত কারণে নিশ্চুপ। ঘটনাগুলো কত মর্মন্তুদ! মন থেকে ভাবার অবকাশও আমাদের নেই।

দানবের দানবীয় কর্মে, প্রতিহিংসায়, উদগ্র স্বার্থপরতায় কত কোটি নিরীহ মানুষ যে ইতিহাসের অলক্ষ্যে বাস্তহারা, পঙ্গু বা চিরতরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তার কি কোনো হিসেব আছে? হিংস্রতা, বিকারগ্রস্ততা ও মানসিক বিকলতা আজ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য স্থানীয় নেতা, আঞ্চলিক নেতা ও বিশ্ব-ক্ষমতাধর দেশচালকদের অন্তর্নিহিত মনব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। মানুষ হয়ে মানুষ হন্তারক, এ কোন রক্তপিপাসু জিঘাংসা! এ কোন মানবকূলনাশী অনিবার নেশা! বিষয়গুলো আমাদেরও ক্রমেই গা-সওয়া হয়ে গেছে। সবই বিকৃত অমানুষসুলভ মানসিকতার ফসল। এসব মানব সভ্যতার ললাটে কলঙ্কের তিলক তো বটেই।

দেশচালকদের কেউ কেউ দেশীয় মোড়ল, কেউবা আঞ্চলিক মোড়ল, কেউবা বিশ্ব-মোড়লের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ব-মোড়লের কার্যকলাপ ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে ধর্মে বর্ণিত কলিযুগের দজ্জালের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাদের কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই; তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থই প্রধান। অথচ আঞ্চলিক নেতা বা বিশ্বনেতা

হয়ে বসে আছে। প্রতিহিংসায় মনটা ভরপুর। অথচ মানবকুলে এদের বসবাস। বলা হয়েছে, 'তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও কমন সেন্স ব্যবহার করে? তারা কেবল গবাদি পশুর মতো, বরং তারা আরো বেশি পথভ্রষ্ট' (সূরা আল ফুরকান,২৫:৪৪)।

কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যায়, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সবল উচ্ছেদে, অন্যদেশ লুটপাটে, মারণাস্ত্র ব্যবসায় কোনো কোনো দলনেতা, গোষ্ঠীনেতা, গোত্রনেতা এ বিশ্বে জোটবদ্ধ হয়েছে। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষের আজ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অনেক দেশের নির্জীব পরিচালকরা ভালোমানুষ সেজে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। মানবসমাজে এ আবার কোন অনাসৃষ্টি-অবিচার?

মানুষের ভাঁজে ভাঁজে দানবের সদম্ভ উপস্থিতি মানবজাতির অস্তিত্ব ও বসবাস দুর্বিসহ করে তুলেছে। সব দেশেই একই মানুষ, একই রংয়ের রক্ত শরীরে নিয়ে বসবাস করছে। দানবদের নিজ দেশের জন্য সুনজর, ভিনদেশের মানুষের প্রতি অনিষ্ট চিন্তা। মানবতাবোধ, ঔচিত্যবোধ, গণতন্ত্রের প্রকৃত মূল্যবোধ কোথায়? ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মেকি দেশপ্রেম দেখিয়ে কিংবা বিপক্ষ কারো প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া। তারপর নিজ স্বার্থে বিশ্বলুটের মওকা খোঁজা, সম্রাজ্য বিস্তারের ধান্ধা, ক্ষমতায় টিকে থাকার অজুহাত আবিষ্কার করা। সুস্থ চিন্তার, মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন আসল মানুষ কোথায়! যারা মরছে, তারা মরে মরে বিপুল সংখ্যাতীত হচ্ছে; যারা মারছে, তারা মেরেই চলেছে। কৌটিল্যের কুটিলতার যেন শেষ নেই! মানবজাতি আজ অন্তহীন নিরাশায় নিমজ্জিত। এ থেকে বেরিয়ে আসারও সুচারু পথ ও পাথেয় আছে, সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ করার ফুরসত নেই। দানব হস্তিমূর্খ হওয়ায় কাঁধে জোয়াল নিতে অনীহ। সব সমস্যারই সমাধান আছে। আমরা দানব তৈরির শিক্ষা দিচ্ছি। বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এতে কমপক্ষে আশি শতাংশ মানবগোষ্ঠী দানব না হয়ে আসল মানুষ হবে। জাতিসংঘের নীতিমালা ও পরিচালন-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

(প্রকাশ: ২২ মে ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সমাধান হতে পারে জাতীয় সরকার

যদি বলি বর্তমান সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা কেমন? মহান রাজনীতিবিদদের মন-মানসিকতাইবা কেমন? জিজ্ঞেস করতে হবে, 'এটা কি লোক দেখানো বাহ্যিক মৌখিক মন-মানসিকতা, না অন্তরের ভেতরে প্রতিস্থাপিত মন-মানসিকতা? এটাই বাস্তব অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার ব্যাপকতা ও মানসিক সুস্থতা আদৌ সুখকর নয়। বর্তমান সমাজে মুখের কথার সাথে কাজের মিল দেখা পাওয়া বিরল ব্যাপার। প্রতিদিনের পত্রিকা এসব কথাই বলে। এ অবক্ষয়ের কি পরিবর্তন করা সম্ভব? অবশ্যই; তবে সময়সাপেক্ষ। সমাজের এসব সাইকোলজিক্যাল বিষয়গুলোর গুরুত্ব কি সংস্কারকরা আদৌ দেবেন? মনে হয় না। সংস্কার ভালো-মন্দ মিলে একটা হবে। কিন্তু দেশ কি ভালো হবে? বিশ্বাস করা কঠিন। এদেশের রাজনীতিকরাই তো দেশ চালাবেন। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্বার্থবাদিতা, দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া– সব তো এখনই দেখছি। নির্বাচন হলেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে ফেরেশতা-সদৃশ হয়ে যাবে, বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক প্রতিটা দলীয় শক্তি 'এক খুরে মাথা কামানো', দলবদ্ধ। দেশের তুলনায় দলের নেতা-কর্মীদের সুবিধা ও ক্ষমতা নিয়ে তারা ব্যস্ত। রাজনৈতিক দল হলেই যে দেশপ্রেমী হতে হবে, এমন তো কথা নেই। হতে পারে চোর-ডাকাতের দল, কিংবা সুফি-দরবেশ, ভালো মানুষের দল। ৫৪ বছর ধরেই তো এদেশ সরেজমিন সবকিছুই প্রত্যক্ষ করল। মন-মানসিকতার সুস্থ পরিবর্তন হলে দেশ গড়ার কাজে সুযোগ দিতে পারেন, আবার নিজেরাও ভালো কাজে অংশ নিতে পারেন। তাতে দেশ উপকৃত হয়। তাদের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। সবই তাদের মর্জি।

তবে দেশ বাঁচাতে ও গড়তে শুরু তো একবার করতেই হবে! স্বাধীনতা যুদ্ধের পর একবার এবং '২৪-এ আরেকবার বড় রকমের সুযোগ এলো; এরপরও যদি আমাদের বিবেকবোধ না জাগে, তাহলে ভবিষ্যতে তা হবার সম্ভাবনা কম। কথায় বলে, 'যা হলো না বিয়ের রাতি, তা হবে আবার আশ্বিন-কার্তিক?' অবশ্য 'হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'–এ কথাও সত্য। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের সময় বিএনপি ঘোষণা করেছিল, নির্বাচনে জিতলে দেশে 'জাতীয় সরকার' গঠন করবে– কথাটা আজো মনে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপিকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শে, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দফাভিত্তিক উন্নয়ন, দুর্নীতিবাজ নেতা-কর্মী দমন ও ভারতীয়

শোষণমুক্ত রাজনীতির মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে, নইলে দলে আজ হোক আর কাল হোক বিপর্যয় আসবে। প্রয়োজনে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত নিরাপত্তা বলয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে, কারণ ইতিহাস বলে, উগ্র হিন্দত্ববাদী আধিপত্যবাদ কোনো দিনই আমাদের ভালো চোখে দেখবে না।

'জাতীয় সরকার কেন দরকার?' এর জবাব হবে অনেক বড়। তবে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ ভারতীয় সরকার এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর বর্তমানে বড় হুমকি। তাদের দাস দলবলসহ তাদের ঘরে গিয়ে বসে আছে। তারা এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলই দাসের মাধ্যমে দেশটা লুটে খেতে; উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতার দাপট বাড়বে, এই আশা নিয়ে। তারা ধরে নিয়েছিল যে এদেশের অনেক তথাকথিত প্রগতিবাদী ও তাদের দাসেরা ইসলামবিদ্বেষী হয়ে তাদের পক্ষে কাজ করবে। বিধাতা তাদের সব আশা পূর্ণ করেছিলেন। এদেশকে বাণিজ্যিক পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করার পুরো সুবিধাটাই তারা পাবে। দেশটা করদ রাজ্যে পরিণত হবে। হয়েছিলও তাই। দীর্ঘ ৫৪টা বছর আমরা তাই দেখলাম, মাঝে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাড়ে তিন বছর বাদে। 'যদি বলি পেয়েছি যা তার আদৌ কিছু চাইনি, চেয়েছি যা নিজের করে, পাইনি– কিছুই তার পাইনি।' জীবন থেকে যে ৫৪টা বছর পেরিয়ে এক পা কবরে চলে গেল, এর কী হবে? সুতরাং দেশের যে বর্তমান সংঘাতময় অবস্থা, পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যে দা-কুমড়া সম্পর্ক; রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তর ভাগে যে নিয়ন্ত্রণহীন অনৈতিকতা ও মেরে-কেটে খাওয়ার মানসিকতা; সামাজিক মূল্যবোধের যে অবর্ণনীয় অবক্ষয়– সবকিছুই বলে, শুধু আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ যথেষ্ঠ নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ চালানোর জন্য 'জাতীয় সরকার' এ মুহূর্তে অগ্রগণ্য। পলাতক আসামিদের ও লুটের টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। লুটপাট করা সব অবৈধ টাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনরঞ্জনে, প্রভাবশালী দলীয় লোকজন কিনতে এবং দেশের অস্থিতিশীলতার কাজে ব্যয়িত হচ্ছে ও অনেকদিন ধরে ব্যয়িত হবে। সুতরাং যে কোনো একটা জনবিরোধী দল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এলেই তাদের রোধা অসম্ভব।

এ কারণে অন্তত ২০/৩০ টি প্রয়োজনীয় দফার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একমত হয়ে জাতীয় সরকার গঠন সময়ের দাবি। এতে আপনাআপনি একজনের দোষ অন্যের দিয়ে শুধরানো হয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না। ভালো কাজের প্রতিযোগিতা শুরু

হয়ে যাবে। দল পুষ্ঠ না হয়ে দেশ পরিপুষ্ট হবে। বিগত ১৫ বছরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার সমাপ্ত করতে এবং সংস্কার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে ও যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করতে 'জাতীয় সরকার' ব্যবস্থার বিকল্প নেই। যত সংস্কারই করা হোক, সাধারণ মানুষ আবার সেই পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে সম্মত নয়। জাতীয় সরকার না হলে সংস্কার প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন এবং অর্থ লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞের বিচার বাধাগ্রস্ত হবে।

কীভাবে কার্যকর সম্ভব? প্রথমেই শাসনব্যবস্থার ধরন পরিবর্তন করতে হবে। দেশে প্রেসিডেন্ট শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ছোট্ট একটা দেশ, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কমপক্ষে প্রথম মেয়াদের জন্য অরাজনৈতিক কোনো ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হবেন। তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও অবদান বিবেচনা করে নির্বাচনের জন্য এমপি মনোনয়ন দেবেন। নির্বাচনের পর এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠিত হয়ে যাবে। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বে সংসদ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে করতে হবে। নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের উচ্চ-পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রেসিডেন্ট করবেন। সংসদ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাখতে পারবে। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাছাই করা অরাজনৈতিক পেশাজীবীদের মধ্য থেকে উচ্চমানের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটে ১৫ থেকে ২১ সদস্যবিশিষ্ট অরাজনৈতিক একটি 'জাতীয় কাউন্সিল' বা 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠন ও এজন্য নির্বাচন করতে হবে। তাদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বিশেষ ক্ষেত্রে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্টের নিজের হাতেও কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা হতে পারে ২ থেকে ৩ লাখ। এ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে উচ্চ-কক্ষের আর প্রয়োজন হবে না। এতটুকু দেশে সংসদ সদস্যের সংখ্যা ক্রমশ বাড়াতে গেলে সরকারি খরচ যেমন স্থায়ীভাবে অধিক বেড়ে যাবে, তেমনি ক্রমে ক্রমে প্রতি ইউনিয়ন থেকে একজন এমপি নির্বাচিত করার প্রস্তাবও অমূলক হবে না। অবৈধভাবে নোমিনেশন পেপার বিক্রি বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। রাজনীতিতে আবার বেশি বেশি টাকার খেলা শুরু হবে। এমপি পদের মর্যাদা ক্রমেই ক্ষুণ্ন হবে। রাজনীতিতে অবৈধ টাকার খেলা যত কমবে, সুশিক্ষিত-সৎ লোক তত দেশ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে আসবে। বর্তমানে অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদে জঘন্য দলীয় রাজনীতি ও প্রকাশ্য টাকার খেলা চলছে। দেখার কেউ নেই। সাধারণ মানুষ দিনে দিনে এসব

খেলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সমাজটা ক্রমশ এভাবেই উচ্ছন্নে যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দিনে দিনে শিঁকেয় উঠছে। 'জাতীয় সরকার' এসব দেখবে।

এদেশের মানুষ প্রজেক্টভিত্তিক কাগজ-কলমের পরিকল্পনার কাজ আর বেশি দেখতে চায় না। তারা চাই, প্রতিটা সংস্কার, বিধি-বিধানের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বাস্তবায়ন হোক।

(প্রকাশ: ৪ জুন ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশের সামনে তিনটি অনিবার্য চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব-রাজনৈতিক অবস্থা যে আদৌ ভালো নয়– এটা সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ইসরাইল কর্তৃক ইরান আক্রমণ তার পুর্বাভাস। আমি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হব, কিন্তু তোমাকে হতে দেব না। কারণ তোমার জাত-কুলকে যে কোনো কলাকৌশলে আমরা বিভাজন করব এবং দাবিয়ে রাখব; পারলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব। তোমার স্বজাতিদের ছেলেভোলানো ললিপপ হাতে দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে ভুলিয়ে রাখব, শোষণ করব, মুখোশ পরে আপন হওয়ার অভিনয় করব, দমন করব। জাতিগত এ হিংসাত্মক বিভেদ শুরু হয়েছে ক্রুসেড থেকে। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী, আধিপত্যবাদী শক্তি ও জায়নবাদী শক্তি এ বিষয়ে একাট্টা; সঙ্গে তাদের কৌশলী কুশীলব। মুসলমান মরে প্রায় শেষ হওয়ার পর মিমাংসা করতে গুরুরা আসে। এর আগে দূরে বসে মজা দেখে, মন্তব্য করে। ভেতরে আছে অব্যক্ত-অকথিত থিও-পলিটিক্যাল কনফিক্ট। 'আমার ভেতরে-বাহিরে অন্তরে-অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে-এ-এ'। সতীর্থ উগ্র-হিন্দুত্ববাদী ভারতের বুদ্ধি কীভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনা, সম্পত্তি কৌশলে দখলে নিয়ে তাদের নির্জীব করা যায়, ভরত থেকে বিতাড়িত করা যায়। পাকিস্তানে আক্রমণের ঘটনায়ও দেখা গেল– প্রথমেই মসজিদ-মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থাপনাগুলো ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ওদের প্রথম শত্রু। এদেশও বিশ্বব্যবস্থার একটা অংশ।

এবার এদেশের কথা বলি। গতদিন বলেছিলাম, এদেশের সকল দুদর্শা, শোষণ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল, হত্যাযজ্ঞ, অপশাসনের মূলে মূলত ভারত ও তাদের সেবাদাস। এদেশকে তিনটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে এবং এভাবেই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। প্রথমত, ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তি এদেশকে গ্রাস করতে চায়, চুষে খেতে চায়, এদেশের নামটা মুছে দিতে চায়; আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এদেশ থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী উধাও করে দিতে চায়। এরা কখনো এদেশকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে দেবে না। এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে লুকিয়ে থাকা তথাকথিত মুসলমান নামধারী ভারতীয় দাসরা এ কাজে ভারতকে সহযোগিতা করবে। আমাদের তারা তাদের কুটকৌশল দিয়ে প্রায় কুক্ষিগত করে ফেলেছে। এটা বড় চ্যালেঞ্জ। চুয়ান্ন বছরের মধ্যে কয়েকটা বছর বাদ দিলে তারাই কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এদেশ শাসন করে এসেছে। নইলে শাপলা চত্বর হত্যাযজ্ঞে, পিলখানা বিদ্রোহের নামে সেনাসদস্য হত্যার সময়, '২৪ এর গণহত্যায় অন্য ভাষাভাষী লোক হত্যাযজ্ঞে অংশ নেয়, কথা বলে কেন? সাক্ষী হারায়, মানুষ গুম

হয় এদেশে, ভারতের জেলে খুঁজে পাওয়া যায় কেন? তখন সীমান্তের বাধা কোথায় থাকে? তাদের উগ্র আধিপত্যবাদের মধ্যে আছে– ধর্মীয় আগ্রাসন, এদেশের দাসদের মাধ্যমে রাজনৈতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অপপ্রচার। এই আধিপত্যবাদের মোকাবেলা এ পর্যন্ত দুজন ব্যক্তিত্ব করেছেন। একজন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া; অন্যজন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া দেশের হাতে কোনো বিকল্প নেই। আমাদের তাদের হাত থেকে স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতেই হবে। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এদেশে ইসলামবিদ্বেষী দুই শ্রেণির দাস ভারত পুষছে– এক হচ্ছে আওয়ামী লীগ নামের দাস; অন্যটা বাম রাজনীতির তল্পিবাহক তথাকথিত প্রগতিশীল দাস। উভয়ই ইসলামবিদ্বেষী। আমি ভারতের বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে জানি। তাদের ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকলেও হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী নয়। রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর বামপন্থীদের কথা জানি। তারা উগ্রবাদী ও ধর্মবিদ্বেষী হয়ে প্রথমে সেসব দেশের প্যাগোডা, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ভেঙেছিল। তাদের কেউ কেউ বর্তমানে বাম আদর্শের ধারক কিন্তু খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মবিরোধী নয়। কিন্তু বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতিশীলরা দাড়ি-টুপি মুসলমানিত্ববিদ্বেষী। অথচ তাদের বাপ-দাদা, আত্মীয়স্বজন সবাই মুসলমান। ইসলামবিদ্বেষী বামেরা ভুলে যান, তারা শুধু বাঙালিই নন, মুসলমানও বটে। নইলে '৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্মই হতো না। তা না হলে আজও ভারতের মুসলমানদের মতো রাত-দিন নির্যাতন ও উচ্ছেদ আতঙ্কে তাদের ভুগতে হতো। নিম্নমানের নাগরিক হয়ে অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের মতো বাস করতে হতো। আমার ভাবতে অবাক লাগে, একটা রাজনৈতিক মতবাদ নিজস্ব সম্প্রদায়ের আত্ম-অস্তিত্বের আত্মবিনাশী হয়ে ওঠে কীভাবে? তা তারা ধর্ম পালন করুক, বা না করুক। এই দুদিন আগেই কোনো না কোনো দাড়ি-টুপিধারী মৌলবির পেছনে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ তারা পড়ে এলো। আবার তারা মুসলমানবিদ্বেষী। টুপি-দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই তাদের গা জ্বালা করে। তাদের রাজাকার ও জঙ্গি বলে গালি দেয়। তাদের ধ্বংস ও উচ্ছেদে অনুঘটক হয়ে কাজ করে। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ মুসলমানদের ৮০-৯০ শতাংশ লোকের জন্মই হয়নি। বুঝি না মুসলমানদের দোষটা কোথায়? উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ইসলামবিদ্বেষী হওয়াই এদের দাসরাও ইসলামবিদ্বেষী! তারা কি স্রোতে-ভাসা শেওলার মতো গোত্র-সম্প্রদায়হীন মূলছিন্ন-পরিচয়হীন মানুষ হয়ে জীবন কাটাতে চায়? এরা নিশ্চয়ই আত্মবিনাশক ও আত্ম-হন্তারক হতে চায়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, অসংখ্য

জাতি ও জনগোষ্ঠীর নাম বইতে থাকলেও তাদের বাস্তব অস্তিত্ব বিশ্বে এখন আর অবশিষ্ট নেই। আমার সন্দেহ বাঙালি মুসলমানেরা সেদিকে যাচ্ছে। আমাদের রাজনীতিকদের সেই বুদ্ধিতে ধরেছে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া। এ দলের মধ্যেও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ঢুকে গেছে; তাদের সক্রিয় কর্মকাণ্ড চলছে। এর পরিণতি যে নিশ্চিতভাবে খারাপ তা এখনই বলা যায়। অথচ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পড়লেই বোঝা যায়, শহীদ জিয়ার আদর্শ ছিল মধ্যপন্থী ইসলামী দেশ। বর্তমান বিএনপি সে আদর্শ থেকে সরে এসে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধকে দূরে ঠেলে দিয়ে সেক্যিউলারিস্টদের সাথে নিয়ে প্রলাপ বকছে। টিকতে পরবে কিনা, সে ভাবনাচিন্তা নেই। দেখেছি এদেশের মানুষের আশা-ভরসার জায়গা ছিল বিএনপি। তারাও প্রগতিশীলদের দলে ভিড়িয়ে ক্রমশ ইসলামবিদ্বেষী হয়ে ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে মূলছিন্ন হতে চলেছে।

'২৪ এর বিপ্লবের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও দেশরক্ষার যে স্বপ্ন এদেশ দেখেছিল, তা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছি। আমাদের বিনাশের মূলে আমরাই। এদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান, সংখ্যালঘু নির্যাতন– সবই ভারত ও তার দাসদের অপপ্রচার ও নাটক– এটা কে না বোঝে! এদেশের একটা রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালী শক্তি ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও তাদের দাস আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

আজ ষাট বছর ধরে এদেশে যত বামের জন্ম হয়েছিল, তাদের অধিকাংশ বাম মতবাদের অসারত্ব বুঝতে পেরে ক্রমেই আস্তিক হয়ে উঠেছে এবং মুসলমান হয়ে নামাজ ধরেছে। কিছু কিছু বাম অন্য দলে যোগ দিয়েছে, কেউ খোলা ময়দানে বুদ্ধিজীবী নামাবলীতে ঘুরছে। এরা ইসলামবিদ্বেষী, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও জায়নবাদী। এরা ভারতের মোদিবাদ ও উগ্রবাদী শক্তির সহযোগী। এরা বস্তুবাদী, ভোগবাদী ও অসার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। এরা ইনক্লুসিভ সোসাইটির অন্তরায়। এদের কর্মচিন্তা ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এদের মতবাদ অচল, অকেজো– তাই বিশ্বব্যবস্থা থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

তৃতীয় যে চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলাম, সেটি হচ্ছে– দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নীতিহীনতা। এদেশের সহজ-সরল জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলো জনআপদে পরিণত করেছে। যতদিন এদের জনসম্পদে রূপান্তর না করা যাবে,

এদেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গণতন্ত্রে উত্তোরণ ও প্রতিহিংসামুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আশা করা যায় না। যতই সংস্কার করুক, এ সংস্কারে দেশের মুক্তি আসবে কিনা সন্দেহ, কারণ এতে রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। বিএনপি বড় দল হিসেবে পারে নিজেদের দলীয় রাজনীতিকে সংস্কার করতে, আত্মশুদ্ধির পথে যেতে। তাদের দেখাদেখি অন্য দলগুলোও দলীয় সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে। এত সংস্কারের কথা শুনছি, কিন্তু রাজনৈতিক দলের যত ষন্ডা-পান্ডা, দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, জনগণের তহবিল তসরূপকারীদের থেকে মুক্ত করার কোনো শুদ্ধি অভিযান চোখে পড়ছে না। এতে নিরাশ হচ্ছি। এদেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপযোগী কোনো সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগও কেউ নিচ্ছে না। তবে এদেশের মানুষ গণহত্যাকারী, লুটেরা ও দেশের স্বাধীনতা বিক্রেতা পরদেশী দাসদের রাজনৈতিক দল ও এতে জড়িত অপরাধীদের বিচার দেখতে চায়।

(প্রকাশ: ২৫ জুন ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

’২৪–এর ছাত্র–জনতার বিপ্লবের বছরপূর্তির প্রাক্কালে

(প্রকাশিত শিরোনাম: অভ্যুত্থানের বছরপূর্তির প্রাক্কালে)

বছর পেরিয়ে ৫ আগষ্ট আবার ফিরে আসতে চলেছে। সবই সচেতনমহলের নখদর্পণে। আবারও প্রমাণিত হতে চলেছে, এদেশের সব অব্যবস্থা, অধোঃপতন ও অনুন্নতির মূলে এদেশের নীতি-আদর্শহারা, দলবাজ রাজনীতিবিদরা ও তাদের অনৈক্য। নইলে দেশ গড়ার এমন সুযোগ আমরা আত্মকলহে ও আত্ম-অহংকারে হাতছাড়া করতে চলেছি কেন? অন্তর্বর্তী সরকারের এখনো পর্যন্ত যে অর্জন, মূল্যবান হলেও সেগুলো স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী অর্জন এখনো হাতে এসে পৌঁছেনি। অনেকগুলোই প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যে ব্যক্তি যত বুদ্ধিমান, সে তত দূরদর্শী। অন্তর্বর্তী সরকার দূরদর্শী হবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা। রাজনৈতিক দলগুলোর যে মনমানসিকতা এতদিনে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে প্রক্রিয়াধীন কর্মকাণ্ডে বেশি আশান্বিত না হওয়াই ভালো।

ছাত্র-জনতার বিপ্লবের সার্থকতা নিয়ে বলতে গেলে আবার সেই লালনের গানকে স্মরণ করতে হচ্ছে: ‘আশা পূর্ণ হলো না, মনের বাসনা’। এই কারণেই ‘২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে ‘আধাখেঁচড়া’ বিপ্লব নাম দিয়ে আসছি। একমাত্র দেশখেকো বিপ্লব-বিরোধীরাই এতে লাভবান ও পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আশান্বিত হচ্ছে। বিপ্লব সফল ও সমাপ্ত হতে আরো সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে। এই অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় বিপ্লব শেষ হতে দেওয়া যেতে পারে না।

সংক্ষেপে, বিপ্লবের মূল লক্ষ্যটাই ছিল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত ও সুসংহত করা; আধিপত্যবাদী আগ্রাসন ও শোষণ, আশ্রিত রাজ্যের অবস্থান ও দুঃশাসনের নিগড় থেকে দেশকে বের করে আনা। এদেশের লাখ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে ‘পার্শ্ববর্তী দেশের দান’ অবস্থার দাবি থেকে পুনরুদ্ধার করা; অন্য দেশের দাস বা গোলামি করা গাদ্দারদের মুখোশ উন্মোচিত করে দেশ মুক্ত করা; জাতির অস্তিত্ব মূলছিন্ন-পরগাছা অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে নিজস্ব মূলভিত্তির ওপর দাঁড় করানো; প্রভুর সহযোগে দাস কর্তৃক সীমাহীন দুর্নীতি-লুটপাট, অরাজকতা, বিচারহীনতা, এদেশের নিরপরাধ ভূমিপুত্র-মানুষকে প্রতিহিংসার কারণে নির্বিচার গুম-হত্যা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। বিপ্লব অনেকটা স্বার্থক হয়েছে, মানতেই হবে। দেশপ্রেমী মানুষের আশা, বাকিটাও অর্জিত হতে হবে। মনে হচ্ছে, সময় লাগবে, তবে সম্ভব। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর একটা বড় দায়িত্ব পালন আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু ক্ষমতাপ্রেমী ও অনেক ব্যবসায়িক রাজনীতিক অতীতের

বিপন্নপ্রায় অবস্থা ও দুর্দশা ভুলে যেতে চলেছে। নির্বাচনকেই দেশ রক্ষার একমাত্র নিয়ামক বলে ভাবছে। আমাদের আশা, আপদমস্তক দুর্নীতির রাহুগ্রস্ত, অসৎ মানসিকতাসম্পন্ন, দুরারোগ্য ব্যামোক্লিষ্ট রাজনীতির কবর দিয়ে রাজনীতির নতুন সুস্থ ধারা চালু হোক।

ব্যামোগ্রস্ত রোগী অপারেশন, কাটা-ছেঁড়া মেনে নিতে চায় না, অনেক সময় অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে জোর-জবরদস্তি, কখনো রোগীর পূর্ণ এ্যানেসথেশিয়া করে কাজ করতে হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক দল-নামীয় রোগীর দেহ-মন মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত। আমরা নিজের অনিমিখ-অনিরুদ্ধ চোখ দিয়েও তা-ই বাস্তবে দেখি; হতাশ হই। রোগীর সব কথা ও প্রলাপ শুনতে গেলে তারই জীবন বিপন্ন হয়। রোগীই একমাত্র বোঝে– কথাটা ঠিক নয়। ডাক্তার ও রোগীর হিতাকাঙ্ক্ষীরাও অনেক ভালো বোঝে, এটা মানতেই হবে।

অপারেশনের কাজগুলো ঠিকঠাকমতো হচ্ছে না। রোগী-তোয়াজের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। দেশ-বিক্রেতা, লুটেরা ও গণহত্যাকারীদের বিচার যথাযথ হতে হবে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সংস্কার ও রোগগ্রস্ত রাজনীতির সংস্কার দেশোপযোগী ও সময়োপযোগী হতে হবে– এটা এদেশের সাধারণ নাগরিকদের চাওয়া। রাজনীতির সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সংস্কারে সব রাজনৈতিক দল একমত পোষণ করবে– এটা দুরাশা মাত্র। এখানে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও উপরিল্লিখিত সমস্যাগুলো ও অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আজকের লেখায় সংক্ষেপে দুটো প্রস্তাব দেওয়া যায়।

১. এক্ষেত্রে স্বাধীনতা-অব্যবহিত পরের একটা বাস্তবতা উদাহরণ হিসেবে দিতে চাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমরা একটা নির্দিষ্ট মূলধনের অধিক মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করে তার হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসানের জের দীর্ঘ বছর ধরে টেনেছি, এখনো অনেক টানছি। নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথাকে বিবেচনায় এনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা মিল-কলকারখানা জাতীয়করণ করেছিলাম। জাতীয় চরিত্রের সাথে সিস্টেমকে মেলাতে অদূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি বাম-ঘরানার কমরেডদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, এর ফলে টার্গেট শ্রেণি কোনোভাবেই এ পর্যন্ত উপকৃত হয়নি। উপকৃত হয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা, 'বুর্জোয়া সরকারি কর্মকর্তারা' ও সমসাময়িক 'রাজনৈতিক বুর্জোয়া নেতারা'। তার বড় ধরনের প্রভাব এ পর্যন্ত পড়ে এসেছে আমাদের অর্থনীতিতে।

বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ও নেতা-কর্মীদের কর্মকাণ্ডের আমূল সংস্কার আশু প্রয়োজন। চলতি রাজনৈতিক সংস্কারে দেশবাসী সন্তুষ্ট না। এদেশের রাজনৈতিক সততা, দেশের উন্নয়ন ও দেশসেবার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া অগণিত অসুস্থ দল ও প্রত্যেক দলের নীতিহারা অসংখ্য অঙ্গ-সংগঠনের সদস্যরা। রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হয়েছে ঠিক মিল-কলকারখানা জাতীয়করণের পরিণামের মতো। অধিকাংশ রাজনীতিক নেতা-কর্মী রাজনীতিকে একটা লাভজনক ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ধারাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে অঙ্গ-সংগঠন আগে বন্ধ করতে হবে। রাজনীতিকরা নিয়ম মোতাবেক দেশ চালাতে থাকবেন। কেউ রাজনীতি করতে চাইলে মূল ধারায় এসে রাজনীতি করবে। দেশবাসীর বিশ্বাস, পোকাধরা রাজনীতির বিস্তার যত সংকীর্ণ হবে দেশ তত ভালো চলবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার এথিক্স ও কোড অব কন্ডাক্ট থাকবে। দেশে আইনের নিরপেক্ষ শাসন থাকবে। আইন অমান্যকারীরা নিরপেক্ষ বিচারের সম্মূখীন হবে। শুধু রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও কাঠামোগত সংস্কার ফলপ্রসূ হবে না।

স্মর্তব্য যে, এদেশে রাজনীতি এখন আর কোনো দেশগড়া ও জনসেবার মঞ্চ নয়, রাজনীতি একটা ঝুঁকিবিহীন মুখসর্বস্ব লাভজনক ব্যবসা, এতে মেধাবী-সুশিক্ষিতদের সংখ্যা অনেক কম; এটা বাস্তবতা- দুচোখ মেলে দেখুন। এজন্য রাজনীতিতে এত ভিড়, গরুর হাটের দরদাম, মিথ্যাচার, আদর্শচ্যুতি। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে বলে মনে করা ঠিক নয়। এতে এবং এমন অসংখ্য সংস্কারের দফা অভিনবত্ব বাড়াবে; নতুন কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কতটুকু পূরণ হবে, ভাবার বিষয়। এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়তে আবার রাজনৈতিক দলের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা সুচিন্তার পরিচায়ক হবে না। এদেশ গড়তে রাজনীতির প্রকৃতিকে অবশ্যই বদলাতে হবে।

২. রাজনীতির নামে দেশ-শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হলে রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামো রিস্ট্রাকচারিং করা প্রয়োজন। সংস্কারে জটিলতা বাদ দিয়ে সহজ সমীকরণে যাওয়া ভালো। সংস্কারটা এমন হবে যে, রাজনৈতিক সরকারের দায়িত্ববোধের ব্যতয় ঘটলে, প্রত্যাশিত জনসেবা না দিতে পারলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেই বহন করতে হবে। দেশ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করতে অঢেল সুয়োগ-সুবিধা বা মুক্ততা দেওয়া

কোনোমতেই উচিত নয়। যে কোনো মূল্যে দেশ ও দেশের মানুষকে রাজনৈতিক দলের অসুস্থ জিম্মিদশা থেকে মুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের উপযুক্ত ভারসাম্য আনতে হবে। রাজনীতিকদের হাতে সরকার চালনার কর্মভার থাকবে। তারা দেশ ও জনগণের সেবা করবেন। জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং সরকারের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে দেখভালের দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্রে একাকী কেউ এ দায়িত্ব পালন করবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় ১৫ থেকে ২১ সদস্যের একটা ন্যাশনাল কাউন্সিল বা সুপ্রিম কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের প্রধান হবেন প্রেসিডেন্ট। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তাদের কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। তারা হবেন দেশের অরাজনৈতিক সুশিক্ষিত পেশাজীবী ও নাগরিক-সমাজের পুরোধা। তারা সম্মিলীতভাবে হবেন জনগণ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জিম্মাদার। সেজন্য দেশ পরিচালনায় রাজনীতিকদের সঙ্গে অরাজনৈতিক কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবীদের সংমিশ্রণ করতে হবে। এদেশের যত মেধাবী, সুশিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিতরা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত, দেশ পরিচালনায় অবদান রাখার জন্য আমরা তাদের মূল্যবান ও দক্ষ সহযোগিতা নিতে পারি। এখানেও গণতন্ত্রের চর্চা থাকবে। কাউন্সিল একটা নির্দিষ্ট-সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। নির্বাচকমণ্ডলী হতে পারে পুরো দেশব্যাপী দুই লাখ। নির্বাচকমণ্ডলী দেশের অরাজনৈতিক পেশাজীবী ও সুশিক্ষিত নাগরিক-সমাজের মধ্য থেকে গঠিত হতে হবে। রাজনীতির ঘুণে-খাওয়া স্থানীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট কাউকে ন্যাশনাল কাউন্সিলের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী করা ঠিক হবে না।

এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভারসাম্য তৈরি করা যায়। এতে দেশপ্রেমী রাজনীতিবিদরা টিকে থাকার স্বার্থে জনসেবা করতে বাধ্য হবেন, বেপরোয়া-নীতিবিগর্হিত কাজ থেকে বিরত হবেন। দুর্বৃত্ত-দুরাচার পুষলে দেশ-চালনার কাজ থেকে বহিষ্কৃত হবেন। দেশ ও জাতি রাজনীতিবিদদের সুস্থ সেবা পেয়ে ধন্য হোক, এটা সবারই কামনা। কোনো রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে জনস্বার্থবিবোধী বা দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে, 'দলবাজি' করলে, নেতা-কর্মীরা দুর্নীতি করলে কাউন্সিল তার বিহিত করতে পারবে। ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাহী বিভাগ, বিচারবিভাগ ও আইনবিভাগের কিছু উচ্চ-স্তরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে; বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বা যখন প্রয়োজন, নির্বাচিত ন্যাশনাল কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে দেশের যে কোনো

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। সেক্ষেত্রে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' কাজও ঐ একই কাউন্সিল করতে পারে। এভাবেই রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও জবাবহীনতার অবসান হবে। নতুন ধারায় নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

(প্রকাশ: ১৪ জুলাই ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

ড. আহমেদ তেতাল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় এখনোও জড়িত। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে

দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এতে তিনি অনন্য এক ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি এদেশের সমাজ, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন শিক্ষানীতি ও দেশ পরিচালনার নীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোককে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে নিয়ে ড. আহমেদ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করবে। এছাড়া সমাজের

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্‌টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা করবে। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' এবং 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ড. আহমেদ 'শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল', 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' অলখ মহাশক্তির খেলাঘর প্রভৃতি। তার শতাধিক প্রবন্ধ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসরে গেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজে কাজ করে যাচ্ছেন; অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে বইপুস্তক ও নিউজপেপার-কলাম লিখে চলেছেন।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ
ফোন নম্বর: ০১৭১৮৬৩৪০৫৭
ই-মেইল: hasnanahmed@yahoo.com
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ